এইচমতাজুদ্দীন

সমগ্র রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

শ্রীগুরুদেবকৃষ্ণ

সমগ্র রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

3 9422

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬

কপিরাইট নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা ১৯৯২

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু

ISBN 81-7215-465-8

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৬০.০০

সূচিপত্র

১. বাংলার বিশ্বজনীনতা এবং সমাজতন্ত্রের বাণী ... ১৭
রংপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ,
৩০ মার্চ ১৯২৯

২. একটি সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য ... ১৮
টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি,
জামশেদপুর, ৬ জুলাই ১৯২৯

৩. ধ্বংসাত্মক শ্রমিক নীতি ... ১৯
শ্রমিকনীতি সম্পর্কে বিবৃতি, জামশেদপুর,
৭ জুলাই ১৯২৯

৪. ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানে বিরত থাকার প্রশ্ন ... ২১
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি,
১১ জুলাই ১৯২৯

৫. ব্যক্তি, জাতি এবং আদর্শ ... ২২
চুঁচুড়ায় হুগলি জেলা ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা,
রবিবার, ২২ জুলাই ১৯২৯

৬. লিবার্টির সম্পাদকের নিকট পত্র ... ২৫
২৩ জুলাই ১৯২৯

৭. কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মনোনয়ন ... ২৫
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে
বিবৃতি, ২৩ জুলাই ১৯২৯

৮. আমদানি করা টিন-প্লেটের উপর থেকে
সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার ... ২৭
টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘট সম্পর্কে সংবাদপত্রে
বিবৃতি, ৩ আগস্ট ১৯২৯

৯. রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস ... ২৮
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে
বিবৃতি, ৪ আগস্ট ১৯২৯

১০. স্বাধীনতার যথার্থ রূপ ... ২৮
রাজসাহী জেলা ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ,
১৭ আগস্ট ১৯২৯

১১. শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ... ৩০
রাজসাহী ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২০ আগস্ট ১৯২৯

১২. আপসহীন মনোভাব এবং সংগ্রাম ... ৩২
জামশেদপুরের টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের
সমর্থনে বিবৃতি, ২৮ আগস্ট ১৯২৯

১৩. রাজনৈতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য ... ৩৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে "ফ্রি প্রেস"-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিবৃতি, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

১৪. সরকারের বিশ্বাসভঙ্গ : বরিশালে রাজনৈতিক বন্দিদের অনশন-ধর্মঘটের কারণ প্রসঙ্গে ... ৩৩
২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯-এ দেওয়া বিবৃতি

১৫. গণসংগঠনের অপরিহার্যতা এবং সামাজিক বিপ্লব ... ৩৫
২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯-এ রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

১৬. বরিশালের সতীন সেনের অনশন-ধর্মঘট প্রসঙ্গে আরও কিছু ... ৩৭
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি, ৪ অক্টোবর ১৯২৯

১৭. বরিশালের সতীন সেনের আত্মাহুতি সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট আবেদন ... ৩৮
৮ অক্টোবর, ১৯২৯

১৮. শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তের নিকট আবেদন ... ৩৯
১০ অক্টোবর, ১৯২৯

১৯. সতীন সেনের অনশন-ধর্মঘট ... ৪২
সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের নিন্দা করে বিবৃতি, ১৫ অক্টোবর ১৯২৯

২০. পাঞ্জাব এবং বাংলা : ছাত্র এবং রাজনীতি ... ৪৩
পাঞ্জাবি ছাত্রসম্মেলনের লাহোর অধিবেশনে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ১৯২৯

২১. পাঞ্জাবের যুবকদের নিকট আবেদন, ... ৫০
লাহোর, ২৪ অক্টোবর ১৯২৯

২২. সেবাদলের সাহায্যের জন্য আবেদন, ... ৫১
লাহোর, ২৪ অক্টোবর ১৯২৯

২৩. যতীন্দ্রনাথ দাসের উপযুক্ত একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য আবেদন ... ৫১
যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিনের সভায় ভাষণ, ২৮ অক্টোবর, ১৯২৯

২৪. ঔপনিবেশিকতার যথার্থ রূপ ... ৫৩
হাউস অব লর্ডস্-এ বিতর্ক সম্পর্কে বিবৃতি, ৮ নভেম্বর ১৯২৯

২৫. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ প্রত্যাহার ... ৫৪
কারণ ব্যাখ্যা করে বিবৃতি, ২২ নভেম্বর ১৯২৯

২৬. আমাদের জাতীয় জীবনে যুবকের ভূমিকা ... ৫৫
প্রথম মধ্যপ্রদেশ যুবসম্মেলনে সভাপতিরূপে

	ভাষণ, নাগপুর, ২৯ নভেম্বর ১৯২৯		
২৭.	দক্ষিণ, বাম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্ব	...	৫৯
	নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বিবৃতি, ৬ ডিসেম্বর ১৯২৯		
২৮.	ছাত্র এবং তাঁদের আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব	...	৬২
	১৯২৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রচারিত বিবৃতি		
২৯.	স্বাধীনতার স্বার্থে আমূল রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা	...	৬৬
	১৯২৯ সালের ১ ডিসেম্বর অমরাবতীতে প্রদত্ত মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ		
৩০.	বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনে বিবাদ	...	৭০
	এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিবৃতি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৯		
৩১.	সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি	...	৭১
৩২.	ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন	...	৭২
	বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রচারিত বিবৃতি, ২০ ডিসেম্বর ১৯২৯		
৩৩.	যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য	...	৭৩
	মেদিনীপুর সম্মেলনে ভাষণ, ২১ ডিসেম্বর ১৯২৯		
৩৪.	সমান্তরাল সরকার এবং পূর্ণ বর্জন	...	৭৫
	১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় বিরোধী প্রস্তাব		
৩৫.	পূর্ণ বর্জনের কর্মসূচি	...	৭৭
	কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভাষণ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯		
৩৬.	পূর্ণ বর্জন	...	৭৮
	এক সাক্ষাৎকারের সময় প্রদত্ত বিবৃতি, ২ জানুয়ারি ১৯৩০		
৩৭.	অসাংবিধানিক রায়	...	৭৯
	"ফ্রি প্রেস"-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বিবৃতি, ৭ জানুয়ারি ১৯৩০		
৩৮.	সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার	...	৮১
	বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি, লাহোর, ৮ জানুয়ারি ১৯৩০		
৩৯.	স্বাধীনতার প্রস্তাব	...	৮৪
	কলকাতার হরিশ পার্কের সভায় ভাষণ, ১০ জানুয়ারি ১৯৩০		
৪০.	বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আরও কিছু	...	৮৬
	বান্দাবিল্লার অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি, যশোহর, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩০		
৪১.	কলকাতার মেয়রের নিকট পত্র	...	৮৬
	২৩ জানুয়ারি ১৯৩০		
৪২.	বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ এবং বাংলা কংগ্রেস	...	৮৭
	১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি		
৪৩.	নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস	...	৮৮

১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি

৪৪. বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স ... ৮৮

১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি

৪৫. স্বাধীনতা দিবস ... ৮৯

কলকাতার নাগরিকবৃন্দের প্রতি আবেদন,
২৪ জানুয়ারি ১৯৩০

৪৬. কারাগারের রোজনামচা ... ৮৯

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৩০

৪৭. মেয়রের ভাষণ ... ৯৩

১৯৩০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা
কর্পোরেশনের সভায় প্রদত্ত

৪৮. কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে
শ্যামবাজারে বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেটের এক
সভায় প্রদত্ত ভাষণ, ... ৯৮
১৯ অক্টোবর ১৯৩০

৪৯. স্বদেশীর সমর্থনে ... ৯৯

১৯৩০ সালের ২৫ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক
কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি

৫০. কংগ্রেসের কর্মসূচি এবং যুবসমাজ
মেয়র এবং প্রদেশের কংগ্রেস দলের
নেতারূপে ভাষণ, ... ১০০
১১ ডিসেম্বর ১৯৩০

৫১. অনেক বন্ধুত্বের প্রথম সূত্র ... ১০২

কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভাষণ,
শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩০

৫২. মওলানা মহম্মদ আলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ... ১০২

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে
কর্পোরেশনের সভায় প্রেরিত বার্তা,
বুধবার, ৭ জানুয়ারি ১৯৩১

৫৩. আংশিক মার্জনা নিষ্ফল অপেক্ষাও ন্যূন ... ১০৩

মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস
নেতাদের মুক্তিদান-বিষয়ে ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি
এবং কলকাতার মেয়র হিসাবে বিবৃতি,
২৫ জানুয়ারি ১৯৩১

৫৪. রাজবন্দীদের অপরাধ মার্জনার প্রশ্ন ... ১০৪

১৯৩১ সালের ২৫ জানুয়ারি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে
মুক্তিলাভের পর মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি

৫৫. স্বাধীনতা লাভের পথ ... ১০৫

বোম্বাই যাত্রার পূর্বে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৫ মার্চ ১৯৩১

৫৬. সকল শ্রেণীর বন্দীদের অপরাধ মার্জনার জন্য দাবি ... ১০৬

মহাত্মাজীর সঙ্গে দিল্লী পৌঁছনোর পর বিবৃতি, ২০ মার্চ ১৯৩১

৫৭.	স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য এবং কর্মসূচি অল ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারত সভার করাচী অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ২৭ মার্চ ১৯৩১	...	১০৭
৫৮.	ভারতের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য করাচিতে অল ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ, ৫ এপ্রিল ১৯৩১	...	১০৮
৫৯.	বাংলাদেশের কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য বি পি সি সি-র নির্বাচন সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত প্রেস বিবৃতি, ১১ এপ্রিল ১৯৩১	...	১১৬
৬০.	ঐক্যস্থাপনের জন্য আবেদন ১৩ এপ্রিল ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি	...	১১৭
৬১.	সিলেট কংগ্রেসের বিতর্কের নিষ্পত্তি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৭ এপ্রিল ১৯৩১	...	১১৮
৬২.	প্রখ্যাত ভারতীয় স্থপতি এস. সি. চ্যাটার্জির কাজ বিদায়ী মেয়র হিসাবে ভাষণ, ১৯ এপ্রিল ১৯৩১	...	১১৯
৬৩.	আমার জীবনের স্বপ্ন ফরিদপুরে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে প্রদত্ত ভাষণ, ২০ এপ্রিল ১৯৩১	...	১২০
৬৪.	ফরিদপুর কংগ্রেসের বিতর্কের মীমাংসা ২৩ এপ্রিল ১৯৩১-এ ফরিদপুর জেলায় কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে অমীমাংসিত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি সম্পর্কে বিতর্ক	...	১২১
৬৫.	ময়মনসিংহের ঘটনা, এবং তারপর ২৫ এপ্রিল ১৯৩১-এ কলকাতার সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি	...	১২১
৬৬.	কুষ্ঠিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন কুষ্ঠিয়ার ভোটদাতাদের প্রতি আবেদন, ১০ মে ১৯৩১	...	১২৩
৬৭.	পূর্ণ স্বাধীনতা ও তার তাৎপর্য নোয়াখালিতে প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ মে ১৯৩১	...	১২৩
৬৮.	তরুণসমাজ ও ভারতের ভবিষ্যৎ নোয়াখালি যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ মে ১৯৩১	...	১২৪
৬৯.	দুর্দশার কবলে উত্তরবঙ্গ ২২ মে ১৯৩১-এর আবেদন	...	১২৫
৭০.	ভারতের বন্ধনমোচনের অর্থ মানবজাতির প্রাণ রক্ষা মথুরায় ইউ. পি. নওজোয়ান ভারত সভার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৬ মে ১৯৩১	...	১২৫
৭১.	সারা বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আবেদন বি. পি. সি. সি-তে মতবিরোধ সম্পর্কে বিবৃতি, ২ জুন ১৯৩১	...	১৩১
৭২.	দায়িত্বজ্ঞানহীন সব অভিযোগ দেশবাসীর প্রতি আবেদন, ১১ জুন ১৯৩১	...	১৩২
৭৩.	শ্রমিক ইউনিয়ন ও বেকার সমস্যা কলকাতায় ৪ জুলাই ১৯৩১-এ অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ	...	১৩৪
৭৪.	শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন কোন পথে	...	১৩৮

	১১ জুলাই ১৯৩১-এর শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসে মস্কোজাত বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবৃতি		
৭৫.	ভারত বাঁচলেই মানবজাতি বাঁচবে নড়াইলে প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ জুলাই ১৯৩১	...	১৪০
৭৬.	বঙ্গদেশের বিতর্ক সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ১২ আগস্ট ১৯৩১	...	১৪৩
৭৭.	গোল-টেবিল বৈঠক বয়কটকে স্বাগত বি. পি. সি. সি-র প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রদত্ত ভাষণ, ১৫ আগস্ট ১৯৩১	...	১৪৪
৭৮.	বি. পি. সি. সি-র নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকের প্রতি পত্র, ১৮ আগস্ট ১৯৩১	...	১৪৫
৭৯.	ত্রাণ তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন বঙ্গদেশা কংগ্রেসের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির প্রেসিডেন্টকে লিখিত পত্র, ২২ আগস্ট ১৯৩১	...	১৪৬
৮০.	কলকাতার পুর-নির্বাচন পরিচালনের অধিকার বি. পি. সি. সি-র প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১	...	১৪৭
৮১.	বি. পি. সি. সি-র প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ থেকে ইস্তফার কারণ কংগ্রেসকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১	...	১৪৮
৮২.	হিজলি বন্দিশালায় ও খড়্গপুর হাসপাতালে রাজবন্দিদের অবস্থা হিজলি এবং খড়্গপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩১	...	১৪৯
৮৩.	ব্যক্তিকে একাত্ম হতে হবে জাতির সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি প্রদত্ত ভাষণ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১	...	১৫০
৮৪.	জামশেদপুরের পরিস্থিতি গুরুতর ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি	...	১৫২
৮৫.	হিজলি বন্দিশালায় অনশনরত রাজবন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলল না ১ অক্টোবর ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি	...	১৫৩
৮৬.	নোওয়াপাড়া থানায় হয়রানি ১৪ অক্টোবর ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি	...	১৫৪
৮৭.	বঙ্গদেশ আবার নিজেই নিজেকে উদ্ধার করুক ১৬ অক্টোবর ১৯৩১-এ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে প্রদত্ত বিবৃতি	...	১৫৬
৮৮.	জামশেদপুরের শ্রমিকদের দাবি ও অভিযোগ টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ অক্টোবর ১৯৩১	...	১৫৭
৮৯.	চট্টগ্রাম এবং হিজলিতে তদন্তের ভিত্তিতে উত্থাপিত দাবি সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ২৩ অক্টোবর ১৯৩১	...	১৫৯
৯০.	ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, এবং হয়রানি চাঁদপুর থেকে প্রদত্ত বিবৃতি, ১০ নভেম্বর ১৯৩১	...	১৬০
৯১.	আত্মমর্যাদা, পৌরুষ এবং জনসাধারণের অধিকার পদদলিত	...	১৬৩

গ্রেপ্তারের সময়ে প্রদত্ত বাণী, ১২ নভেম্বর ১৯৩১

৯২. হিজলি এবং চট্টগ্রামের জঘন্য অত্যাচারের প্রতিকার করতেই হবে ... ১৬৩
হরিশ পার্কের বক্তৃতা, ২৬ নভেম্বর ১৯৩১

৯৩. বয়কট কর্মসূচি ... ১৬৫
খুলনা পরিত্যাগের আগে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩১

৯৪. চুক্তি সত্ত্বেও নিপীড়ন সমানে চলছিল ... ১৬৫
মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩১

৯৫. কংগ্রেসের উচিত সাহসে বুক বাঁধা ... ১৬৭
শিবাজী মন্দিরে মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ,
২৪ ডিসেম্বর ১৯৩১

৯৬. একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা ... ১৬৮
কলকাতা ত্যাগের পূর্বে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি,
৩ জানুয়ারি ১৯৩২

৯৭. আমার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য চিন্তা ... ১৬৮
এক বন্ধুকে লিখিত পত্র, ১৬ এপ্রিল ১৯৩২

৯৮. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে ... ১৭০
কবিরাজ অনাথনাথ রায়কে লিখিত পত্র, ৪ জুন ১৯৩২

৯৯. সঠিক রোগনির্ণয়ের জন্য এক্স-রে ... ১৭০
জব্বলপুর থেকে লিখিত এক বন্ধুর প্রতি পত্র, ১০ জুন ১৯৩২

১০০. শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত ... ১৭১
মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি থেকে লেখা বন্ধুর প্রতি পত্র,
৩১ জুলাই ১৯৩২

১০১. ফুসফুসের রোগ ধরা পড়েছে ... ১৭১
মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি থেকে লেখা কলকাতার এক বন্ধুকে
লেখা চিঠি, ১৮ আগস্ট ১৯৩২

১০২. ডাঃ আলমের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা ... ১৭২
বেগম আলমকে লিখিত পত্র, ২ নভেম্বর ১৯৩২

১০৩. পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় তিক্ত-বিরক্ত ... ১৭৩
মিঃ সত্যমূর্তিকে লিখিত পত্র, ১৯ নভেম্বর ১৯৩২

১০৪. তাঁর ওপর পরীক্ষায় ক্লান্ত ... ১৭৪
যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালি স্যানাটেরিয়াম থেকে মাদ্রাজে
এক বন্ধুর প্রতি পত্র, ১৯ নভেম্বর ১৯৩২

১০৫. চিকিৎসা চলছে, উন্নতি নেই ... ১৭৫
বিমলকান্তি ঘোষকে লেখা চিঠি, ২২ নভেম্বর ১৯৩২

১০৬. এখনও রোগে শয্যাশায়ী ... ১৭৬
ভাওয়ালি থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লিখিত পত্র

১০৭. বঙ্গবাসীর প্রতি বিদায় বাণী, ... ১৭৭
২ মার্চ ১৯৩৩

নির্ঘণ্ট ... ১৭৯

নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাসমগ্রের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হল। পূর্বের দুইটি খণ্ডে আমরা ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্র, বিবিধ রচনা ও বক্তৃতা প্রকাশ করেছি। আমাদের সংগ্রহশালা পরবর্তীকালে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা ও রচনা এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় তিনি দেশের জনজীবনে অনন্য ও উদীয়মান এক নেতা এবং ভারতের রাজনীতিতে বামপন্থার প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজির ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী পরাজিত হওয়ায় সংগ্রামের প্রস্তুতিতে অমূল্য সময় নষ্ট হয়। মন্দের ভাল যে সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে।

১৯২৯-এর প্রথমেই উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। ভগৎ সিং-এর ফাঁসি ও যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মবলিদান দেশে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঐ বছর সুভাষচন্দ্র বাঙ্গলার ও অন্যত্র কয়েকটি ছাত্র ও যুব সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। ছাত্র ও যুবকদের উদ্দেশ্যে চরিত্রগঠনের জন্য দেশপ্রেম, ত্যাগ, সততা ও সাহস অবলম্বন করে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে অটল থাকার কথা বারবার বলতে থাকেন। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ১৯২৯-এ শুরু হয়। বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নবজাগরণ সুভাষচন্দ্রকে খুবই উৎসাহিত করে। বাঙ্গলার কংগ্রেস সংগঠনে তিনি নরম ও দক্ষিণপন্থীদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। বছরের শেষে বড়লাট সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে গোলটেবিল বৈঠকের কথা ঘোষণা করবার পর জাতীয়তাবাদী মহলে দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। সর্বদলীয় কমিটিতে জওহরলাল নেহরু সমেত কংগ্রেসী সদস্যরা ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারে সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত হন। তিন নেতা সুভাষচন্দ্র বসু, সৈফুদ্দীন কিচলু ও আবদুল বারি পৃথক ইস্তাহারে ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও ব্রিটিশ সরকারের শর্তে আলোচনার বিরোধিতা করেন।

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার পর সুভাষচন্দ্র পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে যুবসমাজ, কৃষক ও শ্রমিকদের একত্র করে জাতীয় দাবি আদায়ের জন্য এক শক্তিশালী সক্রিয় মোর্চা প্রস্তুত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে মুক্তির সংগ্রাম একটি সর্বাত্মক সংগ্রাম, আধাআধি কাজ করে ফল হবে না। সর্বাত্মক বয়কট চালু করে দেশে একটি সমান্তরাল সরকার গঠনের দিকে এগোতে হবে। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে বলতে পারি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কোন সময়েই দেশের স্বাধীনতাকামী সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে লড়াই পরিচালনা করার চেষ্টা করেননি। আনুষ্ঠানিক আইন অমান্য এবং বড় বড় সভা ও শোভাযাত্রার মধ্যেই তাঁদের কর্মসূচি সীমিত ছিল। ১৯৪২-এর শেষ লড়াইয়ের সময়ও আমরা একই দৃশ্য দেখেছি যখন নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কোনরকম নির্দেশ না পেয়ে সংগ্রামী জনগণ নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র লাহোর কংগ্রেসের সময়েই বলেছিলেন যে কংগ্রেসের আর্থ-সামাজিক প্রোগ্রাম কংগ্রেসের হাতেই রাখতে হবে। দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন সংগঠনের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।

লাহোর কংগ্রেস থেকে কলকাতা ফেরার পরই সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

১৯৩০-এ গান্ধীজি 'ডাণ্ডি অভিযান' যখন আরম্ভ করলেন সুভাষচন্দ্র তখন জেলে। দেশব্যাপী

আন্দোলনের গতি তিনি জেলে বসে নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার অভিযান ১৯৩০-এর এপ্রিলে সংঘটিত হল। তারপর কয়েকমাস ধরে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের ধস্তাধস্তি চলল। জুন মাসে সরকার সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলেন কিন্তু প্রায় সব রাজনৈতিক দলই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করল। ফলে দেশবাসীর মনোবল বেড়ে গেল। সুভাষচন্দ্র জেলে থাকতেই কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন কিন্তু বছরের শেষে মুক্তি পাবার পর কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর মেয়রের ভাষণ এই খণ্ডে ছাপা হয়েছে। বছরের শেষে লণ্ডনে কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই গোলটেবিল বৈঠক বসল। কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসব হল। ভারতবর্ষকে ইংরাজ সরকার উপহার দিলেন "রক্ষা কবচ" ও "যুক্তরাষ্ট্রের" এক অভিনব পরিকল্পনা।

১৯৩১-এর শুরুতেই সুভাষচন্দ্র সরকারের সঙ্গে এক বড় রকম সংঘর্ষের মুখোমুখি হলেন। ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে এক শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেবার সময় মেয়র সুভাষচন্দ্র অশ্বারোহী পুলিশের হাতে আক্রান্ত হন এবং আবার গ্রেপ্তার হন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন সুভাষচন্দ্র জেলে। চুক্তির শর্তগুলি দেখে সুভাষচন্দ্র খুবই দমে যান। কিন্তু দলের মধ্যে বিরোধ তিনি চাননি। মুক্তিলাভ করার পর তিনি গান্ধীজির সঙ্গে কথা বলার জন্য বোম্বাই ছুটে যান। বোম্বাই থেকে দিল্লী যাবার পথে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। করাচি কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীদের ব্রিটিশ সরকার ফাঁসি দেওয়ায় গভীর শোকের মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর করাচি কংগ্রেসের প্রস্তাবটিকে সুভাষচন্দ্র স্বাগত জানান। উল্লেখযোগ্য লাহোর কংগ্রেসে জওহরলাল নেহরু সভাপতি হলেও গান্ধীজির নির্দেশে তিনি সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বামপন্থাবলম্বী নেতাদের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

করাচি কংগ্রেসের পাশাপাশি ভগৎ সিং প্রতিষ্ঠিত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁর বৈপ্লবিক আর্থ-সামাজিক মতামত ব্যক্ত করেন। সমাজবাদের ভিত্তিতে সমাজ-পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন সেটা সমাজে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলির আপোস ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে রচিত কংগ্রেসের পরিকল্পনার বিকল্প ছিল। ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সারা পৃথিবীর শোষিত জনগণের মুক্তির লড়াই-এ যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সেটাও তিনি বুঝিয়ে বলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতে গান্ধীজিকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে পাঠানো ছিল একটা ভুল পদক্ষেপ। তা সত্ত্বেও তিনি গান্ধীজিকে খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। ঠিক যেমন সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীজির বিরুদ্ধে ভিন্নভিন্ন গোষ্ঠীর ছোট ছোট নেতাদের লাগিয়ে ছিলেন এবং সংখ্যালঘুদের সমস্যা, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ধামাচাপা দিলেন।

সুভাষচন্দ্রের মতে গান্ধীজির ইংলন্ড ভ্রমণের পরিকল্পনা মোটেই ভাল হয়নি। ইউরোপীয় রাজনীতিতে যাঁরা তখন অগ্রগণ্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও কথাবার্তার কোন চেষ্টাই হয়নি। ফলে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজি খুবই নিরাশ হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

১৯৩১-এর মে মাসে সুভাষচন্দ্র উত্তরপ্রদেশের নওজোয়ান ভারত সভায় এবং জুলাই মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ডিসেম্বরে নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করার জন্য সুপারিশ করা হয়। নতুন বড়লাট উইলিংডন গান্ধীজির সাক্ষাৎ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং আইন অমান্য আবার শুরু করার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ১৯৩২-এ তারা গান্ধীজির কৌশল বুঝে নিয়েছিল এবং এবার তারাই পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ শুরু করে। কেবল যে নেতৃবৃন্দকে বন্দী করা হয় তাই নয় সারা দেশে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩২-এর জানুয়ারিতে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশের এক অখ্যাত জায়গায় সিওনি জেলে রাখা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে সেখানে আনা হয়। বাল্যকাল থেকেই শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী বিভাবতী সুভাষচন্দ্রকে স্নেহ ও সমর্থন জুগিয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের চিঠিপত্র রচনাসমগ্রে প্রকাশ করা হচ্ছে।

বসু ভ্রাতৃদ্বয় জেল থেকে দেশের ঘটনা প্রবাহ খুবই আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ১৯৩২-এর

আগস্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব প্রকাশ করবার পর গান্ধীজি পৃথক নির্বাচনপ্রথার বিরুদ্ধে অনশন আরম্ভ করলেন। গান্ধীজির অনশন এবং পুণা চুক্তি নিয়ে বিতর্ক স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে পেছনে ফেলে দিল। সুভাষচন্দ্রের মতে ব্রিটিশ সরকার পুণা চুক্তি গ্রহণ করলেও পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন। দেশের সামনে অস্পৃশ্যতা নিবারণ ও মন্দিরে অবাধ প্রবেশের আন্দোলন বড় হয়ে দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র মোটেই এই নতুন পরিস্থিতি পছন্দ করলেন না।

সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় দুই ভাইকে জব্বলপুরে স্থানান্তরিত করা হল। সেখান থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার অছিলায় সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে মাদ্রাজ এবং পরে ভাওয়ালি ও লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া হল। মেজবৌদিদি বিভাবতী ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইংরাজ সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে চিকিৎসার জন্য নিজের খরচে ইউরোপে যাবার অনুমতি দেওয়া হল। ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুলিশ পাহারায় জব্বলপুর থেকে বোম্বাই রওনা হলেন। তাঁর জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। এই খণ্ডটি আমরা বাঙালীদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের আবেগপূর্ণ বিদায়বাণী দিয়ে শেষ করেছি।

পঞ্চম খণ্ড প্রকাশে অতিরিক্ত বিলম্ব হওয়ায় আমরা দুঃখিত। তর্জমার কাজ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। আনন্দ পাবলিশার্সের আন্তরিক সহযোগিতায় কাজটি সুসম্পন্ন হয়েছে এবং আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। পরবর্তী খণ্ডের তর্জমার কাজ চলছে। আশা রাখি সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে আরও দুটি খণ্ড প্রকাশ করতে পারব।

নেতাজী ভবন
কলিকাতা ৭০০ ০২০
৭ জানুয়ারি ১৯৯৬

শিশিরকুমার বসু
সুগত বসু

বাংলার বিশ্বজনীনতা এবং সমাজতন্ত্রের বাণী

রংপুর রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ৩০ মার্চ ১৯২৯

বিশ্বজগৎকে দেবার মতো বাংলার নিজস্ব একটি বাণী আছে। এই বাণী হল বাংলার জীবন এবং ইতিহাসের সামগ্রিক যোগফল এবং অতীতে বাংলা যেমন এই বাণী শোনাবার চেষ্টা করেছে এখনও তেমনই করছে। সেই বাণী মিশে আছে বাংলার চরিত্রে। বাংলার হৃদয় সর্বদাই বৈচিত্র্য, সমন্বয় এবং ভ্রাতৃত্বের জন্য উন্মুক্ত। বাংলা সর্বদাই নূতনত্বের প্রয়াসী। বাংলার সহজাত চরিত্র সর্বদাই গতিশীল, স্থাণু নয়। তাকে বলা যায় বৈপ্লবিক। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাস এমন অজস্র দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, যা থেকে দেখা যায় সে সর্বদাই এগিয়ে চলেছে এবং আত্মীকরণ করছে।

একমাত্র সত্যই আমাদের আদর্শ এবং বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য এবং ধর্মে অনুপ্রেবশ ঘটা সত্ত্বেও কেন সে সর্বদাই নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে নবাগতদের সত্যকে আত্মীকরণ করেছে, এর থেকেই তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই পূর্ণাঙ্গ 'বিপ্লব'-এর ফলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্মের সমৃদ্ধি হয়েছে। এই লক্ষ্যের দিকে প্রচেষ্টা এখনও অব্যাহত এবং সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের সমগ্র জাতিপ্রথা উচ্ছেদ করতে হবে, অথবা সকল জাতিকে শূদ্র অথবা ব্রাহ্মণ একটি জাতিতে পরিণত করতে হবে।

যেমন ধর্মে তেমনই সাহিত্যে বাংলা বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্র, কাশীরাম, কৃত্তিবাস এবং রামপ্রসাদ চিন্তা এবং কৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলার অভিনব আবিষ্কারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হয়ে আছে।

বাংলা তার সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের কথা বিস্মৃত হয় না এবং এই ক্ষেত্রে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্য গড়ে উঠেছে, অতীতে তা অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করেছে। এক কথায় আজকের বাংলা জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বজনীনতার সন্তান।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সাময়িক এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল এবং বাংলার উপরে এল প্রচণ্ড এক আঘাত। নিজের চরিত্রে অটল বাংলা জেগে উঠে রাজা রামমোহনের নব আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করল। ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থান বাংলাকে রক্ষা করল খ্রিস্টান যাজকদের আক্রমণ থেকে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং বিবেকানন্দের আবির্ভাবে রাজা রামমোহনের অসমাপ্ত কর্ম প্রেরণা লাভ করল। বাংলার ধর্মে, দর্শনে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধর্মের নব জাগরণ প্রতিফলিত হল এবং ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচারে হিন্দু এবং মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হল।

বাংলার ইতিহাস যিনি নূতুন ধারায় প্রবাহিত করান তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। মানুষ গড়াই তাঁর জীবনের ব্রত—প্রায়ই তিনি এ-কথা বলতেন। মানুষ গড়ার কাজে স্বামী বিবেকানন্দ বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি আলিঙ্গন করেছেন সমগ্র সমাজকে। "কলকারখানা, পর্ণকুটির এবং বাজার থেকে নতুন ভারতের অভ্যুত্থান হোক"—তাঁর এই অগ্নিগর্ভ শব্দগুলি এখনও প্রতিটি বাঙালি-গৃহে অনুরণিত।

কার্ল মার্কসের গ্রন্থে এই সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হয়নি। এর জন্ম ভারতের চিন্তা এবং সভ্যতায়। স্বামী বিবেকানন্দ গণতন্ত্রের যে-বাণী প্রচার করেছিলেন, দেশবন্ধু দাশের রচনা

এবং কর্মকৃতিতে তা পরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বলেছেন—যাঁরা মাটি চাষ করে, মাথার ঘাম ঝরিয়ে আমাদের অন্ন যোগায়, দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও যাঁরা আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ধর্মের মশাল প্রজ্জ্বলিত রেখেছে, তাঁদের মধ্যেই নারায়ণ বাস করেন।

জাতিগঠনের পথে প্রথম সোপান প্রকৃত মানুষ গড়া এবং দ্বিতীয় সোপান সংগঠন। বিবেকানন্দ এবং অন্যান্যরা মানুষ গড়ার চেষ্টা করেছেন, আর দেশবন্ধু চেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করতে এবং তিনি এমন এক সংগঠন তৈরি করেছেন যা এমন কি ব্রিটিশদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে।

ইদানীং সমাজতন্ত্রবাদের নতুন ভাবধারা পাশ্চাত্য থেকে ভারতে আসছে এবং তা অনেকের ভাবনাকে বিপ্লবী করে তুলছে ; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ভাবনা এই দেশে নতুন কিছু নয়। আমরা এমন ভাবি শুধু এই কারণে যে, আমরা নিজেদের ইতিহাসের খেই হারিয়ে ফেলেছি, যে-কোনও চিন্তাধারাকে নির্ভুল এবং পরম সত্য বলে মেনে নেওয়া ঠিক নয়। আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, কার্ল মার্কসের প্রধান শিষ্য রুশরা তাঁর ভাবাদর্শকে অন্ধের মতো অনুসরণ করেনি ; তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ কঠিন দেখে তাঁরা এক নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্ব গ্রহণ করেছে, যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার-ভোগ এবং ব্যবসায়িক কলকারখানার মালিকানার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং আমাদের আদর্শ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজ এবং রাজনীতিকে রূপ দিতে হবে। এটাই প্রতিটি ভারতবাসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা এখন আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের তৃতীয় পর্বে উপনীত হয়েছি। প্রথম পর্ব ছিল স্বদেশী যুগ, দ্বিতীয় পর্ব বিপ্লবীদের যুগ এবং তৃতীয় পর্ব অসহযোগ এবং সমাজতন্ত্রের। অনেকে ভাবতে পারেন যে, স্বরাজের জন্য আমাদের সংগ্রামের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু হিতকর কোনও প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয়নি। বিগত পঁচিশ বছরের আন্দোলনের ফলে আমরা আমাদের আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি। দেশ ক্রমশ সংগঠিত হয়ে উঠছে এবং বিশ্বে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমাদের জন্মলব্ধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

একটি সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য

টিনপ্লেট শ্রমিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি, জামশেদপুর, ৬ জুলাই ১৯২৯

বোম্বাই থেকে কয়েকজন বন্ধু আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, টিনপ্লেট কোম্পানিতে ধর্মঘট মীমাংসা না করার জন্য আমি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিকে দায়ী করেছি কেন এবং প্রয়োজন হলে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানিতে সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট সমর্থন করছি কেন। আমার যুক্তি অত্যন্ত পরিষ্কার। আমি যত দূর জানি টাটারা টিনপ্লেট কোম্পানির এক-তৃতীয়াংশ শেয়ারের মালিক, বাকিটার মালিক বার্মা অয়েল কোম্পানি। অধিকন্তু, টিনপ্লেট কোম্পানির বোর্ডে টাটাদের দু'জন ডিরেক্টর আছে, যাঁরা সহজেই সেখানে নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই টিনপ্লেট কোম্পানি টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির উপর নির্ভরশীল এবং ধর্মঘট মীমাংসার জন্য শেষোক্ত কোম্পানি প্রথমোক্ত কোম্পানির উপর সহজেই যথেষ্ট চাপ দিতে পারে। টিনপ্লেট কোম্পানির জমি টাটাদের কাছ থেকে ইজারা নেওয়া। টাটারা টিনপ্লেট কোম্পানিকে বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহ করে। টিনপ্লেট কোম্পানির বৈদ্যুতিক মেরামতির কাজ করে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি।

আমি আরও শুনেছি যে, ধর্মঘটের সময় টাটারা টিনপ্লেট কোম্পানিকে এমন সব কর্মী দিয়ে সাহায্য করেছে, যারা টাটার প্রাক্তন কর্মী। এই সমস্ত কারণেই টিনপ্লেট কোম্পানিকে ধর্মঘট

মীমাংসায় বাধ্য করতে টাটার দু' মিনিটও সময় লাগবে না ; এবং টাটাকে এ-কাজে প্রবৃত্ত করতে সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট ডাকার প্রয়োজন হতে পারে। টাটার কর্মীরাও সন্তুষ্ট নয় এই কথা মনে রাখলে প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা কঠিন নয়। মিঃ মানিক হোমি যে-আশা দিয়েছিলেন তা পূর্ণ হয়নি এবং যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষিত হয়নি। তিনি উৎসাহকে অত্যন্ত উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এবং তাঁর শ্রমিক সঙ্ঘ স্বীকৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ নিজের দাবি কমিয়ে আনেন। কিন্তু মিঃ হোমি নিজেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাত্ম মনে করলেও শ্রমিকরা এখনও উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাঁরা এখনও মিঃ হোমি যা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পাওয়ার আশা করে। তাঁদের সহানুভূতি লাভের জন্য শুধু তাঁদের অপূর্ণ আশার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই হবে। সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটই আমাদের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু টাটারা যদি টিনপ্লেটে ধর্মঘট মীমাংসার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা না করে, তবে যত বেদনাদায়কই হোক না কেন, এ-কাজ হয়তো আমাদের করতেই হবে। —"ফ্রি প্রেস"।

ধ্বংসাত্মক শ্রমিকনীতি

শ্রমিকনীতি সম্পর্কে বিবৃতি, জামশেদপুর, ৭ জুলাই ১৯২৯

বিষয়টি জটিল করে তুলতে চাইনি বলেই টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস সম্পর্কে বিবৃতি প্রচারে আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই বিরত থেকেছি। কিন্তু এখন, যখন আমি এ-কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি, তখন আমার মনে হয় আমার নিজের এবং টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল ওয়ার্কস সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের স্বার্থে অবস্থাটা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থা বুঝিয়ে বলতে গেলে ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে যখন ধর্মঘট হয়, তার পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনার প্রয়োজন হবে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, কোম্পানি এবং ব্যবস্থাপকরা শ্রমিকদের সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ করেনি। তার ফলে শিল্প বিশ্রীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে যখন মীমাংসার জন্য আলোচনা শুরু হয়, আমি দেখতে পেলাম যে, ব্যবস্থাপকরা এবং ডিরেক্টররা উভয়েই মিঃ মানিক হোমির সঙ্গে কোনও প্রকার সম্পর্ক না-রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাঁরা এর সমর্থনে কয়েকটি যুক্তিও দেখালেন। একটি শর্তসাপেক্ষে মীমাংসার শর্তগুলি মিঃ হোমিসহ সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। শর্তটি ছিল এই যে, যত দিন মিঃ হোমি এবং তাঁর নবসংগঠিত শ্রমিক সঙ্ঘ কোম্পানির স্বীকৃতি না পায়, তত দিন মিঃ হোমি কোনও মীমাংসা চূড়ান্তরূপে স্বীকার করবেন না। মিঃ হোমির এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি একমত হইনি, তার প্রথম কারণ—একটি ধর্মঘটের মীমাংসার মধ্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় টেনে আনছিলেন এবং দ্বিতীয় কারণ—একই জায়গায় এবং একই শ্রমিকদের মধ্যে দুটি ইউনিয়ন 'ট্রেড ইউনিয়ন নীতি'-র পরিপন্থী। একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিয়ে মীমাংসায় বাধা সৃষ্টি না করতে আমি মিঃ হোমিকে অনুরোধ করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তিনি ইচ্ছা করলে সহজেই কোম্পানির স্বীকৃত শ্রমিক সংগঠন দখল করে তার একজন কর্মকর্তা হতে পারেন। তখন আর কোম্পানি তাঁকে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি করতে পারবে না, পক্ষান্তরে, বর্তমান অবস্থায় কোম্পানি অবশ্যই বলতে পারে যে, তাঁর কোনও স্বীকৃত পদাধিকার নেই।

অধিকন্তু, তিনি শুধু ঠিক পথে অগ্রসর হলে তাঁর স্বীকৃতির জন্য আমার এবং শ্রমিকসমিতির পূর্ণ সমর্থনের নিশ্চয়তাও তাঁকে আমি দিয়েছিলাম। তবু মিঃ হোমি তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। তিনি জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে স্থির-করা মীমাংসার শর্তাবলী গ্রহণে বাধা

দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু কর্মীরা তাঁর কথায় কান দিলেন না। তখন তিনি আমার, কর্মচারিসমিতির, আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার এবং ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে তীব্রতম এবং কুৎসাপূর্ণ প্রচার শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, কর্মচারিসংঘের সদস্যরা রাত্রে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে কর্মচারিসমিতির সদস্যদের উপরে হামলা শুরু করল। একটি ঘটনায় দিনের বেলায় কর্মচারিসমিতির কার্যালয়ে হামলা হয়, সমিতির সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং কর্মচারীদের প্রহার করা হয়।

প্রচণ্ড প্ররোচনা সত্ত্বেও আমরা সম্পূর্ণ শান্ত থাকব বলে স্থির করেছিলাম এবং আমাদের সমিতির সদস্যদের নিগ্রহ অসহায়ভাবে দেখা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় ছিল না। আমরা দীর্ঘকাল এই রকম বিপজ্জনক অবস্থায় ছিলাম এবং আমাদের সদস্যদের নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে নীতিজ্ঞানবর্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যখন আমরা সাফল্য প্রায় অর্জন করতে চলেছি এবং কর্মচারিসংঘ যখন ভেঙে পড়ার মুখে, তখনই কোম্পানি হঠাৎ নিজের পথ থেকে সরে গিয়ে মিঃ হোমি এবং তাঁর শ্রমিকসংঘকে স্বীকৃতি দিল এবং এইভাবে কর্মচারিসংঘের পুনরুজ্জীবনে সাহায্য করল। কর্মচারিসংঘকে স্বীকৃতি দিয়ে কোম্পানি ট্রেড ইউনিয়ন নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, যে-নীতি একই জায়গায় এবং একই কর্মচারীদের জন্য দু'টি শ্রমিক সংগঠন অনুমোদন করে না। কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্ভবত, বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করা।

স্বীকৃতি এমন সময়ে দেওয়া হল যখন মিঃ হোমির শ্রমিকসংঘ ভেঙে পড়ার মুখে। শ্রমিকরা তাঁর নিয়ন্ত্রণে, শুধু এটা দেখাতেই তিনি শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট ঘোষণার কয়েকটি চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সবক'টি চেষ্টাই লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়। শ্রমিকসমিতিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় দিনের আলোয় শ্রমিকসমিতির উপর আক্রমণ কর্মচারিসংঘের শ্রমিকদের শেষ খেলা। যদিও শ্রমিকসমিতি যখন প্রচণ্ড বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল এবং স্থানীয় প্রশাসন এবং পুলিশের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছিল না, তখনও তারা বীরের মতো সংগ্রাম করছিল। আমি জানুয়ারিতে সবাইকে বলেছিলাম যে, কয়েক মাসের মধ্যেই জামশেদপুরে সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

প্রথমে টিনপ্লেট কোম্পানি মিঃ হোমিকে স্বীকৃতি দেয়। তারা ভেবেছিল এর ফলে তারা শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করতে পারবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। টাটারাও টিনপ্লেটের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। কিন্তু মিঃ হোমি শ্রমিকদের অভিযোগ দূর করার চেয়ে পরিচালন-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করতেই বেশি উৎসাহী ছিলেন। শ্রমিকসমিতিকে হেয় করতে এবং মীমাংসার শর্তাবলী শ্রমিকদের কাছে সন্তোষজনক নয় এটা দেখাতে তিনি টাটার শ্রমিকদের মাধ্যমে অসম্ভব সব দাবি করতে লাগলেন। কিন্তু নিজে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই টিনপ্লেট কোম্পানিতে তিনি শ্রমিকদের যুক্তিসম্মত এবং অত্যন্ত সামান্য দাবিগুলিকে বিসর্জন দিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে হাত মেলালেন। ফল এই হয়েছে যে, টিনপ্লেট কোম্পানিতে শ্রমিক ইউনিয়নের এক প্রাক্তন সভাপতি মিঃ হোমির বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই।

মিঃ হোমি এবং শ্রমিকসংঘকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় টাটারা সম্ভবত ভেবেছিল যে, তিনি (মিঃ হোমি) একাই শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং তার ফলে উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু টাটারা এ-কথা বুঝবার চেষ্টাই করেনি যে, মিঃ হোমির উদ্দেশ্য ছিল নিজের স্বীকৃতি আদায় করা এবং শুধু এই কারণেই তিনি শ্রমিকদের উচ্চাশার লোভ দেখিয়ে তাঁদের প্ররোচিত করছিলেন। কোম্পানির এ-কথা উপলব্ধি করবার মতো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না যে, মিঃ হোমি তাঁর দাবি সম্পর্কে নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে-শ্রমিকদের তিনি উত্তেজনার স্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁরা নরম হবে না এবং মিঃ হোমির দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য চাপ দেবে এবং তাঁকে গদিচ্যুত করতেও দ্বিধা করবে না, যেমন করেছিল টিনপ্লেটের শ্রমিকরা।

১৯২৯ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়ে আমার কিছুটা দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তার পরে সে-দায়িত্ব চলে যায় মিঃ হোমির হাতে—কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যাঁর

সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। ১৯২৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট মীমাংসার পরে কী উন্নতি হয়েছে উৎপাদনের পরিমাণ থেকেই আমরা তা জানতে পারব। টনের হিসাবে সমাপ্ত, ইস্পাতের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৯২৮ সালের অক্টোবরে ৩৫৪০০, নভেম্বরে ৩৪৭০০, ডিসেম্বরে ৩২৫০০, ১৯২৯ সালের জানুয়ারিতে ৩৯০০০, ফেব্রুয়ারিতে ৩১৩০০, মার্চে ৩৩০০০, এপ্রিলে ৩১৯০০, মে-তে ৩৩৪০০ এবং জুনে প্রায় ৩১০০০। অতএব এটা পরিষ্কার যে, মিঃ হোমির সমস্ত প্রভাব সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২৮ সালের উৎপাদনের কাছে পৌঁছতে পারেনি। পক্ষান্তরে, আমাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকসংঘের সমস্ত উগ্র প্রচার, স্থানীয় প্রশাসনের থেকে সাহায্যের অপ্রতুলতা এবং মিঃ হোমি মোদির ক্রমাগত "হরতাল" ঘোষণার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জানুয়ারি মাসে উৎপাদনের পরিমাণ ৩৯০০০ টনে পৌঁছেছিল। ফেব্রুয়ারি থেকে শ্রমিকসমিতি এমন কিছু করেনি যা মিঃ হোমি এবং তাঁর শ্রমিকসংঘের কাজে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি করে এবং কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে মিঃ হোমির দখলে ছিল এই কথা মনে রাখলে তুলনামূলক চিত্রটি অনুধাবনে সাহায্য হবে।

আমি শীঘ্রই টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রচার করব, যা হবে শিল্পটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য কোম্পানির অংশীদারদের কাছে আবেদন।

ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative) যোগদানে বিরত থাকার প্রশ্ন

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বিবৃতি, ১১ জুলাই ১৯২৯

যশোহর থেকে ফিরে কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে (Legislative) যোগদানে বিরত থাকা সম্পর্কে আমার বক্তৃতার ভুল প্রতিবেদন আমার চোখে পড়েছে।

যশোহর সম্মেলনের সামনে এই প্রস্তাব ছিল যে, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থাপক সভা পরিত্যাগ করা হবে না। যেহেতু আমি আলোচনায় সভাপতিত্ব করছিলাম, প্রশ্নটি সম্পর্কে কিছু বলে প্রতিনিধিদের রায়কে প্রভাবিত করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু বিতর্ক যখন এগিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখতে পেলাম যে, আলোচনা-বহির্ভূত প্রসঙ্গ টেনে আনা হচ্ছে এবং বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত পরিষদে (council) প্রবেশ সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনায় পর্যবসিত হচ্ছে। অতএব ভোটে দেওয়ার আগে বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমি বলব বলে স্থির করেছি।

শুরুতেই আমি বলেছিলাম বা সভার উভয়পক্ষই নিশ্চয় একমত যে, শুধু ব্যবস্থাপক সভায় কাজকর্মের মাধ্যমেই স্বরাজ আসবে না। সমগ্র দেশে কাজ না করলে যে উল্লেখযোগ্য কোনও ফল পাওয়া যাবে না এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য বিষয়টি ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানে বিরত থাকা আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবিকরূপে সাহায্য করবে কিনা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের (Bengal Legislative Council) গঠন জানা ছিল বলে আমি এ-কথা বলতে পারিনি যে, পরিষদে যোগদানে বিরত থাকা আমাদের বিশেষ সাহায্য করবে। পরিষদে কয়েকজন সব-সময়ের কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, কিন্তু পরিষদের কাজে তাঁরা তাঁদের উদ্যমের সামান্য অংশই ব্যয় করতেন এবং তাঁরা পরিষদ বর্জন করুন বা না করুন সভার বাইরে তাঁরা কংগ্রেসের কর্মসূচি পালন করে যাবেন।

ইচ্ছা করলে পরিষদ-সদস্যদের এক বিরাট অংশ, যাঁরা সমস্ত সময়ের কর্মী নন, পরিষদের

বাইরের কাজে অবশ্যই প্রচুর সাহায্য করতে পারবেন। তবে ১৯১৬ সালের সভাকক্ষ পরিত্যাগ এবং ১৯২৮ সালের সভাকক্ষ বর্জনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ-কাজ করবেন এমন আশা আমার ছিল না।

অপর দিকে, ব্যবস্থাপক-সভা পরিত্যাগ করলে আমরা প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মক্ষেত্রকে, যা আমরা দীর্ঘ সংগ্রামের পরে অধিকার করেছি, শত্রুর হাতে তুলে দেব। আমাদের ব্যবস্থাপক-সভা বর্জনের অর্থ হবে কার্যত এমন একটি সময়ে ব্যবস্থাপক-সভায় বিরোধিতার অবসান, যখন সেই বিরোধিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক সমস্যা ছাড়াও মন্ত্রিসভা গঠন এবং সাইমন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা নির্বাচনে লড়েছি এবং জয়ী হয়েছি। নির্বাচনী প্রচারে আমরা মতিলাল নেহেরুর কাছ থেকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত আদর্শ এবং কর্মসূচি তখনও অপরিবর্তিত ছিল এবং লাহোর কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা না করে পরিষদীয় কর্মসূচিতে বৈপ্লবিক কোনও পরিবর্তন ঘটানোর আগে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

এই সব কথা বলার সময় আমি এই কথাও বলেছিলাম যে, ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমার আদৌ কোনও মোহ নেই এবং অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ব্যবস্থাপক-সভা বর্জনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত, যদি মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরু তাতে সন্তুষ্ট হন। পরিষদের ভিতরে অন্যান্য সর্বক্ষণের কর্মীদের সম্পর্কেও আমি একই কথা বলব। ব্যবস্থাপক-সভা সম্পর্কে আমার কোনও মোহ নেই বলেই আমার মনে হয়েছিল যে, বিষয়টিকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখেছি এবং যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে সভার সামনে পেশ করেছিলাম। সামগ্রিকভাবে এই প্রদেশের মত, আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, বছর শেষ হওয়ার আগে বর্জন অথবা পদত্যাগের বিরুদ্ধে। এলাহাবাদে রওনা হওয়ার আগে আমরা শীঘ্রই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একটি সভা আহ্বান করে সেই সভার রায় নেব।

ব্যক্তি, জাতি এবং আদর্শ

চুঁচুড়ায় হুগলি জেলা ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, রবিবার, ২২ জুলাই ১৯২৯

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় এবং ছাত্রবৃন্দ,

আজকের এই ছাত্রসম্মেলনে আমাকে কেন ডেকেছেন তা আপনারাই ভাল জানেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, আমি নিজেকে এখনও আপনাদের মতো ছাত্র মনে করি বলেই আজকের এই সম্মেলনে আসবার ব্যগ্রতা, বরং সাহস বলাই ঠিক, অনুভব করেছি। আমি যত্নসহকারে "জীবনের বেদ" পড়ি এবং বর্তমান মুহূর্তে আমি বাস্তব জীবনে অভিজ্ঞতার কঠিন আঘাতে মানুষ যে-জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত।

প্রত্যেক জাতি অথবা ব্যক্তির নিজস্ব বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য অথবা আদর্শ আছে। সেই আদর্শ অনুযায়ী সে নিজের জীবনকে রূপ দেয়। যথাসম্ভব পরিপূর্ণরূপে সেই আদর্শ অর্জন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং এই আদর্শ বাদ দিলে তার জীবন সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন আদর্শের অনুসরণ দীর্ঘকাল ধরে চলে, তেমনই জাতির ক্ষেত্রেও এই অনুসরণ চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে, আদর্শ একটি প্রাণহীন এবং গতিহীন সত্তা নয়। এর আছে গতি, চলচ্ছক্তি এবং জীবনদায়ী শক্তি।

বিগত এক শত বছর ধরে যে-আদর্শ আমাদের সমাজে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে আমরা সর্বদা তার একটি ঝলকও দেখতে সফল না হতে পারি, কিন্তু যিনি চিন্তাশীল এবং প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, তিনি অবশ্যই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে নিয়তপ্রবাহিত অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এই আদর্শের সাধারণ প্রবণতাটি আবিষ্কার করতে পারেন। এবং এই আদর্শই যুগভাবনার আধার। কোনও মানুষ যখন এই আদর্শ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করে, সে সহজেই তাঁর লক্ষ্য এবং যাত্রাপথে তাঁর দিশারি খুঁজে পায়। কিন্তু যেহেতু এই উপলব্ধি সর্বদা আমাদের কাছে আসে না, আমরা প্রায়ই ভ্রান্ত আদর্শের পিছনে ছুটি এবং ভণ্ড গুরুর অনুসরণ করি। ছাত্রবৃন্দ, আপনারা যদি সত্যই কোনও উদ্দেশ্যের জন্য নিজেদের জীবনকে রূপ দিতে চান, তা হলে ভণ্ড পথপ্রদর্শক এবং ভ্রান্ত আদর্শের প্রভাব থেকে সর্বপ্রকারে নিজেদের রক্ষা করুন এবং নিজেদের জীবনের আদর্শকে নিজেরাই পাকাপাকিভাবে বেছে নিন।

যে-আদর্শ বাংলার ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করত, ধরা যাক পনেরো বছর আগে, তা ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সেই গৌরবজনক আদর্শের মোহময় প্রভাবে বাঙালি যুবকরা স্বার্থপরতা এবং নীচতার কলুষমুক্ত, পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ এক জীবনের দিকে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। সমাজ এবং জাতি গঠনের মূলে আছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ "মানুষ গড়া" তাঁর ব্রত, এই কথার পুনরাবৃত্তিতে কখনও ক্লান্ত হননি।

আমাদের দেশে বিবেকানন্দের যুগ শুরু হওয়ার আগে রাজা রামমোহন ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। রামমোহনের যুগ থেকে পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রকার আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বামী বিবেকানন্দের হৃদয় আলোড়নকারী বাণী—"স্বাধীনতা, স্বাধীনতাই আত্মার সঙ্গীত"—স্বদেশীর হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার বিদীর্ণ করে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে এগিয়ে এল এবং সমগ্র দেশ তা আঁকড়ে ধরে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠল।

স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে তাঁর স্বদেশবাসীকে সাহসের সঙ্গে আহ্বান করেছিলেন সর্বপ্রকার শৃঙ্খল ভেঙে প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে এবং অপর দিকে, তিনি সকল ধর্ম এবং সম্প্রদায়ের অপরিহার্য ঐক্যের বাণী প্রচার করে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে আমরা স্বাধীনতার যে পরিপূর্ণ এবং সার্বিক ভাবমূর্তি দেখতে পাই, তাঁর সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখনও তার প্রতিফলন হয়নি। এবং অরবিন্দ যখন তাঁর 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন—"আমরা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত পূর্ণ স্বরাজ চাই"—স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালি যুবকরা তখন অনুভব করলেন যে, অবশেষে তাঁরা তাঁদের মনের মতো লোকটিকে পেয়েছেন।

এইরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করে বাঙালিরা পথের সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে। এবং ১৯২১ সালে এসে আমরা মহাত্মাজির মুখ থেকে অসহযোগের বাণীর সঙ্গে আরও একটি জিনিস পেলাম : "জনগণ ব্যতীত এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার ক্ষুধা জাগরিত না করা পর্যন্ত স্বরাজ আসতে পারে না।" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনে এই ওজস্বিনী বাণী আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর লাহোর ভাষণে তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, যে-স্বরাজ তিনি চান তা মুষ্টিমেয় লোকের জন্য নয়, সকলের জন্য, জনগণের জন্য। সর্বভারতীয় শ্রমিক সম্মেলনে তিনি তাঁর দেশবাসীর সামনে "জনগণের জন্য স্বরাজ"-এর আদর্শ তুলে ধরেছিলেন।

দেশবন্ধুর জীবনে আমরা আরও একটি বাণীর উদাহরণ দেখতে পাই। সেই বাণী এই—মানুষের জীবন, জাতির এবং ব্যক্তিরও, এক অপরিবর্তনীয় সত্য। এই জীবনকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবন যখন চেতনায় জাগ্রত হয়, আমরা সকল দিক থেকে এই নব জাগরণের যথেষ্ট প্রমাণ পাই এবং নব জীবনের স্পন্দন চতুর্দিকে অনুভূত হয়। পৃথিবী—এবং সেই হেতু মানুষের

জীবন—বৈচিত্র্যে পূর্ণ। এই বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করলে জীবনে পরিপূর্ণতা আসে না ; এই কাজ করলে আমরা নিজেদের মৃত্যু অথবা ধ্বংসের কাছেই টেনে নিয়ে যাব। এই জন্যই ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই বিকাশ ঘটাতে হবে এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে, এই 'বহু'-র মাধ্যমে।

আধ্যাত্মিক জগতে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ "এক" এবং "বহু"-র মধ্যে যে-ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জাতির জীবনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবন্ধু তা-ই অর্জন করেছিলেন অথবা অন্তত, অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। এক কথায় "সাংস্কৃতিক মৈত্রী"-তে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি ভারতের জন্য কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্র বেশি পছন্দ করতেন।

যে-সার্বিক বিকাশ এবং আত্মসিদ্ধিতে তাঁর এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তা-ই বর্তমান কালের আদর্শ। আমরা যদি এই সাধনাকে ফলবতী করতে চাই, তা হলে প্রথমেই আমাদের মনে স্বাধীনতার এক অখণ্ড কল্পনাকে চাক্ষুষ করতে হবে। কোনও ব্যক্তি তাঁর আদর্শকে অখণ্ড এবং সার্বিকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে কখনও তিনি জীবনসংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার আশা করতে পারেন না। সেই কারণেই সমগ্র ভারতকে, বিশেষ করে দেশের যুবশক্তিকে, এ-কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, আমরা স্বাধীন ভারতের যে-স্বপ্ন দেখেছি সেখানে সবাই মুক্ত—সকল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত।

আজ আমি ছাত্রসমাজকে এই কথা বলতে এখানে এসেছি যে, আমরা যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছি তার ভাবাদর্শ হল পরিপূর্ণ এবং সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন। আমাদের দেশবাসী স্বাধীন দেশে এবং মুক্ত পরিবেশে বাঁচতে চায় এবং বেড়ে উঠতে চায়। স্বাধীনতার ভাবাদর্শে আমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। আমাদের স্বাধীনতার দাবি 'ভুল করবার অধিকার' ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের পরে অরাজকতা আসবে কি আসবে না সেই দুঃস্বপ্নের কল্পনা করে আমাদের মুষড়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। চলুন, নিজেদের উপর অবিচল আস্থা রেখে অনিচ্ছুক হাত থেকে আমাদের জন্মগত অধিকারকে ছিনিয়ে আনতে আমরা এগিয়ে যাই।

আমাদের দেশে তিনটি বৃহৎ সম্প্রদায় এখনও সুপ্ত—এরা হলেন নারী, তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায় এবং শ্রমিক সম্প্রদায়। চলুন, তাঁদের কাছে গিয়ে বলি : "আপনারাও মানুষ এবং মানুষের সম্পূর্ণ অধিকার আপনারা পাবেন। অতএব উঠে দাঁড়ান, জেগে উঠুন এবং জড়ের মনোভাব পরিত্যাগ করে আপনাদের বৈধ দাবি ছিনিয়ে নিন।"

বাংলার ছাত্র এবং যুবকবৃন্দ, আপনারা সবাই পূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক হোন। আপনারা ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী। সুতরাং সমগ্র জাতিকে পুনর্জাগরিত এবং উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা দলে দলে বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সকলকে সাম্য এবং স্বাধীনতার বাণী শোনান। স্বাধীনতার যে-চিত্রটি আমি এইমাত্র আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম, সেটি আপনারা সমগ্র দেশের সামনে তুলে ধরুন। যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যান, আপনাদের জয় সুনিশ্চিত। আপনাদের সাধনা সুফল প্রসব করুক—ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হোক—এবং আপনাদের জীবন গৌরব এবং খ্যাতিতে অভিষিক্ত হোক।

"বন্দেমাতরম"

'লিবার্টি'-র সম্পাদকের নিকট পত্র

২৩ জুলাই, ১৯২৯

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,
লিবার্টি
মহাশয়,

আজকের লিবার্টিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের (Bengal Legislative Council) সদস্যরূপে প্রেরিত আমার কিছু প্রশ্ন মুদ্রিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির একটি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য পৃথক জেল আমার কাম্য। কিন্তু আমার প্রশ্ন থেকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত। প্রশ্নটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল নিতান্তই সরকারের অভিপ্রায় সম্পর্কে সংবাদ জানতে চাওয়া।

ভবদীয়
সুভাষচন্দ্র বসু

কলকাতা
২৩.৭.২৯

কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মনোনয়ন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি, ২৩ জুলাই ১৯২৯

কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করা অথবা মনোনীত করতে অস্বীকার করা সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজের সমর্থনে আমি এখন পর্যন্ত কোনও বিবৃতি প্রচার করিনি। কিন্তু বীরভূম থেকে মিঃ জে. এল. ব্যানার্জিকে কংগ্রেসের মনোনয়ন না দেওয়া সম্পর্কে এত কিছু লেখা এবং বলা হয়েছে যে, এত দেরিতেও আমি এই প্রসঙ্গে বিবৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি।

মিঃ ব্যানার্জি চতুর রণকুশলীর মতো এমন ধারণার সৃষ্টি করে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করছেন যে, সেই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে (Bengal Legislative Council) বেঙ্গল টেনান্সি বিল যখন বিবেচিত হচ্ছিল, তখন সব সময় কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট দেননি বলে তিনি কংগ্রেসের সমর্থন হারিয়েছেন। কিন্তু এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই ক্ষেত্রে যে-সকল কারণে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি, বেঙ্গল টেনান্সি বিলের উপর তাঁর ভোট না দেওয়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রথমেই আমার বলা উচিত যে, মিঃ ব্যানার্জি ১৯২৬ সালে অতি কষ্টে মনোনয়ন পেয়েছিলেন, কারণ আমাদের দলের অনেক বিশিষ্ট সদস্য তাঁর মনোনয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। যাঁরা মিঃ ব্যানার্জির অতীত কার্যকলাপ বিস্মৃত হননি তাঁরা মিঃ ব্যানার্জি এ-বছর মনোনয়ন পাননি বলে অথবা ১৯২৬ সালে আমাদের দলের অনেক বিশিষ্ট সদস্য তাঁর মনোনয়নের বিরোধিতা করেছিলেন বলে বিস্মিত হবেন না। তাঁর অজস্র অসংগতি, বারংবার ডিগবাজি, পুনঃপুনঃ দেশবন্ধুর নীতি এবং কর্মসূচির বিরোধিতা এবং, সর্বোপরি, ১৯২৩ সালে কারাগার থেকে মুক্তির পরে তাঁর কার্যকলাপ মনে রাখলেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজের সমর্থন মিলবে। ১৯২৩ সালে দিল্লিতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে তাঁর দেশবন্ধুর পরিষদে প্রবেশের কর্মসূচির বিরোধিতা এবং করাচিতে স্বরাজ-সমর্থকদের নীতি এবং কর্মসূচির নিন্দায় তাঁর সোচ্চার বক্তব্য এখনও অনেকের মনে আছে। তাঁর অতীতের নিন্দনীয়

কার্যকলাপ সত্ত্বেও জনস্বার্থের অগ্রগতির জন্য বক্তা এবং তার্কিক হিসাবে তাঁর নৈপুণ্য কাজে লাগিয়ে নতুন অধ্যায় শুরু করবার শেষ সুযোগ ১৯২৬ সালে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সে-সুযোগ তিনি গ্রহণ করেননি। বাংলার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সদস্যরা জানেন তিনি কেমন কাজ করেছেন এবং কেমন ব্যবহার করেছেন। তাঁর বক্তৃতা কখনও-কখনও দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছে ; মন্ত্রী এবং এগজিকিউটিভ কাউন্সিলারদের সঙ্গে তাঁর ষড়যন্ত্র প্রায়ই তাঁদের বিপদগ্রস্ত করেছে। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের পরিদর্শনের সময় মাদ্রাজ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস দল যখন পরিষদ বর্জন করে, মিঃ ব্যানার্জি তখন আমাদের অনুনয় উপেক্ষা করে পরিষদে উপস্থিত থাকেন এবং কংগ্রেস দলের কাজকে ব্যঙ্গ করে পরিষদে একটি বক্তৃতা করেন। তিনি যখন দল থেকে বহিষ্কারের মুখে, তখন নিজের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে তিনি বহিষ্কার এড়িয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার পরেও মিঃ ব্যানার্জি নিজের আচরণ সংশোধন করেননি।

পরিষদের বাইরে মিঃ ব্যানার্জির ক্রিয়াকলাপ এমন হয়নি যা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পারে। যাঁরা মফস্বলে থাকেন তাঁরা এ-বিষয়ে মিঃ ব্যানার্জির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত না থাকতে পারেন ; কিন্তু বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমি বলতে পারি যে, একমাত্র জনস্বার্থ বিবেচনা করেই মিঃ ব্যানার্জির মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাঁর অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কোনও যুক্তিশীল ব্যক্তিই প্রার্থীপদে তাঁর মনোনয়ন সমর্থন করবেন না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মিঃ ব্যানার্জি যদি মন্ত্রী এবং সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে চান, তা হলে কংগ্রেসের ছাপের আশ্রয় না নিয়ে খোলাখুলিভাবে কাজটা করাই তাঁর পক্ষে অনেক ভাল হবে। সামগ্রিক নির্বাচনের পর থেকে মিঃ ব্যানার্জির ক্রিয়াকলাপ তাঁর অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং আমরা যে তাঁকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করেছি, এই কারণে তা অধিকতর সমর্থনযোগ্য। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, মিঃ ব্যানার্জির উপর যাঁদের আস্থা আছে এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মনোনয়ন না দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে, অচিরেই তাঁদের ভুল ভাঙবে।

জনগণ অবগত আছেন যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বীরভূমের কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে প্রথমে শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায়কে মনোনীত করে। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জি এবং তাঁর বন্ধুরা এই কথা ভেবে শ্রীযুক্ত রায়কে অবসর নিতে প্ররোচিত করেন যে, এর ফলে তাঁরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে মিঃ ব্যানার্জির মনোনয়নে প্রবৃত্ত করাতে পারবেন। কিন্তু প্রাগুক্ত কারণসমূহের জন্য প্রাদেশিক কমিটির মতে তাঁর মতো একজন ছদ্ম কংগ্রেস কর্মীকে মনোনয়ন দিলে জনস্বার্থের অধিকতর ক্ষতি হত। আমাদের কাছে খবর এসেছিল যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি মিঃ ব্যানার্জিকে মনোনয়ন দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বীরভূম জেলায় এই মর্মে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল যে, তিনিই কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। এই প্রচারকার্যে বাধা দিতে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রকৃত মনোভাব ব্যাখ্যা করতে কলকাতা থেকে বীরভূমে কর্মী পাঠানো হয়। অন্যত্র আরও জরুরি কাজ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে আমি নিজেই সেখানে যেতাম। আমি সেখানে অপর প্রার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে তিনি নতুনভাবে জীবন শুরু করে পুরোপুরি কংগ্রেসের কর্মী হবেন কিনা তা জানবার ক্ষমতাও তাঁদের দিয়েছিলাম। যেহেতু তা সম্ভব হয়নি, বীরভূমে জনসাধারণের কাছে মনোভাব ব্যাখ্যা করা ছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আর কোনও আগ্রহ ছিল না।

আমি যে-তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি তা থেকে বলতে পারি যে, কলকাতা থেকে যে-সব কর্মীকে পাঠানো হয়েছিল তাঁরা মিঃ ব্যানার্জি কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী নন এই কারণে তাঁকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকতে বীরভূমের কংগ্রেসকর্মী এবং জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। আমি যত দূর জানি, অপর প্রার্থীর অনুকূলে কোনও প্রচারকার্য করা হয়নি। মিঃ ব্যানার্জি এবং তাঁর বন্ধুরা উচ্চকণ্ঠে এই দাবি করে চলেছেন যে, জেলা কংগ্রেস কমিটির অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে দলীয় প্রার্থীরূপে গ্রহণ না করে প্রাদেশিক

কংগ্রেস কমিটি অন্যায় করেছে। বিশেষ করে মিঃ ব্যানার্জির মতো লোকের কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র এবং বিধির সঙ্গে যাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে, জানা আছে যে, প্রার্থী মনোনয়নের অধিকারী একমাত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। জেলা কংগ্রেস কমিটি কেবল সুপারিশ করতে পারে, তা গ্রহণ অথবা বর্জন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিবেচনা সাপেক্ষ। এই বিশেষ ক্ষেত্রে এটা যখন অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যথাযথ বিবেচনার পরেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মিঃ ব্যানার্জির প্রার্থীপদ বাতিল করেছিল, তখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অজ্ঞাতসারে মিঃ ব্যানার্জির সুবিধার্থে নাম প্রত্যাহার করতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র রায়ের উপর চাপ সৃষ্টির সব দোষ জেলা কংগ্রেস কমিটির। নিরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন না করে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে মিঃ ব্যানার্জির সমর্থনে এগিয়ে গিয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটি অন্যায় করেছে।

আমদানি করা টিন-প্লেটের উপর থেকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার

টিনপ্লেট কারখানায় ধর্মঘট সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি, ৩ আগস্ট ১৯২৯

জামশেদপুরের গোলমুরি টিনপ্লেট কোম্পানিতে ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণ দীর্ঘকাল অবহিত আছেন। এই কোম্পানির প্রকৃত মালিক বার্মা অয়েল কোম্পানি। বার্মা অয়েল কোম্পানি এই দেশের অন্যতম সর্বাপেক্ষা ধনী পুঁজিপতি সংস্থা হলেও টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের অবস্থা পার্শ্ববর্তী টাটাদের সংস্থা অপেক্ষা অনেক খারাপ। টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের দাবি নিতান্ত সামান্য। প্রকৃতপক্ষে টাটার শ্রমিকরা দীর্ঘকাল ধরে যা পাচ্ছেন, এঁরা পাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক কম। কিন্তু মনে হয় টিনপ্লেট কোম্পানি সম্পূর্ণ অবিচলিত এবং আপসের জন্য আলোচনার পথ উন্মুক্ত করতে তারা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করছে। প্রচণ্ড লোকসান হওয়া সত্ত্বেও যত দিন সম্ভব এই অবস্থা বহাল রেখে তারা ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করছে এবং আশা করছে বার্মা অয়েল কোম্পানির অপরিমিত বিত্তের জোরে তারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। কিন্তু বার্মা অয়েল কোম্পানি এই সত্য বিস্মৃত হয়েছে যে, তাদের যে-সংরক্ষণ অনুমোদন করা হয়েছে তার ফলেই তারা এ-দেশে ব্যবসা করতে পারছে। অতএব টিনপ্লেট কোম্পানি যদি তাদের এই বর্তমান একগুঁয়ে মনোভাব বজায় রাখে তবে বিধানসভায় (Assembly) ভারতীয় প্রতিনিধিদের আমদানি-করা টিনপ্লেটের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক তুলে দেওয়ার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণের সময় আসন্ন হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিহীন এবং উদাসীন এক বিদেশী কোম্পানিকে ভারতীয় জনসাধারণের ক্ষতি করে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়ার কোনও প্রকার যুক্তি নেই। অতএব বিধানসভার সদস্যদের কাছে আমার আবেদন—তাঁরা যেন বর্তমান অধিবেশনে প্রস্তাব পাস করান যাতে ভারত সরকার আমদানি-করা টিনপ্লেটের উপর থেকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য আশুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, আমি ইতিমধ্যেই কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পেয়েছি যে, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনে তাঁরা বিষয়টি উত্থাপন করবেন।

রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি, ৪ আগস্ট ১৯২৯

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু একটি দিনকে রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবসরূপে পালনের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করেছেন। তিনি সুপারিশ করেছেন যে, যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অনুসরণে ৪ আগস্ট রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবসরূপে পালিত হতে পারে। তিনি এ-কথাও বলেছেন যে, কোনও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে ৪ আগস্ট অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলে মনে হলে তারা পরবর্তী কোনও একটি দিন স্থির করতে পারে। আমার মতে পরবর্তী কোনও একটি দিন স্থির করলেই ভাল হবে, যাতে সব প্রদেশই দিনটি পালনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সময় পাবে। বাংলার পক্ষে ৪ আগস্ট রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস পালন করা অবশ্যই সম্ভব নয় এবং তাই আমরা বাংলার জন্য দিনটি স্থির করেছি ১১ আগস্ট, রবিবার।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

স্বাধীনতার যথার্থ রূপ

রাজসাহী জেলা ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৭ আগস্ট ১৯২৯

আপনাদের সম্বোধন করতে পেরে আমি প্রথমে এই কারণে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমি অনুভব করি একমাত্র আমাদের যুবকদের হাতেই আমাদের সমস্যাবলীর সমাধান নির্ভর করে এবং যুগসমস্যাবলী নির্ধারণ করা যুবকদের কর্তব্য এবং তার সমাধান খুঁজে বের করার শক্তিও যুবকদের সাধ্যায়ত্ত। আমার কাছে যৌবন এমন কিছু, যা আত্মার প্রচণ্ড সজীবতার দ্যোতক। দ্বিতীয়ত, যদিও আমার ছাত্রজীবন কয়েক বছর আগেই অতিক্রান্ত, বাঙালি ছাত্ররা যে-আশা এবং আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত এবং প্রায়ই তাঁদের যে-বিপদ এবং বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।

যেমন ব্যক্তির জীবনে, তেমনই জাতির জীবনেও "গতি এবং বিস্তার"-এর নিয়ম বর্তমান। যত দিন তার মধ্যে প্রাণ আছে, তত দিন তার উপর এই নিয়ম কাজ করে। যখন এই নিয়ম কাজ করে না তখন জাতি অথবা ব্যক্তি জড় অথবা মৃতপ্রায় হয়ে যায়। "গতি এবং বিস্তার" এই দুটি হল বায়ুমান যন্ত্র (barometer), যা এই জাতির বর্তমান অবস্থা নির্দেশ করবে।

আবার একটি জাতির বুদ্ধি এবং ক্ষয়ের পিছনে কাজ করে এক অদৃশ্য এবং রহস্যময় নীতি। কোনও কোনও জাতি পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে এবং কেবলমাত্র পর্বতশীর্ষে অথবা ইতিহাসের পাতায় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। এবং অন্য কিছু জাতি আছে যারা এখনও বর্তমান এবং তারা তাদের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দেয়। এর কারণ কী ? কেন এই বিভিন্নতা ? এক দিনে অথবা এক মাসে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তবু এর উত্তর খুঁজে পেতেই হবে। এই রহস্যের সমাধান করতে সফল না হলে আমরা নতুন জাতি সৃষ্টি করব কী করে ? পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন যে, যে-জাতি এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, শুধু সে-ই উত্থানের আশা করতে পারে—যতবারই তার পতন হোক ততবারই সে উঠে দাঁড়াতে পারে। ঘটনা এই যে, যখনই কোনও জাতির জীবনে অবক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয়, তখনই তার বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচণ্ড একটি বৈপ্লবিক অভিঘাতের প্রয়োজন হয়, যাতে সেই জাতি নতুনভাবে চিন্তা শুরু করতে পারে। চিন,

জাপান এবং ভারতবর্ষ যে সভ্যতার এই নিয়মের আক্রমণ সামলে উঠতে পেরেছে তার প্রকৃত কারণ হল অন্ধকার যুগের শেষে সেখানে চিন্তাবিপ্লব হয়েছিল। অপর দিকে বিদেশীদের সঙ্গে যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ হয়েছিল তাও তাদের উদ্বর্তনে প্রচুর সাহায্য করে থাকতে পারে।

এর মধ্যে কোনটি সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বা নির্ণয়ের ভার আপনাদের উপর। তবে প্রশ্নটি যতই জটিল হোক না কেন, জানার মতো মন থাকলে উত্তর সহজেই পাওয়া যাবে। আমাদের পক্ষে নতুন জাতি সৃষ্টি করা কীভাবে সম্ভব তা যদি আমরা জানি অথবা জানবার চেষ্টা করি কেবল তখনই জীবন ধারণযোগ্য হয়। ছাত্রসম্মেলনের সামনে এটাই প্রকৃত সমস্যা।

প্রশ্ন করা যেতে পারে মানুষের প্রকৃত আদর্শ এবং 'সাধনা' কী ? যে-ছাত্রজীবন এই আদর্শ অর্জনের পথ প্রদর্শন করতে পারে তার আচরণবিধি কী হবে ? এ ক্ষেত্রে নিৎস-এর অতিমানব তত্ত্বের—জার্মান জাতিকে মহান এবং আদর্শ করে তুলতে তিনি যার বিধান দিয়েছিলেন—ইঙ্গিত প্রাসঙ্গিক হতে পারে। একটি আচরণবিধি নির্দিষ্ট করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নিৎসে প্রচলিত চিন্তাধারার কিছু কিছু পরিবর্তনের নির্দেশও দিয়েছিলেন। নিৎসে বিশ্বাস করতেন যে, খ্রিস্টীয় নীতিজ্ঞান মানুষকে তার প্রকৃত আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করেছিল এবং নতুন এক শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করতে হলে খ্রিস্টীয় নীতিজ্ঞানকে ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করতে হবে। তাঁর তত্ত্ব আজও অভ্রান্ত। প্লেটো, সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, টমাস মুর এবং আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা এমন একটি পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন যার সাহায্যে মানুষকে মনুষ্যত্বের এমন এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায়, যা হবে সকলের আদর্শ।

এখন, আমাদের আদর্শ কী ? কোনও বিদেশী অথবা বাইরের লোক তা বলে দিতে পারে না। উত্তর অবশ্যই ভিতর থেকে এবং আমাদের নিজেদের লোকের কাছ থেকে আসবে। আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ না হলে আমরা সম্ভবত আদর্শ খুঁজে পাব না। আদর্শকে অবশ্যই প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং কেবল তখনই আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করতে পারব। মানুষ আদর্শের প্রতীক এবং যখন সে নিজের পরিপূর্ণতায় তাকে উপলব্ধি করতে পারে তখন সে শ্রদ্ধার যোগ্য। যুগ থেকে যুগে আদর্শের পরিবর্তন হয় এবং তা কারও কল্পনার প্রসারতা এবং অর্জিত জ্ঞানের সমানুপাতিক। বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে আমাদের আদর্শ অর্জনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর ধর্মীয় আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায়। কেশবচন্দ্র ভাবতেন যে, সমাজকে কুসংস্কারের অশুভ শক্তির কবল থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আদর্শ মানুষ অসম্ভব। আবার, আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা রাজনৈতিক শৃঙ্খলের বন্ধন এবং আনুষঙ্গিক উৎপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত না করা পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ গড়ে উঠতে পারে না ; এবং সেই কারণেই রাজনৈতিক আন্দোলন। এই সব আন্দোলনের মূলে আছে এক মহান সত্য, যা থেকে নিঃসন্দেহে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তির প্রতীক কী তাদের তা জানা নেই।

আমরা মুক্তি চাই, কারণ বন্ধন মৃত্যুর প্রতীক। অন্ধকারের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। আমাদের নারীদের দৃষ্টান্ত দেখুন। কখনও কখনও দেখা যায়, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের পরম শত্রু।

এত দিন আমরা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করছিলাম যে, কেবল ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক মুক্তিতেই আমাদের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবে। এটা আংশিক সত্য। কিন্তু আরও বড় সত্য এই যে, ব্যক্তির জীবনে এক পরম সত্য এবং জীবিত এক মানুষের জন্য সর্ববিষয়ে মুক্তি অর্জন করতে হবে। এই আদর্শ অতি উন্নত, লালন করা কঠিন, এবং অর্জন করা আরও কঠিন। এটি এমন আদর্শ যার সঙ্গে জড়িত আছে সকলের জন্য কোনওরূপ ভেদাভেদহীন সমান অধিকার। বাংলার ছাত্র এবং যুবকদের সেই আদর্শের অভিলাষী হতে হবে এবং তাই তাদের কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতের সব আশা এবং আকাঙ্ক্ষা।

একটি ছাত্রের পক্ষে এমন আদর্শ গ্রহণ করায় নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং বিপদের

ঝুঁকি আছে—সে স্কুল অথবা কলেজ থেকে কিন্তু বহিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু তথাপি এই আদর্শ তাঁর পৌরুষকে উন্নীত করে। আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আমাকে যখন কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, আমি নিজের ভিতরে এক প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করেছিলাম এবং সেই শক্তি এখনও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। কোনও ব্যক্তির জীবনে শুধুমাত্র একটি সুযোগই আসতে পারে, যা তার জীবনে সন্ধিক্ষণরূপে প্রমাণিত হয়ে জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত করতে পারে। কর্তব্য খড়্গ বাহাদুরকে এমন এক দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল যার ফল অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হতে পারে বলে তিনি জানতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু যে-পথ তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল তার এক দিকে ছিল মৃত্যু অপর দিকে পরিপূর্ণ পৌরুষ। এক সহস্র সম্মেলন অথবা এক শত সভা এমন পরিবর্তন, বিবেকের এমন মুক্তি এনে দিতে পারে না।

আমাদের নারীদের উপর প্রতিদিন যে বর্বর অত্যাচার চলছে তার কথা ভাবুন। এর কি কোনও প্রতিকার নেই ? মুষ্টিমেয় কিছু ইংরেজ এ-দেশে থাকে কিন্তু "তাদের" মেয়েদের উপর কিন্তু কোনও অত্যাচার হয় না। কয়েক বছর আগে সীমান্ত অঞ্চলের সেই ঘটনার কথা আপনাদের মনে আছে, যখন কয়েকজন উপজাতীয় লোক এক ইংরেজ মহিলাকে অপহরণ করেছিল। সেই মহিলাকে উদ্ধার করতে পৃথিবীর সব জায়গার ইংরেজ এক হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আমাদের আদর্শকে অখণ্ডরূপে ভাবুন এবং নিজেদের জীবনে এই সার্বিক মুক্তির কল্পনাকে কার্যকর করতে চেষ্টা করুন। যাঁরা নিজের জীবনের পূর্ণ প্রকাশ খোঁজার চেষ্টা করবেন তাঁরা বাধার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু যা সত্য তার জয় হতেই হবে। আমার কাছে সত্য এবং স্বাধীনতা একই বস্তু। স্বাধীনতা জীবনের লক্ষণ এবং একে যদি আপনারা সত্য বলে জানেন, তবে একদিন তা অর্জিত হবেই।

আমাদের সংগ্রাম যে-পথে পরিচালিত হচ্ছে তাতে জাতিকে মুক্ত করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি ধরুন। আমরা তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দিই না, যেন ঈশ্বর কোনও একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, যা স্পষ্টতই উচ্চবর্ণ এবং সেই কারণে তাঁর সৃষ্ট এক শ্রেণীর জীবের স্পর্শে তাঁকে অপবিত্র হতে দেওয়া যায় না।

যখন কোনও জাতি অথবা ব্যক্তি জেগে ওঠে, সেই জাগরণ অবশ্যই হবে পরিপূর্ণ এবং সার্বিক। আমরা এমন একদল কর্মী চাই যাঁরা সব বাধা, তা যত ভয়ঙ্করই হোক, তুচ্ছ করে এই সর্বালিঙ্গনকারী আদর্শের উপাসক হয়ে উঠতে পারেন। "সাধনা"-র জন্য শক্তি এবং উদ্দীপনা রয়েছে, কিন্তু তা কাজে লাগানো হচ্ছে না। আমাদের জীবনীশক্তির যথেষ্ট "গতি এবং বিস্তার" নেই। আমাদের যুবকদের মধ্যে অভিযানের স্পৃহা, অজানার প্রলোভনে আগ্রহ—এই সমস্তর দুঃখজনক অভাব রয়েছে।

শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে

রাজসাহী ছাত্রসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২০ আগস্ট ১৯২৯

বাংলার ইতিহাসে এই স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন নতুন কিছু নয় এবং আমাদের নব জাতীয়তাবাদের জাগরণের সময় থেকেই এর কল্পনা যুবকদের মন পরিব্যাপ্ত করেছিল ; যদিও এক দিকে সরকারের নির্যাতন এবং অপর দিকে আমাদের নিজেদের জাতীয় কার্যাবলীর বিভিন্ন প্রণালীর জন্য এই কল্পনা কিছু দিন সুপ্ত ছিল। পুনঃসংগঠনের কল্পনা আবার সবার আগে এসে দাঁড়িয়েছে। শারীরিক ব্যায়াম এবং সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলা নিঃসন্দেহে

পিছিয়ে আছে, কিন্তু সরকার অবলম্বিত ক্রমবর্ধমান উৎপীড়ন ক্রমশ আমাদের এই প্রকার আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সমর্থ করে তুলেছে।

বলা হচ্ছে যে, অস্ত্রের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বলে এই আন্দোলন ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে যে-ব্যবস্থাটি উপেক্ষা করা হচ্ছে তা এই যে, সামরিক প্রশিক্ষণে ড্রিলের শিক্ষাক্রমের পরে আসে আগ্নেয়াস্ত্রের শিক্ষাক্রম। প্রথমে আমাদের হাঁটতে শিখতে হবে। হাঁটার সময় হাত এবং পায়ের সঠিক অবস্থা এখনও আমাদের শিখতে হবে। স্বাধীন দেশের মানুষদের দেখুন, দেখুন তাঁরা কীভাবে দাঁড়ায় অথবা হাঁটে। দেখুন মিছিলে অথবা থিয়েটারে, সিনেমায় কিংবা খেলার মাঠে টিকিটঘরের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁরা কেমন ব্যবহার করে। আমাদের মধ্যে এই সব গুণের অভাব। শৃঙ্খলা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণার সঞ্চার করতে হবে।

অন্যান্য দেশে সরকারই সামরিক শিক্ষার দায়িত্ব নেয়। কিন্তু এই ভারতবর্ষে কাজটি, স্পষ্টতই, আমাদের নিজেদেরই করতে হবে।

বিগত কলকাতা কংগ্রেসের সময় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সংগঠিত করে আমারা বিশ্বকে দেখাতে সমর্থ হয়েছিলাম যে, এই পরাধীন দেশেও এমন একটি কাজ করা যায়।

এই প্রকার প্রশিক্ষণের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এবং নীতি এই যে একদল ছেলে এবং মেয়ে নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে একসঙ্গে কুচকাওয়াজ করতে শিখলে তারা একসঙ্গে কাজ করতেও শিখবে এবং কাজও করতে পারবে। মনে করুন আজ যদি কুড়ি হাজার ছেলে একত্র হয়, তা হলে যথার্থই এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু সেই ছেলেরাই যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পায় এবং পুনরায় একত্র হয় তবে ওদের এক সুশৃঙ্খল বাহিনীর মতো দেখাবে।

বিগত কংগ্রেসের সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য বিরাট খরচের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু তখন এই তথ্যটি উপেক্ষিত হয়েছিল যে, উন্মাদনার মতন সৈনিকের উর্দিও জাতীয়তাবাদের প্রতীক। সামরিক নিয়মানুযায়ী কোনও অফিসারের তাঁর উচ্চতর অফিসারকে কুর্নিশ করা বাধ্যতামূলক। ব্যক্তিগত গুণের দিক থেকে দ্বিতীয়োক্ত অফিসার প্রথমোক্ত অফিসারের তুলনায় নিকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু "রাজকীয় উর্দিকে" অভিবাদন জানতেই হবে—প্রকৃতপক্ষে এই অভিবাদন ব্যক্তির প্রতি নয়, সে যে-উর্দি পরে আছে তার প্রতি। আমাদের ছেলেদেরও আমরা উর্দির প্রতি অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করা শেখাতে চাই। আমরা চাই নিজের দলের সম্মান সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্বদেশানুগত্য ("Esprit de corps")

আমরা যখন কোনও বাহিনীতে ভর্তি হই, নানা প্রকার ত্রুটি আরোপ করে একে অথবা ওকে মান্য করতে এবং কুর্নিশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, কুর্নিশ অথবা আনুগত্য তাঁর গায়ের উর্দির প্রতি।

কটিবস্ত্র এই আনুগত্য অথবা শৃঙ্খলা আনতে পারে না। এই কারণেই আমি জোর দিয়ে বলছি যে, গরুর গাড়ির যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব।

আধুনিকীকরণের পথে বাধা এসেছে। চিনকেও এই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সে যে-সম্পদ অর্জন করেছে, তা তার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মাধ্যমেই। ইতিহাসে এই প্রকার বলিষ্ঠ সংগঠনের দৃষ্টান্ত অজস্র। "আয়রন সাইড" ছিল ক্রমওয়েলের প্রধান অবলম্বন—লা ফায়েৎ-এর ছিল "ন্যাশনাল গার্ডস", নেপোলিয়নের "ইম্পিরিয়্যাল গার্ডস" এবং জার্মানির ফ্রেডারিকের ছিল "গ্যারিবল্ডির দশ সহস্র", মুসোলিনির "ব্ল্যাক শর্টস" এবং রাশিয়ার "রেড আর্মি"—এই সবই ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের গৌরবময় জয় এনে দিয়েছিল তার শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাবাহিনী। কামাল যাকে কুসংস্কারের বেড়ি বলে বিশ্বাস করতেন, তুরস্কে তিনি সেই বেড়ি ভেঙেছিলেন এবং তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অনুগত সেনাবাহিনীর সাহায্যে এক আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাদশা আমানুল্লার যদি অনুরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং অনুগত সেনাবাহিনী থাকত, আফগানাস্তিান তা হলে এক বিপ্লবের আলোড়নের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হত না। শৃঙ্খলাবদ্ধ একদল লোকের সাহায্য ছাড়া কোনও সংস্কার, তা যত সামান্যই হোক, কার্যকর করা যায় না। সংগঠিতভাবে কাজ করার দক্ষতা

অর্জন করতে পারলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হব।

ভয় পাওয়ার মতো কিছুই নেই। ভারতবর্ষ নিজেই এক বৃহত্তর কারাগার এবং বাইরে যাঁরা আছে, তাঁদের অবস্থা ভিতরে যাঁরা আছেন তাঁদের চেয়ে ভাল নয়। আসুন, আমরা নতুন কল্পনা এবং চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হই। আপনারা একবার এই নতুন কল্পনা এবং চিন্তাধারায় আবিষ্ট হলে পৃথিবীর কোনও শক্তিই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। এরা যতই বাধা পাবে ততই বৃদ্ধি পাবে, যেমন হয়েছিল সক্রেটিস এবং খ্রিস্টের ক্ষেত্রে।

আপসহীন মনোভাব এবং সংগ্রাম

জামশেদপুরের টিনপ্লেট কোম্পানির শ্রমিকদের সমর্থনে বিবৃতি, ২৮ আগস্ট ১৯২৯

টিনপ্লেট কোম্পানির পরিস্থিতি অচল অবস্থায় পৌঁছেছে। গত শুক্রবার থেকে সেখানে সাধারণ ধর্মঘট শুরু হয়েছে। নতুন এবং পুরনো উভয় প্রকার কর্মীরাই বাইরে। মুখ রক্ষার জন্য মেশিন চালু রাখা হচ্ছে, কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে না বললেই চলে। মনে হচ্ছে কর্তৃপক্ষ অনমনীয়। তবে তারা ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করলেও ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের তোষামোদ এবং প্রলুব্ধ করতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করছে। এমন কি জেনারেল ম্যানেজার সহ কোম্পানির বড় বড় অফিসাররা কর্মীদের তুষ্ট করতে তাঁদের ঘরে ঘরে যেতেও দ্বিধা করছেন না।

শ্রমিকদের দাবি এত সামান্য এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনোভাব এত অযৌক্তিক এবং আপসহীন যে, আমাদের, যাঁরা শ্রমিকদের দাবি সমর্থন করছি তাঁদের কাছে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এই জন্য আমাদের স্থানীয় বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং বিধানসভার (legislative Assembly) সমর্থন লাভের অভিপ্রায় আছে। টিনপ্লেট কোম্পানি এই ভয় দেখাচ্ছে যে, সংরক্ষণ বাতিল করলে তারা কারখানা একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রে বার্মা অয়েল কোম্পানি বিদেশ থেকে টিনপ্লেট আমদানি করবে। এই ভীতিপ্রদর্শন যদি কার্যকর করা হয়, তবে বর্তমান সংগ্রাম আমাদের এবং বার্মা অয়েল কোম্পানির মধ্যে সংগ্রামে পরিণত হবে। সেই সংগ্রামের অনুসরণে আমরা ভারতবর্ষে বার্মা অয়েল কোম্পানির মালিকানাধীন প্রতিটি কারখানায় গিয়ে বজবজে যেমন অবস্থার সৃষ্টি করেছি, তেমন অবস্থার সৃষ্টি করব। এ-বিষয়ে ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাব বিষয়টিকে এক সর্বভারতীয় প্রশ্নে পরিণত করেছে। আমরা, যাঁরা টিনপ্লেটের কর্মী নই কিন্তু তাঁদের সাহায্য করছি, কর্মীদের ডাকেই এই সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছি। এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার আগে আমরা কয়েকমাস অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম দরিদ্র কর্মীরা প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে রত এবং কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত একগুঁয়ে, তখন আমাদের হস্তক্ষেপ করতেই হল। আমরা একবার যখন হস্তক্ষেপ করেছি, তখন শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকারে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

রাজনৈতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যে আন্তরিক ঐক্য (Entente Cordial)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে "ফ্রি-প্রেস"-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিবৃতি, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

ভারতবর্ষ আজ এক নিপীড়নের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছে এবং আমাদের প্রদেশও তার বৈধ ভাগ পাচ্ছে। পরিষদের (Council) বিগত অধিবেশনে বাংলা সরকার ঘোষণা করেছিল যে, বছরের শেষ পর্যন্ত দমনমূলক নীতি অপরিবর্তিত থাকবে। সরকার সেই ঘোষণা অনুসারেই কাজ করে যাচ্ছে। এই নিপীড়নকে আমি সর্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করছি। এই নিপীড়ন শুধু আমদের দেশবাসীকে রাজনৈতিক জড়ত্ব থেকে জাগিয়ে তুলবে এবং এইভাবে দেশকে আগামী পয়লা জানুয়ারি নতুন এক অগ্রগতির জন্য প্রস্তুত করবে।

বাংলায় এবং অন্যত্র সরকারের বর্তমান নিপীড়নমূলক নীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, সরকার শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপ দমনের জন্যই নয়, শ্রমিকদের শিল্পসংক্রান্ত কার্যকলাপ দমনের জন্যও নিপীড়ন চালাচ্ছে, বিশেষ করে যে-সব ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্যকলাপের লক্ষ্য বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত করা।

মনে হয়, সরকার এবং বিদেশী পুঁজিপতিরা হাতে হাত মিলিয়ে তাদের সাধারণ লক্ষ্যের, অর্থাৎ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় প্রকার আন্দোলন দমনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই "আন্তরিক মৈত্রী"-র জবাবে আমাদেরও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আক্রমণাত্মক এবং আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী গড়ে তোলা উচিত। দেশ বিক্ষিপ্তভাবে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত এবং কার্যত, এই সব বিক্ষিপ্ত উদ্দীপককে প্রশ্রয় দেওয়ার অভ্যাস রপ্ত করেছে। ফলে নিপীড়নে আমাদের দুর্বল হওয়ার অথবা মনোবল হারাবার বিপদ নেই। সরকার যদি আশা করে যে, উৎপীড়ন এই দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনকে হত্যা অথবা রুদ্ধ করবে, তা হলে আমি স্পর্ধার সঙ্গে বলছি যে, আপনারা আপনাদের জঘন্যতম কার্যকলাপ চালিয়ে যান।

সরকারের বিশ্বাসভঙ্গ : বরিশালে রাজনৈতিক বন্দিদের অনশন-ধর্মঘটের কারণ প্রসঙ্গে

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯-এ দেওয়া বিবৃতি

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী কেন অনশন ধর্মঘট করছেন, আমাদের দেশের লোক সম্ভবত তা সঠিকভাবে জানেন না।

যে-সব অভিযোগের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করছেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যেতে পারে—

১) পটুয়াখালি বিবাদের মীমাংসার পরে ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর সঙ্গীদের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারায় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পরে পুনরায় সেই একই ধারায় অভিযুক্ত করা।

২) দুটি আঘাতের মামলা রুজু করা, একটি শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি তাঁদের কারও কারও বিরুদ্ধে।

৩) পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ছেদ টানার জন্য বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের

অনুরোধে সংশ্লিষ্ট সকল দলের মধ্যে ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে এক আপস হয়েছিল। এই আপসের অঙ্গ হিসাবে সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারার অন্তর্ভুক্ত অভিযোগসহ সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারা অনুসারে হঠাৎ গ্রেফতার করা হয়। শীঘ্রই দেখা গেল যে, এই মামলায় যে-সব সাক্ষ্য দেওয়া হবে, তার প্রায় সমস্তই পটুয়াখালি বিবাদ নিষ্পত্তির পূর্ববর্তী সময় সম্পর্কিত। সরকার বিশ্বাস ভঙ্গ করে এই মামলা আবার জিইয়ে তোলায় শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর সহকর্মীরা স্বাভাবিক কারণেই ক্রুদ্ধ হন।

আঘাতের মামলাটির সূত্রপাত এক দিকে পুলিশ এবং কারাগার-কর্তৃপক্ষ এবং অপর দিকে বন্দিদের মধ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করা নিয়ে বাদানুবাদ থেকে, যে-ব্যবস্থা তাঁদের জন্য করে দিতে হবে এবং না করলে তাঁদের আদৌ আদালতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। বন্দিদের অভিযোগ হল প্রয়োজনানুযায়ী যানবাহনের ব্যবস্থা না করা সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ করে অসন্তোষজনক অবস্থার মধ্যে তাঁদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়, এমন কি অসুস্থদেরও রেহাই দেওয়া হয় না। যেতে অস্বীকার করলে তাঁদের মারধর করা হয়। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারার মামলা টেকেনি বলে শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর সঙ্গীদের শাস্তি দেওয়ার জন্যই এই সব আঘাতের মামলা রুজু করা হয়েছে বলে বিশ্বাস।

কিন্তু সরকারের মনোভাবে ক্রুদ্ধ হলেও শ্রীযুক্ত সেন হঠকারিতার সঙ্গে কাজ করেননি। বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনও প্রতিকার করা হয় কিনা অথবা কারাগারের বাইরে তাঁর বন্ধুরা তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা তা দেখতে তিনি মে মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। যখন কোনও ফল হল না, তখনই তিনি নিজের উপর নির্ভর করলেন এবং অনশন-ধর্মঘট শুরু করলেন।

জেলা সম্মেলন উপলক্ষে গত মে মাসে আমি বরিশালে গিয়েছিলাম এবং সেই সময়ে আমি কারাগারে শ্রীযুক্ত সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি অতি কষ্টে শ্রীযুক্ত সেনকে অনশন-ধর্মঘট পরিত্যাগ করতে রাজি করাতে সফল হয়েছিলাম।

যে-সব অভিযোগ শ্রীযুক্ত সেনকে অনশন-ধর্মঘটে বাধ্য করেছিল, বরিশাল থেকে ফিরে সে-সম্পর্কে আমি সরকারকে চিঠি লিখেছিলাম এবং তার আশু প্রতিকার চেয়েছিলাম। উত্তরে সরকার জানিয়েছিলেন যে, বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও প্রতিকার হয়নি।

কিছু দিন অপেক্ষা করে এবং আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে দেখে শ্রীযুক্ত সেন এবং তাঁর কিছু সহকর্মী পুনরায় অনশন-ধর্মঘট শুরু করলেন। শ্রীযুক্ত সেনের অনশন-ধর্মঘট এখনও চলছে এবং বর্তমানে তিনি সামান্য একটু সোডাজল ছাড়া আর কিছু খাচ্ছেন না। অনশন-ধর্মঘট যদি আর কিছু দিন চলে, এটা সুনিশ্চিত যে তার একটাই পরিণতি, অর্থাৎ মৃত্যু। সরকারের হীন এবং প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তির এবং বিশেষ করে পটুয়াখালি বিবাদের আপসের পরে যে-অভিযোগ চিরতরে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, সেগুলি পুনরায় দায়ের করে বিশ্বাস ভঙ্গ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ শ্রীযুক্ত সেন তাঁর অনশন-ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে অটল। যদিও আমি শ্রীযুক্ত সেনের জীবন রক্ষার জন্য তাঁকে অনশন-ধর্মঘট প্রত্যাহারে রাজি করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি কবুল করছি আমি এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছি যে, শ্রীযুক্ত সেন যে-মনোভাব গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণ সম্মানজনক এবং সৎ এবং আমরা যে-পরামর্শ দিয়েছি তা শুধু সতর্কতামূলক। শ্রীযুক্ত সেন যখন নিজের জীবন বলি দিয়ে তাঁর সম্মান রক্ষা করছেন এবং রাজনৈতিক বন্দিদের শাস্তি দানের প্রয়োজনে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারার অপপ্রয়োগ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন, আমাদের তখন কেবলমাত্র একটিই কর্তব্য। সেই কর্তব্য হল দেশব্যাপী এমন এক উত্তাল এবং বিধ্বংসী আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যা শ্রীযুক্ত সেনকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য করবে। আমাদের মনোভাব এবং ব্যবহার দ্বারা সরকারকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিতে হবে যে, এখানে মানুষের জীবন অন্য

দেশের চেয়ে সস্তা নয় এবং বাংলার মানুষ বরিশালে লাহোরের শোকাবহ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে প্রস্তুত নয়।

গণসংগঠনের অপরিহার্যতা এবং সামাজিক বিপ্লব

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৯-এ হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ,

সত্যিই এক শুভ এবং অনুকূল সময়ে আপনারা হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন। দেশের সামনে প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা দেখা দিচ্ছে এবং দমনমূলক নীতির ফলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দিগন্ত কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়েছে। আসন্ন ঝড়ের এক ধরনের পূর্বাভাসরূপে মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়া বইছে এবং ঘনঘন আঁকাবাঁকা বিজলির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। এই রকম আবহাওয়ায় আমরা যাত্রীরা, দূরের লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে—এবং আশা এবং ভীতি নিয়ে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং আশঙ্কায় উদ্বেলিত বক্ষে স্বাধীনতার পথে হেঁটে চলেছি!

মাত্র কয়েক দিন আগে শৌর্য, বীর্য এবং মহত্তম আত্মোৎসর্গের মূর্ত প্রতীক মহান এক বাঙালি বীরের স্মৃতির প্রতি আপনাদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই ময়দানের কাছেই আপনারা এক বিরাট আয়োজন করেছিলেন এবং বয়স এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে হাজার হাজার নরনারী সারা রাত্রি ধরে এই বীরের প্রতি তাঁদের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। নাম এবং খ্যাতিহীন তরুণ কর্মী যতীন্দ্রনাথ অবিচল চিত্তে লৌহকঠিন সিদ্ধান্তে অটল থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। আজ আমি শুধু এই আশা নিয়ে ঐকান্তিক প্রার্থনা করতে পারি যে, যত দিন আমরা আমাদের সাধারণ লক্ষ্যে উপনীত হতে না পারি, তত দিন যেন তাঁর সাহস, আত্মোৎসর্গ, শৌর্য, দৃঢ় সঙ্কল্প, স্বদেশভক্তি এবং বিস্ময়কর সংগ্রামশক্তি আমাদের সকলকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করতে থাকে।

প্রতিকার কী?

আমাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, স্বাধীনতাহীনতা এবং সর্বপ্রকার সুযোগের অভাব সত্ত্বেও বিগত দেড়শো বছরে ভারতবর্ষ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক মহামানবের জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, এই জাতির মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যু তার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্ভাগ্য এই যে, এত মহামানবের জন্ম দিয়েছে যে-দেশ—সেই দেশের জনগণ এত অধঃপতিত, দুর্দশাগ্রস্ত এবং সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁদের নাগালের বাইরে। এই অবস্থার প্রতিকার করা যায় কীভাবে? তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্বকে আর আমাদের জাতীয় সাধনার ভিত্তি করা যাবে না : এক স্বাস্থ্যকর সমাজতন্ত্রবাদের ধাঁচে তাকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। তখন এবং কেবল তখনই আমরা ভারতের প্রতিটি গ্রামে এবং ঘরে মহান চেতনার উদ্ভব দেখতে পাব, যে-চেতনা ভারতবর্ষকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সম্পদ এবং গৌরবে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

আমি আগে যা বলেছি তার অর্থ এই যে, আমরা যদি আজ সমগ্র জাতির জীবনে সত্যিই এক নতুন জাগরণ, এক নতুন প্রাণের স্পন্দন দেখতে চাই, তা হলে এই মুহূর্তেই আমাদের সকল প্রকার কৃত্রিম সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং মানুষের পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে সকলকে সমান সুযোগ দিতে হবে। মানুষের তৈরি সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করতে হবে এবং নারীদের মুক্ত

করতে হবে পুরুষের দাসত্ব থেকে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কারণে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে, এক আমূল পরিবর্তন, এক সার্বিক বিপ্লব করতে না পারা পর্যন্ত আমরা কখনও আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ফিরে পাব না অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব না। যত দিন সমগ্র জাতি স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ হয়ে না ওঠে, তত দিন আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি এক অসার কল্পনা থেকে যাবে।

জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিস্তার এবং ক্রমপ্রসারী প্রভাবে স্বাধীনতার অর্থও প্রসারিত এবং বিবর্ধিত হয়েছে। একদিন আমাদের সকলের কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" (Colonial self government); কিন্তু এখন স্বাধীনতার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা।

আমাদের স্বাধীনতার পথ খুঁজে নেওয়ার অন্যতম নিশ্চিত উপায় ইতিহাসের দিকে তাকানো। বাংলা এবং ভারতের বিগত ত্রিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট যুগের দেখা পাই, যেমন—(১) স্বদেশী যুগ (২) সন্ত্রাসবাদ অথবা বিপ্লবের যুগ এবং (৩) অসহযোগের যুগ। প্রথম যুগে আমাদের প্রধান অস্ত্র ছিল ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, বিশেষ করে ব্রিটিশ বস্ত্র এবং ব্রিটিশ নুন বর্জন। স্বদেশী যুগে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলস্বরূপ বঙ্গভঙ্গ রহিত হয় এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তিত হয়। আমলাতন্ত্রের উঁচু মাথা নত হয় এবং তার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভেঙে পড়ে। বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় চলে ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত, এবং অনেক উজ্জ্বল তরুণ তাঁদের স্বদেশপ্রেমের মূল্য দিতে হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেন। কিন্তু এই সব মহানহৃদয় তরুণদের কার্যকলাপের ফলেই ব্রিটিশ সরকার ১৯১৯ সালের সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য হয়।

তৃতীয় যুগে অসহযোগের পর্বে মূল নীতি হল সম্ভবপর সকল উপায়ে আমলাতন্ত্রের সংক্রামক প্রভাব থেকে মুক্ত জনগণকে সংগঠিত করা এবং এই কাজের দ্বারা ব্রিটিশ সরকার যার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের সেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য এবং সহযোগিতার মূল ভিত্তি ধ্বংস করা।

আমার জানা নেই এখনও আমাদের দেশে এমন মানুষ আছেন কি না যাঁরা বিশ্বাস করেন কয়েকটি বোমা এবং পিস্তল আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের মুক্তি এমন সহজ ব্যাপার নয়। এখানে ওখানে কয়েকটি বোমা অথবা পিস্তল সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কখনও বিপ্লব আনতে পারে না। বিপ্লব সম্পূর্ণ এক অন্য জিনিস। সন্ত্রাসবাদ নিতান্তই এক বাহ্য লক্ষণ এবং মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারাও তা সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের জন্ম আমাদের ভাবনা এবং সাহিত্যের বৃহত্তর জগতে। ব্রিটিশরা এটা ভালভাবেই জানে। এই জন্যই আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উপর তীক্ষ্ণ এবং নির্মম নজর রাখা হয় এবং ভারতবর্ষে রাজদ্রোহের এই রকম চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়!

যাই হোক, আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, সন্ত্রাসবাদের যুগ চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের প্রধান অস্ত্র গণসংগঠন। আমাদের স্বার্থ নিরাপদ রেখে এবং দাবি প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীকে একত্র করতে হবে এবং নির্দিষ্ট দাবি এবং/অথবা বিশেষ অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই গণসংগঠনের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যেখানেই উৎপীড়নের চিহ্ন, কায়েমি স্বার্থের অত্যাচার ইত্যাদি চোখে পড়বে, সেখানেই আমাদের অবিরাম বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে হবে। এর ফলে হয়তো সমাজের উচ্চবর্ণের সঙ্গে অথবা কখনও কখনও বিত্তগর্বী পুঁজিপতি এবং অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের খোলাখুলি সংঘাত হবে; আবার হয়তো জোর করে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন করতে পারি এবং কর দেওয়া বন্ধ করতে পারি। এবং এইভাবেই আমাদের স্বদেশবাসী তাঁদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিতে শিখবে এবং জাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হবে।

অসহযোগের মূল কল্পনাকে সফল করে এক অহিংস গণসংগঠন গড়ে তোলার প্রথম এবং প্রথম উপায়, অবশ্যই, প্রচার এবং আরও প্রচার। ব্যাপক এবং অবিরাম প্রচারের দ্বারা আমাদের স্বদেশবাসীর মানসিক জগতে এক বিপ্লব আনতে হবে। এমন একটি সম্ভাব্য ঘটনার

কথা কল্পনা করে এমন কি চিন্তাশীল ইংরেজ লেখকরাও ঘোষণা করছেন যে, এই রকম প্রচারের ফলে আমরা যখন ঐক্যবদ্ধ হতে শিখব, সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে।

আমাদের প্রয়োজন একদল নিঃস্বার্থ কর্মী সৃষ্টি করা, যাঁরা পরিপূর্ণ এবং শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনতার স্বপ্নে সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে এবং গণ আন্দোলনে অংশ নিতে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করবেন। নির্ভীকহৃদয় কর্মীদের এই অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই যুব এবং ছাত্র আন্দোলন এত আবশ্যক। শৃঙ্খলা এমনই আর-একটি বস্তু—আমাদের মধ্যে দুঃখজনকভাবে যার অভাব রয়েছে। এবং শৃঙ্খলাপরায়ণতার এই চেতনা মনে সঞ্চারিত করার জন্য আমাদের এক শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের প্রয়োজন। আমরা জানি, বাংলায় যখন এই স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন সাফল্যের মুকুট পড়বে, সে-দিন বাঙালি চরিত্রের বৃহত্তম ত্রুটিগুলির মধ্যে একটি চিরতরে দূর হবে।

আজকাল আমাদের সামনে যে-বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে আমরা যদি তার সমাধানে আদৌ ব্যগ্র হই, তা হলে অবিলম্বে আমাদের দুটি জিনিসের উপর একাগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। প্রথমটি হল সামরিক ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সংগঠন এবং দ্বিতীয়টি আমাদের সকলের সর্বান্তঃকরণে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের নেতারা এই দুটি জাতীয় কার্যক্রমের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি।

আর মাত্র একটি কথা বললেই আমার বক্তব্য শেষ হবে। দেশের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার মনে হয় যে, আগামী বছরের মধ্যেই আমরা মাতৃভূমির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচণ্ড এক আন্দোলন সৃষ্টি করতে সমর্থ হব, এবং বর্তমানে সরকার যে-দমনমূলক নীতি অনুসরণ করছে, তা সেই আন্দোলনকে দমন করতে সমর্থ হবে না। তবে এই ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে সম্ভবত আমাদের সকলের প্রয়োজন হবে হাজার-হাজার নিষ্ঠাবান কর্মীর, এবং সেই প্রয়োজন দেখা দিলে বাংলার ছাত্রদের আরও একবার স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করা হবে। যদিও এবার এক বছরের জন্য, চিরকালের জন্য নয়। তাঁদের হাজারে-হাজারে এবং লাখে-লাখে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে হবে। অভিভাবকরা হয়তো আমার কথায় রাগ করবেন। কিন্তু আমার জবাব—"আপনারা যদি স্বাধীনতা চান, তা হলে অন্য কোনও পথ নেই।"

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আমি হয়তো নতুন কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু আমি যা বলেছি, তার সবটাই সঙ্গত কথা—আমার হৃদয়ের এবং অন্তরতম অভিজ্ঞতার কথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হবে। ভারতমাতার সন্তানরা আবার এই বিরাট বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে হাঁটবে এবং বিশ্বের দরবারে আবার তাঁদের শিল্প ও সাহিত্যের সমাদর হবে। সংগ্রাম চলছে। ভ্রাতা এবং ভগিনিগণ, আসুন এই শুভ মুহূর্তে আমাদের তুচ্ছ ব্যক্তিগত বিবাদ ভুলে সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি। বন্দেমাতরম!

বরিশালের সতীন সেনের অনশন-ধর্মঘট প্রসঙ্গে আরও কিছু

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি, ৪ অক্টোবর ১৯২৯

বাংলার সর্বশেষ সংবাদ বলছে বরিশাল জেলে অনশন-ধর্মঘটরত শ্রীযুক্ত সতীন সেনের অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। সরকার বলেছে তারা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করবে না। তারা শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে

যে-অভিযোগ পুনরায় এনেছে, তা হয় হাইকোর্টে বাতিল হয়েছিল, নয়তো পটুয়াখালি মীমাংসার সময় সরকার সেগুলি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এই সব মামলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল কারাগারে বন্দি করে রেখে তাঁদের জনস্বার্থমূলক কার্যকলাপ বন্ধ করা। এক দেশভক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি দণ্ডবিধির কুখ্যাত ১১০ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা অত্যন্ত জঘন্য কাজ এবং সরকারের প্রচেষ্টা সফল হলে সমগ্র দেশের পক্ষে এটা এক বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হবে। তাঁর দেশের লোক যখন তাঁকে মুক্ত করতে অক্ষম, তখন সম্মাননীয় ব্যক্তি হিসাবে শ্রীযুক্ত সতীন সেন যে-পথ অনুসরণ করছেন, তা ছাড়া তাঁর অন্য উপায় নেই। তিনি যখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, তখন আমাদের পক্ষে প্রয়োজন তাঁর মুক্তি কার্যকর করতে দেশব্যাপী এক উত্তাল এবং প্রচণ্ড আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যে বাংলার প্রতিটি জেলায় স্থায়ী "সতীন সেন মুক্তি কমিটি" চালু করা উচিত। এই কমিটিগুলি সতীন সেনের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালাবে এবং যেখানেই সম্ভব এবং প্রয়োজন সেখানে সত্যাগ্রহ শুরু করবে। একমাত্র তখনই আমরা সরকারকে বলতে পারব যে, বাংলার লোক বরিশালে লাহোরের বিয়োগান্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে না দিতে কৃতসঙ্কল্প এবং কেবলমাত্র তখনই আমরা তাদের অমানুষিক নীতির ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দিতে সমর্থ হব।

সারা বাংলা জুড়ে প্রচার-অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমি বাংলার সমস্ত কংগ্রেস কমিটিগুলিকে রবিবার, ৬ এপ্রিল, ১৯২৯ দিনটিকে 'নিখিল বঙ্গ সতীন সেন দিবস' রূপে পালন করতে অনুরোধ করছি। ওই দিন সতীন সেনের স্বাস্থ্য এবং মুক্তি কামনায় সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, গণপ্রার্থনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে।

বরিশালের সতীন সেনের আত্মাহুতি সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট আবেদন

৮ অক্টোবর, ১৯২৯

আমরা কত অসহায় এ-কথা যখন ভাবি তখন আমার বাক্‌স্ফূর্তি হয় না। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেশের স্বার্থে আন্তরিকতম এক কর্মী তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করছেন আর আমরা তাঁর জন্য কিছু করতে অক্ষম। যখন তাঁকে ১১০ ধারায় বন্দি করা হয় তখন তিনি ওই কথা ভেবে অনশন-সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেননি যে, তাঁর দেশবাসী সরকারের দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে। কিন্তু তাঁদের নির্বিকার দেখে তিনি নিজের হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন। সতীন সেনের মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তিকে এই ধারায় কারারুদ্ধ করতে সরকার যখন দ্বিধা করেনি, তখন যে-কোনও জাতীয় কর্মীকেই এইভাবে হয়রান করা হতে পারে। সুতরাং শুধু বাংলার পক্ষেই নয়, সমগ্র ভারতের পক্ষেই এটা ভীতিজনক।

যে-কোনও প্রকারে হোক সতীন সেনকে কারারুদ্ধ করে রাখাই সরকারের উদ্দেশ্য। আরও কয়েকটি অভিযোগ তারা ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রেখেছে ; ১১০ ধারার অভিযোগ ব্যর্থ হলে সেগুলি তারা কাজে লাগাতে পারে।

যতীন দাস এবং সতীন সেনের আত্মোৎসর্গের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রথমে বিদ্রোহের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা অনশন-ধর্মঘটের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পরে পরাধীনতার যন্ত্রণা তাঁদের হৃদয়ে এমন গভীরভাবে বেজে ওঠে যে, তাঁরা কৃতসঙ্কল্প হন এবং যে-কাজ তাঁরা আরম্ভ করেছিলেন তা পরিত্যাগের কোনও ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। যখন মিঃ সেনগুপ্ত এবং আমি নিজে শ্রীযুক্ত সেনকে অনশন-ধর্মঘট

ভাঙতে যুক্তিসহকারে বোঝাই, তখন তিনি এমন সব অকাট্য যুক্তি দিয়ে আমাদের যুক্তি খণ্ডন করেন যার থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি "সত্যকে" উপলব্ধি করেছেন, "সত্যকে" উদ্ঘাটন হতে দেখেছেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন, "আমি জীবনে কখনও কারও কাছে নতি স্বীকার করিনি এবং কখনও অপমানজনক কোনও মুচলেকা দিইনি। আজ যদি নিজেকে বাঁচাতে আমি এভাবে বাইরে যাই, আমি যত মানসিক শক্তি অর্জন করেছি তার সবটুকুই হারাব।" সত্যিই তিনি মনের দিক থেকে এত শক্তিশালী, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং আপসবিরোধী যে সরকারও তাঁকে ভয় করে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বলে আমি এই কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মত এই যে, অনশন-ধর্মঘট সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা এই কমিটির উচিত হয়নি। যতীন দাসের আত্মাহুতির পরে কেউ যদি একই উপায় অবলম্বন করেন, তা হলে অবশ্যই এ-কথা বুঝতে হবে যে, যথোচিত চিন্তা করেই তিনি এ-কাজ করেছেন এবং সেই কারণেই এই কাজ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করা উচিত হবে না।

মানুষের মঙ্গলের জন্য যতীন দাস এবং সতীন সেনের মতো এমন আত্মাহুতি কখনও বৃথা যায় না এবং এমন কি খ্রিস্টানরাও এ-কথা স্বীকার করবেন। পরাধীনতার যে-যন্ত্রণা যতীন দাস এবং সতীন সেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই যন্ত্রণার সৃষ্টি হোক।

শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তের নিকট আবেদন

১০ অক্টোবর, ১৯২৯

শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত গত কিছু দিন যাবত প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উভয়ভাবেই আমাকে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদকে আক্রমণ করে চলেছেন। এত দিন আমি ইচ্ছা করেই উত্তরে একটি কথাও বলিনি, কারণ, এই বিবাদ সংবাদপত্রে এবং জনসমক্ষে টেনে নিয়ে যাওয়া যে অশোভন তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ উক্তিগুলি পড়ে আমার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যখন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এবং তাঁর গোষ্ঠীর প্রচারধর্মী কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার অনেক কথাই বলার আছে, কিন্তু সে-সমস্ত আমি ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখছি। বর্তমানে যতীন্দ্রনাথ দাস স্মারক সমিতি এবং চট্টগ্রাম বিবাদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ করব। এই মহান শহিদের উপযুক্ত একটি স্মারক নির্মাণের উদ্দেশ্যে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি জারি করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের (Executive Council) একটি সভা আহ্বান করা হয়। এই পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এই সভায় যোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি, যদিও তাঁর দু'জন সহকারী যোগ দিয়েছিলেন। সেই সভায় আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, সমিতির গঠন সম্পর্কে সমস্ত প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ গ্রহণ করেছিল। সাধারণভাবে সভার এই মনোভাবও ছিল যে, পরবর্তীকালে অন্য কোনও নাম প্রস্তাবিত হলে তাও গৃহীত হবে।

সভা ভঙ্গ হলে এবং এমন কি আধ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হওয়ার আগেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সচিত শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর বাড়ি থেকে টেলিফোনে একটি বার্তা পান। এই বার্তায় বলা হয়েছিল যে, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত কমিটিতে থাকতে চান না এবং পরদিন সংবাদপত্রে তাঁর নাম প্রকাশিত হতে দেখতে চান না। একই সময়ে "ফ্রি

প্রেস"-এর সম্পাদকও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর বাড়ি থেকে টেলিফোনে অনুরূপ বার্তা পান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক টেলিফোনের জবাবে বলেন যে, কার্যনিবাহী পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কোনও সদস্যের নাম বর্জনের কোনও অধিকার তাঁর নেই। এই দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর সামনে ছিল কি না, অথবা স্মৃতিরক্ষা কমিটির বিবেচ্য বিষয়গুলি তিনি জানতেন কি না আমি তা জানি না। যাই হোক না কেন, তাঁর মতো পদমর্যাদার এক নেতাকে এই রকম কাজ করতে দেখে আমরা সবাই বিস্মিত।

স্পষ্টতই শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ কয়েক দিন পরেই লখনউ থেকে একটি তারে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, স্মৃতিরক্ষা কমিটিকে তিনি সাহায্য করবেন, কিন্তু কমিটির সদস্যরূপে কাজ করতে পারবেন না বলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সম্ভবত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এখন উপলব্ধি করেছেন যে, তাঁর অবস্থাটা স্ববিরোধী এবং কমিটির সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সমর্থনে তিনি এখন যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করছেন। এই মাসের ৮ তারিখের বসুমতীতে তিনি বলছেন— "কমিটির সদস্যপদ গ্রহণে আমার অনিচ্ছার অন্যান্য কারণের মধ্যে মুখ্য কারণ এই ছিল যে, সমিতি শুধু অর্থ সংগ্রহই করবে না, অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও কমিটির থাকবে।" আমি কি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে অবহিত করতে পারি যে, তিনি যে-কমিটির উল্লেখ করেছেন, সংগৃহীত অর্থ কীভাবে খরচ করা হবে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার তার নেই।

তাঁর মতো পদমর্যাদার নেতার পক্ষে যা সম্পূর্ণ অশোভন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইদানীং যা তাঁর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই রকম ভঙ্গিতে তিনি বলছেন, "বাংলায় আমার অতীত অভিজ্ঞতা এবং জনসাধারণের অর্থ খরচের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অক্ষমতার কথা মনে রেখে জনসাধারণের তরফ থেকে অর্থব্যয়ের দায়িত্ব যে-কমিটির আছে, সেই কমিটিতে না থাকাই আমি পছন্দ করি।" শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর যদি যথেষ্ট সাহস থাকে এবং তিনি যদি স্পষ্টভাষী হন, তা হলে আমি তাঁকে অনুরোধ করব তিনি যেন বক্রোক্তি না করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেন। এবং সত্যই যদি তিনি জনসাধারণের অর্থ খরচের দায়িত্ব কাঁধে নিতে নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে অসমর্থ মনে করেন, তা হলে যে-পুরসভা বছরে দু' কোটি টাকার উপরে খরচ করে, তিনি সেই পুরসভার প্রধান ছিলেন কী করে তা ভাবতে আমার অবাক লাগে।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত হঠাৎ শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ বসু সম্পর্কে প্রচণ্ড পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুরু করেছেন। তাঁরা স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য হ'ন সত্যিই তাঁর এই ইচ্ছা থাকলে কার্যনিবাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে তিনি তাঁদের নাম প্রস্তাব করেননি কেন ? তা ছাড়া হঠাৎ অভিমান করে কমিটি থেকে পদত্যাগের আগে তিনি কি আমাদের কাছ থেকে এ-কথা জানার চেষ্টা করেছিলেন যে, শ্রীযুক্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বসু অথবা অন্য কোনও অখ্যাত ব্যক্তিকে স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে আমাদের আপত্তি আছে কিনা ? প্রসঙ্গক্রমে আমি যোগ করতে চাই যে, পূর্ববর্ণিত ভদ্রলোকদের কেন নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল সে-বিষয়ে তিনি যে-সব যুক্তির (যেমন—স্মারক কমিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ তাঁদের হাতেই থাকা উচিত যাঁরা বাংলায় উপস্থিত আছেন) অবতারণা করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ যে-কমিটি নির্বাচিত হয়েছে তা নিতান্তই অর্থসংগ্রাহক কমিটি। তবু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, শ্রীযুক্ত দত্ত, শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত বসুর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে কখনও কোনও আপত্তি ছিল না অথবা আপত্তি হবেও না।

৮ তারিখের "বসুমতী"-তে উপসংহারে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত বলেছেন : "যাঁর চোখ আছে এমন কোনও নিরপেক্ষ কংগ্রেসকর্মী কি আছেন যিনি বাংলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ের উপদলীয় নীতি কার্যকর করার ফলে প্রায় সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির শোচনীয় ফল লক্ষ

করতে অসমর্থ হবেন ?"

এই মনোবৃত্তি অনুসরণ করেই গতকালের বসুমতী এবং অমৃতবাজার পত্রিকায় চট্টগ্রাম বিবাদ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত লিখেছেন :

"সমস্ত ঘটনা সতর্কভাবে বিবেচনা করে এবং পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি ঘোষণা করছি যে, এই অল্প কয়েকজন ব্যক্তির অযৌক্তিক মনোভাব বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনিবাহী পরিষদের উপদলীয় নীতির প্রত্যক্ষ ফল, যা বাংলার প্রায় সব জেলাতেই বিভাজন, বিবাদ এবং গোলমালের সৃষ্টি করেছে।"

আমি নীচে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনিবাহী পরিষদের সদস্যদের একটি তালিকা প্রকাশ করছি, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে এই সমিতি কতটা প্রতিনিধিত্বমূলক। এটা মনে রাখা উচিত যে, ১৯২৮ সালের নভেম্বরে যখন বর্তমান কার্যনিবাহী পরিষদ নির্বাচিত হয় তখন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। নির্বাচন তাঁর অনুমোদন লাভ করেছিল—যেমন লাভ করেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ অনুমোদন,—এবং নির্বাচনের শরিক হয়ে কার্যনিবাহী পরিষদের গঠন সম্পর্কে অভিযোগ তাঁর মুখে শোভা পায় না। আমি এত দূর যেতেও রাজি আছি যে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে কার্যনিবাহী পরিষদের জন্য সদস্যদের এমন একটি তালিকা প্রস্তুতের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যা অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে আমি সেই দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে-দিন তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে বলেছিলেন যে, তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকবে এমন ব্যক্তিদের কার্যনিবাহী পরিষদে মনোনীত করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হোক এবং সেই ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কার্যনিবাহী পরিষদ নির্বাচিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক পূর্ণাঙ্গ সভায়, যে-সভায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এবং তাঁর সব সহকারী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর লেখায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপদলীয় নীতির ফলে সৃষ্ট ভাগাভাগি, বিবাদ এবং গোলমালের উল্লেখ করেছেন। আমি কি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে প্রশ্ন করতে পারি যে, তিনি নেতৃপদে থাকা সত্ত্বেও যে-দিন সমগ্র বাংলাই দল এবং গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ভেঙে পড়েছিল এবং এই প্রদেশে দুটি কংগ্রেস কমিটির মতন দুঃখজনক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল, তিনি কি সেই দিনটির কথা ভুলে গিয়েছেন ? এই ঘটনা কি তখন ঘটেনি— যখন দেশবন্ধুর কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়েছিল এবং দেশবন্ধুর সমস্ত ক্ষমতা, প্রভাব এবং সম্মানে তাঁকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল ? ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর কাছ থেকে তিনি কী উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন এবং ১৯২৭ সালে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য তিনি কী রেখে গিয়েছেন, তাঁকে কি এই প্রশ্ন করতে পারি ? ১৯২৮ এবং ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজ কি ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাজের তুলনায় খারাপ—যদিও এই শেষের দুই বছরে নেতৃত্ব বিভক্ত হয়েছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অর্থভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এক পয়সাও দান করেননি !

আমরা যখন নিষ্ঠুর আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে রত, আমাদের প্রয়োজন সমস্ত শক্তিকে একই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ এবং সংহত করা। অতএব আমাদের একই মাতৃভূমির নামে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর কাছে আমিই এই আবেদন করব যে, তিনি যেন এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে প্রকাশ্যে আক্রমণের দ্বারা এই প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনকে হেয় করার চেষ্টা করে তিনি ঠিক করেছেন কি না। বাংলার কংগ্রেস অনেক ঝড় তুচ্ছ করেছে এবং ভিতরের এবং বাইরের অনেক আঘাত কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু যদি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তর উৎসাহ, প্রভাব এবং যোগ্যতা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর আক্রমণে ক্ষয় হয়, তবে তা আমাদের এবং সমগ্র প্রদেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক হবে। এর ফলে বিদেশী আমলাতন্ত্র ছাড়া আর কারও স্বার্থই সিদ্ধ হবে না।

সতীন সেনের অনশন-ধর্মঘট

সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের নিন্দা করে বিবৃতি, ১৫ অক্টোবর ১৯২৯

কলকাতায় আমি যখন এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পেলাম যে, বরিশাল জেলে শ্রীযুক্ত সতীন সেনের অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং যে-কোনও মুহূর্তে তাঁর মৃত্যু হতে পারে, তখন আমি তাঁর ভাই শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মারফত তাঁকে একটি সংবাদ পাঠাই। তাঁকে এই মিনতি জানাই যে, জেলের বাইরে তাঁর সকল শুভার্থী এবং সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের একটি শেষ সুযোগ না দিয়ে তিনি যেন মৃত্যুবরণের মতন চূড়ান্ত পদক্ষেপ না করেন। আমি তাঁকে এই অনুরোধ করি যে, আমরা বরিশালে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা না করা পর্যন্ত তিনি যেন অন্তত আরও কয়েকটি দিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন আমাদের সেখানে পৌঁছানো সাপেক্ষে তাঁকে কিছু খাওয়াতে রাজি করাতে সফল হন, যার ফলে আমি যখন বরিশাল জেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন আর তাঁর বিপদের আশঙ্কা ছিল বলে মনে হয়নি।

সতীন্দ্রনাথ সেনের প্রধান অভিযোগ, আমি যে-কথা একাধিকবার বলেছি, পটুয়াখালির মীমাংসার পর যে-অভিযোগ বাতিল করা হয়েছিল সেইগুলি পুনরায় দায়ের করা বিশ্বাসভঙ্গের কাজ এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজের কর্মীদের শাস্তি দিতে ফৌজদারি দণ্ডবিধির অন্য সব ধারা ব্যর্থ হলে কুখ্যাত ১১০ ধারার প্রয়োগ। আর একটি অভিযোগও কাছে—তাঁদের বিরুদ্ধে আঘাতের মামলা রুজু করা। যতীনবাবু এবং তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে কর্তাব্যক্তিরা যে-ব্যবহার করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় তারা কী রকম নীচ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাঁদের মনোভাব এবং ব্যবহার অত্যন্ত কঠোরভাষায় নিন্দনীয়।

তথাপি আমি প্রথম থেকেই সতীনবাবুকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, তাঁর অভিযোগ ন্যায্য এবং খাঁটি হলেও তাঁর অনশন-ধর্মঘটই এই অভিযোগ প্রতিকারের একমাত্র পথ বলে বলে আমার কখনও মনে হয়নি। এ-কথা সত্য যে, অনশন-ধর্মঘট শুরু করার আগে তিনি জনগণকে তাঁর হয়ে আন্দোলন করার যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু কয়েক মাস অপেক্ষা করে যখন তিনি দেখলেন যে, গণবিক্ষোভে বিশেষ কোনও ফল হল না, তখন তাঁর নিজের কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেওয়া সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু এখন যেহেতু সমগ্র প্রদেশ উত্তাল এবং জনগণের ক্রোধ এবং বিদ্বেষ তুঙ্গে, তাঁর উচিত ব্যাপারটা জেলের বাইরে জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দিয়ে অনশন-ধর্মঘট পরিত্যাগ করা। শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে যাঁরা জানতেন তাঁদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন দেখা দিলে হাসিমুখে মৃত্যুবরণের মতো যথেষ্ট সাহস এবং নির্ভীকতা তাঁর আছে। কিন্তু আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, সে-প্রয়োজন দেখা দেয়নি এবং এ-বিষয়ে তাঁকে নিঃসন্দেহ করতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা তাঁকে বলেছিলাম। প্রথমটি এই যে, তাঁর ক্ষেত্রে সরকারের বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনাই ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসের প্রথম দৃষ্টান্ত নয়। পক্ষান্তরে, ভারতীয়দের মতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাস। ফলত ১৯২৯ সালে সরকার কোনও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এই আশা করা, এক অর্থে, সরকারের এমন প্রশংসা করা— সরকার যার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ার্ধে হল—দেশের বর্তমান অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলে বিদেশী আমলাতন্ত্র ছাড়া আর কাউকে সাহায্য করবে না। শাসকরা সতীনবাবুকে তাদের পথের কাঁটা ভাবছিল বলে সেই কাঁটা সরে গেলে তারাই হয়তো আন্তরিকভাবে খুশি হবে।

তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার সময় এইগুলি এবং উত্থাপিত অন্যান্য যুক্তি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হল এবং অনেক কষ্টের পরে তিনি অনশন-ধর্মঘট পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে, গণআন্দোলন যত দিন চলবে, তত দিন তিনি শুধু এমন খাবার খাবেন, যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই কথা বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন

না, গণ আন্দোলন তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করতে ব্যর্থ হলে পুনরায় অনশন ধর্মঘট শুরু করার অধিকার তাঁর থেকে গেল। আমি তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়েছি যে, তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্ভাব্য সব কিছুই করা হবে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সতীন সেনকে অনশন ভঙ্গ করতে রাজি করানো হয়েছে। তাঁর জন্য যাঁরা উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা বোধ করেছেন এবং তাঁর জন্য যথাসাধ্য আন্দোলন করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রীযুক্ত সেনের কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে এই অনুরোধ করব যে, তাঁরা যেন মনে রাখেন যে শ্রীযুক্ত সেনের অভিযোগের প্রতিকার এখনও হয়নি। বিচারকারী ম্যাজিস্ট্রেটের রায় যা-ই হোক না কেন, সতীনবাবুর অভিযোগের প্রতিকার করতে হবে এবং তা কার্যকর করতে হলে সর্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। অতএব আসুন, আমরা সতীনবাবুর সম্মান রক্ষা করতে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১১০ ধারার অপপ্রয়োগ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে আমাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করব এই প্রতিজ্ঞা করি।

পাঞ্জাব এবং বাংলা : ছাত্র এবং রাজনীতি

পাঞ্জাবি ছাত্রসম্মেলনের লাহোর অধিবেশনে ভাষণ, ১৯ অক্টোবর ১৯২৯

পাঞ্জাবের ভগিনী এবং ভ্রাতাগণ,

পবিত্র 'পঞ্চনদের দেশ'-এ আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা আমাকে যে উষ্ণ এবং আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে সম্মান এবং অভ্যর্থনা জানিয়েছেন, জানি আমি তার যোগ্য নই এবং আজ আমার একমাত্র বাসনা এই যে, যে দয়া এবং আতিথেয়তার সঙ্গে আমাকে এখানে অভ্যর্থনা করা হয়েছে, আমি যেন তার আর-কিছুটা যোগ্য হতে পারি।

আপনাদের কাছে কিছু বলতে সুদূর কলকাতা থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের ডাকে সাড়া দিতে আজ আমি প্রস্তুত হয়ে এখানে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে কেন ডেকেছেন ? সে কি এই কারণে যে, নিজেদের সাধারণ সমস্যার সমাধান করতে পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকে মিলিত হতেই হবে ? সে কি এই কারণে যে, বাংলা, যে প্রথমে বিদেশীর পদানত হয়েছিল এবং পাঞ্জাব, যে সকলের শেষে পরাধীন হয়েছিল, পরস্পরের প্রয়োজন বোধ করছে ? অথবা কারণটা কি এমন কিছু, যা আমার এবং আপনাদের উভয়ের মধ্যেই আছে—আমরা একই চিন্তাধারা এবং আকাঙ্ক্ষার শরিক ?

এবং অদৃষ্টের কী পরিহাস যে, লাহোরে ছাত্রদের এই সমাবেশে আপনারা আমাকে ডেকেছেন—যাকে অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় একদিন বহিষ্কার করেছিল ? যদি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা অভিযোগ করেন যে, বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, কারণ অদ্ভুত সব ব্যক্তি এবং নতুন সব ধ্যান-ধারণা জগতে জনপ্রিয় হচ্ছে, তা হলে কি আপনারা আপত্তি করতে পারেন ? আমার অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জেনে যদি আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন, তা হলে আমি কী বলতে যাচ্ছি তা সত্যিই আপনাদের অনুমান করতে পারা উচিত।

বন্ধুগণ, বাংলার যতীন্দ্রনাথ দাস এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তাঁরা যখন পাঞ্জাবের কারাগারে ছিলেন তখন পাঞ্জাব এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবের যুবকরা তাঁদের জন্য যা করেছেন, তার জন্য আমি যদি প্রথমেই এই সুযোগে আমার হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞ অনুভূতির সঞ্চার হচ্ছে, জনসমক্ষে তা প্রকাশ করি—যত ক্ষীণ কণ্ঠেই হোক না কেন—তা হলে

আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা, যত দিন তাঁরা অনশন-ধর্মঘট করছিলেন, তত দিন তাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্ত উদ্বেগ এবং সহানুভূতি প্রদর্শন এবং যতীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে তাঁর উপর বর্ষিত ভালবাসা এবং সম্মান বাংলার হৃদয়কে গভীরভাবে মথিত করেছে।

লাহোরে তাঁরা যা করেছিলেন তাতেই সন্তুষ্ট না থেকে ডিফেন্স কমিটির সদস্যগণ এই মহান শহিদের মরদেহাবশেষ বহন করে আমাদের হাতে তুলে দিতে কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আমরা ভাবপ্রবণ লোক এবং আপনাদের হৃদয়ের বিশালতা আমাদের কাছে আপনাদের যেভাবে আদরণীয় করেছে তা বর্ণনাতীত। বাংলার অন্ধকারতম দিনগুলির একটিতে বাংলার জন্য পাঞ্জাব যা করেছে তার জন্য বাংলা চিরদিন পাঞ্জাবকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সেই মহান শহিদের উল্লেখ করতে গিয়ে আপনাদের এক বিশিষ্ট নেতা, ড. আলম, কলকাতায় আমাদের কাছে এক দিন বলছিলেন সূর্য কীভাবে পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত গিয়েছিল এবং সূর্যাস্তের পরে চন্দ্র কীভাবে পশ্চিমে উঠে পূর্বদিকে ফিরে এসেছিল। এইভাবেই যতীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন এবং এইভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। জীবিতাবস্থায় তিনি কলকাতা থেকে লাহোরে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নশ্বর দেহাবশেষ কলকাতায় ফিরে এসেছিল। তাঁর দেহাবশেষ নিষ্প্রাণ মৃত্তিকারূপে ফিরে এসেছিল, ফিরে এসেছিল পবিত্র, মহৎ এবং স্বর্গীয় কোনও বস্তুর প্রতীকরূপে। যতীন্দ্রনাথ আজ মৃত নন। তিনি পরম পবিত্র, প্রশান্ত এক বিকিরণকারী তারকারূপে স্বর্গে বিরাজিত, যার রশ্মি উত্তরপুরুষের ত্যাগে এবং তাঁর স্বর্গীয় কষ্টভোগে। তিনি বেঁচে আছেন এক স্বপ্ন হয়ে, আদর্শ হয়ে—মানুষের মধ্যে যা পবিত্রতম এবং মহত্তম তার প্রতীক হয়ে। এবং আমার বিশ্বাস এই যে, আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়ে তিনি কেবল ভারতের আত্মাকেই জাগ্রত করেননি, পরন্তু, তিনি যে-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যে-প্রদেশে দেহত্যাগ করেছিলেন সেই দুটি প্রদেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি রচনা করে গেছেন। তাই যে-নগর "তপস্যাক্ষেত্র" হয়েছে—এই আধুনিক "দধীচি"-র প্রায়শ্চিত্তের ক্ষেত্র হয়েছে, আপনাদের সেই মহান নগরকে আমি ঈর্ষা করি।

আমরা ক্রমশ স্বাধীনতার প্রভাতের দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছি, আমাদের কৃচ্ছ্রসাধনার এবং দুঃখের পাত্র তত পূর্ণ হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক যে ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে অন্যান্য স্থানের স্বৈরাচারীদের মতো আমাদের শাসকরাও নিষ্ঠুর থেকে নিষ্ঠুরতর হয়ে উঠবে। এবং তারা যদি ক্রমশ সভ্যতার সমস্ত ভান পরিত্যাগ করে বিনা বাধায় লৌহমুষ্ঠি ব্যবহার করতে শালীনতার মুখোশ খুলে ফেলে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। এই মুহূর্তে পাঞ্জাব এবং বাংলা সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় নির্যাতন ভোগ করছে। ব্যাপারটা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য, কারণ এর ফলে আমরা স্বরাজের জন্য কার্যকরভাবে যোগ্যতা অর্জন করছি। নির্যাতন দ্বারা ভগত সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তর মতো বীরদের আত্মাকে দমন করা যায় না। পক্ষান্তরে, এই ধরনের নির্যাতন, অপমান এবং দুঃখের ভিতর দিয়েই বীরের জন্ম হয়। অতএব আসুন, আমরা নির্যাতনকে সর্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা জানাই এবং নির্যাতন এলে আমরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। নিজেকে সমৃদ্ধ করতে এবং পাঠকদের নৈতিক উন্নতি সাধন করতে বাংলা সাহিত্য পাঞ্জাবের প্রাচীন ইতিহাস থেকে কতটা গ্রহণ করেছে আপনারা তা জানেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আমাদের মহান কবিরা আপনাদের বীরদের কাহিনী ভিত্তি করে কাব্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং এই সব কবিদের কেউ কেউ আজ প্রতিটি বাঙালির ঘরে অতি পরিচিত। সুচারু বাংলায়, অনূদিত আমাদের সন্তদের বাণী লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণা দেয়। কৃষ্টির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগের অনুরূপ অবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হয়েছে, এবং দেখতে পাচ্ছি আপনাদের রাজনৈতিক তীর্থযাত্রীরা আমাদের রাজনৈতিক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের কারাগারেই নয়, সদূর বর্মা এবং সমুদ্রের ওপারে সভ্যতাবর্জিত আন্দামানেও মিলিত হচ্ছেন।

বন্ধুগণ, আমি যদি এই আলোচনায় রাজনৈতিক প্রশ্নের উল্লেখ এবং তার জবাব দেবার

চেষ্টা করি, তা হলে আমি দুঃখ প্রকাশ করব না। আমি জানি এই দেশে এমন অনেক লোক আছেন—এমন কি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও—যাঁরা মনে করেন যে, "পরাধীন জাতির কোনও রাজনীতি নেই" এবং, বিশেষ করে, ছাত্রদের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার নিজের অভিমত এই যে, পরাধীন জাতির রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটি পরাধীন দেশে আপনি যে-সমস্যার কথাই ভাবুন, উপযুক্তরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সমস্যাটি মূলত রাজনৈতিক। পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাষায় জীবন এক পরিপূর্ণ সত্তা—এবং তাই অর্থনীতি অথবা শিক্ষা থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। মানুষের জীবনকে খন্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করা যায় না। জাতীয় জীবনের সকল দিক অথবা পর্যায় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সকল সম্পর্ক যেন একত্রগ্রথিত। ব্যাপারটা যখন এই, দেখা যাবে যে পরাধীন জাতির মধ্যে সকল অশুভ এবং সকল ত্রুটির মূলে আছে রাজনৈতিক কারণ—অর্থাৎ রাজনৈতিক দাসত্ব। ফলে আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি কী করে অর্জন করতে হবে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সম্পর্কে ছাত্ররা অন্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

সাধারণভাবে জাতীয় কাজকর্মের উপর যদি এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয়, তবে রাজনীতিতে যোগদানের উপর বিশেষ এক নিষেধাজ্ঞা কেন আরোপ করা হবে আমি তা বুঝতে পারি না। সর্বপ্রকার জাতীয় কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞার অর্থ বুঝতে পারি, কিন্তু কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাজকর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা অর্থহীন। এই পরাধীন দেশে সব সমস্যাই যদি মূলত রাজনৈতিক সমস্যা হয়, তবে সমস্ত জাতীয় কাজকর্মই চরিত্রের দিক থেকে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক। কোনও স্বাধীন দেশেই রাজনীতিতে যোগদানের উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই—পরন্তু, ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের উৎসাহ দেওয়া হয়। ভেবেচিন্তে এই উৎসাহ দেওয়া হয়, কারণ ছাত্রদের ভিতর থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিক। ভারতবর্ষে ছাত্ররা যদি রাজনীতিতে যোগ না দেয় তা হলে আমরা রাজনৈতিক কর্মী সংগ্রহ করব কোথা থেকে এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ দেব কোথায়? অধিকন্তু, এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, চরিত্র এবং পৌরুষের বিকাশের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কর্মহীন চিন্তা চরিত্রগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং এই কারণে চরিত্রের বিকাশের জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, শৈল্পিক ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর কর্মে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থকীট, সুবর্ণপদকধারী এবং অফিসের করণিক উৎপাদনের প্রচেষ্টা করা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচিত নয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা, যাঁরা তাঁদের জাতির জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অর্জন করে মহৎ হবেন।

ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রকৃত ছাত্র আন্দোলনের বৃদ্ধি বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণসমূহের অন্যতম। আমি এই আন্দোলনকে বৃহত্তর যুব আন্দোলনের একটি পর্যায় বলে মনে করি। আজকের ছাত্রসম্মেলন এবং অতীতের ছাত্র সম্মেলনগুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য। শেষোক্ত সম্মেলনগুলি সাধারণত অনুষ্ঠিত হত সরকারি উদ্যোগে এবং তার তোরণে দেখা যেত এই নীতিবাক্য—"তারা রাজনীতি সম্পর্কে কথা বলবে না"। এই সম্মেলনগুলি এক দিক থেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম দিকের অধিবেশনগুলির সঙ্গে তুলনীয়, যেখানে প্রথম প্রস্তাব পাস করা হত সম্রাটের প্রতি আমাদের আনুগত্য ঘোষণা করে। সৌভাগ্যক্রমে শুধু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষেত্রেই নয়, ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রেও আমরা সেই যুগ পেরিয়ে এসেছি। বর্তমান কালের ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অধিকতর স্বাধীন পরিবেশে এবং তাতে যাঁরা যোগ দেন— তাঁরা, ভারতীয় দণ্ডবিধির বাধানিষেধ সাপেক্ষে, ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা করতে এবং কথা বলতে পারেন।

এক অস্থিরতার অনুভূতি, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অধৈর্য, এক নতুন এবং উন্নততর শাসন প্রবর্তনের বাসনা—বর্তমান যুব আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। এক দায়িত্ববোধ এবং আত্মনির্ভরতার চেতনা এই আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। বর্তমান কালের যুবকরা আর বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করে সন্তুষ্ট বোধ করেন না। তাঁরা বরং অনুভব করেন যে,

দেশ এবং দেশের ভবিষ্যতের উপর পূর্ববর্তী প্রজন্ম অপেক্ষা তাঁদের অধিকারই বেশি এবং সেই কারণে দেশের ভবিষ্যতের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা তাঁদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। ছাত্র আন্দোলন বৃহত্তর যুব আন্দোলনের একটি পর্ব বলে এই আন্দোলন যুব আন্দোলনের মতো একই দৃষ্টিভঙ্গি, মনস্তত্ত্ব এবং উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত।

যাঁরা একটি আদর্শে অনুপ্রাণিত—অর্থাৎ চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের দ্বারা সর্বাপেক্ষা কার্যকর এবং প্রয়োজনীয়ভাবে নিজের দেশের সেবা করতে চান—সেই সব দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, পরিণতবুদ্ধি পুরুষ এবং নারীর আন্দোলন আর আজকের ছাত্র আন্দোলন এক নয়। এই আন্দোলনের কার্যকলাপের দুটি ধারা আছে, অথবা থাকা উচিত। প্রথমত, এর কাজ হবে যে-সকল সমস্যা কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে ছাত্রসমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি নিয়ে কাজ করা এবং ছাত্রদের শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং নৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রয়াস করা। দ্বিতীয়ত, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে বিবেচনা করে জীবনসংগ্রামের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করে তোলার প্রয়াস করা, এবং এই উদ্দেশ্যে জীবনের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে তাঁদের যে-সব সমস্যা এবং কার্যকলাপের সম্মুখীন হতে হবে তার পূর্বাস্বাদন করানো।

ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিকটি, আমি এইমাত্র যার উল্লেখ করলাম, সাধারণ অবস্থায় বর্তমান শাসকদের অসন্তোষের কারণ নাও হতে পারে। কিন্তু আন্দোলনের অপর দিকটি সম্ভবত নিরুৎসাহিত, নিন্দিত এমন কি কখনও কখনও বাধাপ্রাপ্ত হবে। প্রথম ধারায় আপনারা কোন কাজ হাতে নেবেন তার বিস্তৃত কর্মসূচি প্রদানের প্রচেষ্টা আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। এটা আংশিকভাবে আপনাদের বিশেষ প্রয়োজন এবং ত্রুটির উপর এবং অংশত ওই সব প্রয়োজন মেটাতে এবং ত্রুটি দূর করতে শিক্ষাবিষয়ক কর্তৃপক্ষ যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তার ওপর নির্ভর করে। প্রতিটি ছাত্রের প্রয়োজন এক সবল এবং সুস্থ শরীর, নির্দোষ চরিত্র এবং প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সুস্থ, প্রাণবন্ত কল্পনায় ভরা মস্তিষ্ক। কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থা যদি শরীর, চরিত্র এবং মেধার যথাযথ বৃদ্ধির সহায়ক না হয়, তা হলে সেই বৃদ্ধি যাতে নিশ্চিত হয় তার সুযোগ আপনাদের করে দিতে হবে। এবং কর্তৃপক্ষ যদি এই কাজে আপনাদের প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানান তা হলে আপনাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হয়—কিন্তু তাঁরা যদি তা না করেন, তবে তাঁদের বাদ দিয়ে আপনারা নিজের পথে এগিয়ে যান। আপনাদের জীবন আপনাদের নিজেদের এবং, শত হলেও, এর বিকাশের দায়িত্ব অন্যের চেয়ে আপনাদের বেশি।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি সুপারিশ সম্পর্কে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আমি চাই সম্পূর্ণরূপে ছাত্রসমাজের সুবিধার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলি নিজের নিজের এলাকায় সমবায় স্বদেশী ভাণ্ডার খুলুন। ছাত্ররা নিজেরা এই ভাণ্ডারগুলি দক্ষতার সঙ্গে চালাতে পারলে এর দ্বারা দ্বিবিধ কার্য সাধিত হবে। এক দিকে ছাত্রদের স্বদেশী দ্রব্য সস্তায় মিলবে এবং তার ফলে দেশীয় শিল্প প্রোৎসাহিত হবে। অপর দিকে, ছাত্ররা সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন এবং লাভের অর্থ ছাত্রসমাজের মঙ্গলের জন্য কাজে লাগাতে পারবেন। ছাত্রসমাজের মঙ্গলের কাজে অগ্রগতির জন্য আপনাদের কর্মসূচিতে অন্যান্য দফাগুলি হবে শরীর চর্চা সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্র, বিতর্কসমিতি, সাময়িক পত্রিকা, সঙ্গীত সংঘ, পাঠাগার এবং পাঠগৃহ, সমাজসেবা সমিতি ইত্যাদি।

অপরটি এবং সম্ভবত ছাত্র আন্দোলনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ হবে বৌদ্ধিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ। ছাত্রদের সামনে আমাদের আদর্শ সমাজের একটি স্বপ্ন তুলে ধরতে হবে, যে-স্বপ্নকে তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় সার্থক করে তুলবার চেষ্টা করবেন। একই সঙ্গে তাঁরা নিজেদের জন্য এমন এক কর্মসূচি স্থির করবেন, যা অনুসরণ করতে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন—যার ফলে ছাত্র হিসাবে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর জীবিকার জন্য তাঁরা নিজেকে প্রস্তুত করবেন। ক্রিয়াকলাপের এই ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতের সম্ভাবনা

আছে। কিন্তু সংঘাত সত্যিই ঘটবে কিনা তার অনেকটাই নির্ভর করবে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের মনোভাবের উপর। দুর্ভাগ্যক্রমে সংঘাত যদি আসে তবে তার প্রতিকার নেই এবং ছাত্রদের চিন্তা এবং কর্মের ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর জীবিকার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং আত্মনির্ভর হয়ে চিরতরে নিজেদের মনস্থির করতে হবে।

আমরা সকলে কী আদর্শ পোষণ করব, সে-বিষয়ে আপনাদের জানাবার আগে আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণ করব, যা আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এশিয়াকে ইউরোপীয়দের পদদলিত দেখে মনে বেদনা এবং অপমান সঞ্চারিত হয় না এমন কোনও এশিয়াবাসী আজ দুর্লভ। কিন্তু আমি চাই এশিয়া সর্বদাই এই অবস্থায় ছিল এমন ধারণা আপনারা চিরতরে মন থেকে মুছে ফেলুন। ইউরোপ আজ প্রভু হতে পারে, কিন্তু একদিন প্রভুত্ব ছিল এশিয়ার দখলে। ইতিহাস বলছে প্রাচীন কালে এশিয়া কীভাবে ইউরোপের এক বিরাট অংশ জয় করে তার অধিকারে রেখেছিল এবং তখন ইউরোপ এশিয়ার ভয়ে প্রচণ্ড ভীত ছিল। আজ চাকা ঘুরে গেছে কিন্তু ভাগ্যের চাকা এখনও ঘুরছে এবং হতাশার কোনও কারণ নেই। এশিয়া এই মুহূর্তে ক্রীতদাসত্বের জোয়াল ছুড়ে ফেলতে ব্যস্ত এবং সে দিন আর বেশি দূরে নেই যখন পুনর্যৌবনপ্রাপ্ত এশিয়া শক্তি এবং গৌরবে প্রদীপ্ত হয়ে অতীতের অন্ধকার থেকে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং স্বাধীন দেশের সভায় নিজের বৈধ স্থান অধিকার করবে। প্রতারক প্রতীচ্য কখনও কখনও অবিনশ্বর প্রাচ্যকে "স্থাণু" বলে দোষারোপ করে, যেমন তুরস্ককে এক সময় ইউরোপে "রুগ্‌ণ মানুষ" বলা হত। কিন্তু সাধারণভাবে এশিয়া এবং বিশেষ করে তুরস্ক সম্পর্কে এই দোষারোপ আর প্রযোজ্য নয়। জাপান থেকে তুরস্ক এবং সাইবেরিয়া থেকে সিংহল, সমগ্র প্রাচ্য আজ আন্দোলিত। সর্বত্রই পরিবর্তন হচ্ছে, অগ্রগতি হচ্ছে। কর্তৃত্ব, প্রথা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। নিজে যত দিন চায় প্রাচ্য তত দিন অপরিবর্তনশীল থাকবে, কিন্তু একবার এগিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করলে সে এমন কি পাশ্চাত্য দেশগুলির চেয়েও দ্রুত গতিতে উন্নতি করতে পারবে। বর্তমান সময়ে এশিয়ায় এটাই ঘটছে।

মাঝে-মাঝে আমাদের প্রশ্ন করা হয়, এশিয়ায় এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে যে-কর্মকাণ্ড এবং আন্দোলন দেখা যায়, তা কি প্রকৃত জীবনের লক্ষণ না নিতান্তই বাইরের কোনও উদ্দীপক বস্তুর প্রতিক্রিয়া এবং যে-আন্দোলন আমরা দেখি তা যে মৃত পেশির প্রতিবর্তী ক্রিয়া নয় সে-বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস এই যে, জীবনের প্রমাণ সৃজনশীল কর্মে এবং যখন আমরা দেখব বর্তমান আন্দোলন মৌলিকত্ব এবং সৃজনশীল প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন আমরা নিশ্চিত হব যে, জাতি হিসাবে আমরা সত্যই জীবিত। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে-নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করছি, তা খাঁটি অন্তরের জাগরণ।

বর্তমান ভারতে আমরা বিবিধ ভাবধারার আবর্তের মধ্যে রয়েছি। সকল দিক থেকে বিবিধ ভিন্নমুখী স্রোত বইছে। অদ্ভুত এক মিশ্রণ চলছে এবং বিবিধ প্রকার ভাবধারার এই বিভ্রান্তির মধ্যে ভাল এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায়ের পার্থক্য বোঝা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা যদি দেশকে পুনর্যৌবন দিয়ে তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে চাই, তা হলে লক্ষ্য সম্পর্কে এবং কোন পথে সেই লক্ষ্যে উপনীত হব সে সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

ভারতীয় সভ্যতা সবে অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন জীবন শুরু করছে। ফোনেশিয়া এবং ব্যাবিলনের সভ্যতার মতো এই সভ্যতার মৃত্যু হবে কি না এক সময় প্রকৃতই সেই বিপদ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এই সভ্যতা পুনরায় কালের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছে। যে পুনর্যৌবন দানের কাজ শুরু হয়েছে তাকে যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই, তবে চিন্তার জগতে আমাদের ভাবাদর্শে বিপ্লব আনতে হবে এবং জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘটাতে হবে রক্তের মিশ্রণ। আমরা যদি ইতিহাসের রায় এবং স্যার ফ্লিন্ডার্স পেট্রিকের মতো চিন্তাবিদদের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করতে অস্বীকার না করি, তা হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে,

কেবলমাত্র এই উপায়েই প্রাচীন এবং জীর্ণ সভ্যতাকে পুনর্যৌবন দেওয়া সম্ভব। আমার এই অভিমত আপনাদের নিকট গ্রাহ্য না হলে সভ্যতার উত্থান এবং পতনের পশ্চাতে যে-নিয়ম কাজ করছে নিজেরা অনুসন্ধান করে সেটি আপনাদের আবিষ্কার করতে হবে। একবার এই নিয়মটি আবিষ্কার করতে পারলে আমাদের এই প্রাচীন দেশে এক নতুন, স্বাস্থ্যকর এবং উন্নতিশীল জাতিগঠন করতে হলে আমাদের কী করা প্রয়োজন সে-সম্পর্কে আমাদের দেশবাসীকে পরামর্শ দিতে আমরা সক্ষম হব। ভাবনার রাজ্যে বিপ্লব আনতে হলে প্রথমে আমাদের সামনে এমন এক আদর্শ তুলে ধরতে হবে, যা আমাদের সমগ্র জীবন উদ্দীপ্ত করবে। সেই আদর্শ হল স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা এমন একটি শব্দ যা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত, এবং এমন কি আমাদের দেশেও স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা বিবর্তনের পথ পেরিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সার্বিক স্বাধীনতা—অর্থাৎ ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সমাজের স্বাধীনতা, পুরুষের এবং নারীর স্বাধীনতা, ধনীর স্বাধীনতা এবং দরিদ্রেরও স্বাধীনতা, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি নয়, সেই সঙ্গে সম্পদের সমবন্টন, জাতিভেদ এবং সামাজিক অবিচার দূরীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ধ্বংস করা। কঠোরহৃদয়, পুরুষ এবং নারীর কাছে এই আদর্শ অবাস্তব মনে হতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র এই আদর্শই আত্মার ক্ষুধা তৃপ্ত করতে পারে।

আমাদের জাতীয় জীবনের যতগুলি অবস্থা আছে স্বাধীনতারও আছে ততগুলি দিক। এমন সব ব্যক্তি আছেন যাঁরা স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে, শুধু স্বাধীনতার বিশেষ কয়েকটি দিকের কথা ভাবেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে এই সংকীর্ণ ধারণা অতিক্রম করে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ এবং সার্বিক রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের কয়েক দশক লেগেছে। আমরা যদি স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বাধীনতাকে ভাল না বেসে প্রকৃতই স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতাকে ভালবাসি, তা হলে এ-কথা অনুধাবনের সময় এসেছে যে, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং শুধু ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি নয়—সমগ্র সমাজের মুক্তি। আমার কাছে এটিই এই যুগের আদর্শ এবং যে-স্বপ্ন আমার আত্মাকে অধিকার করেছে, তা হল সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং বন্ধনমুক্ত ভারতবর্ষের স্বপ্ন।

আমাদের কাছে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় স্বাধীন মানুষ হিসাবে চিন্তা করা এবং অনুভব করা। আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণ বিপ্লব আসুক এবং আমরা স্বাধীনতার আসরে সম্পূর্ণরূপে মত্ত হয়ে উঠি। কেবলমাত্র স্বাধীনতায় উন্মত্ত নারী-পুরুষরাই মানবসমাজকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আমাদের ভিতরে 'স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা' যখন জাগ্রত হবে, তখন আমরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে যাব। সতর্কবাণী আর আমাদের বাধা দেবে না এবং সত্য ও গৌরবের হাতছানি আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

বন্ধুগণ, আমার ভাবনা, অনুভূতি, জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে স্বপ্ন এবং বর্তমানে আমার সমস্ত কর্মের পিছনে চালকশক্তি সম্পর্কে আপনাদের কিছু বলবার চেষ্টা করেছি। এর প্রতি আপনারা আকৃষ্ট হবেন কি না তা জানি না। কিন্তু আমার কাছে একটি জিনিস সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট—জীবনের শুধু একটিই উদ্দেশ্য, আর তা হল সকল প্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তি। স্বাধীনতার ক্ষুধা আত্মার সঙ্গীত—এবং নবজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দন সেই বন্ধনের বিরুদ্ধে, যে-বন্ধনে সে নিজেকে আবদ্ধ দেখতে পায়। আপনারা নিজেদের এবং দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতার এই তীব্র বাসনাকে জাগ্রত করুন এবং আমি নিশ্চিত যে অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। রাতের পরে যেমন দিন আসে, আমার কাছে এটা তেমনই নিশ্চিত। কিন্তু আসুন, আমরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখি—যার জন্য আমাদের যথাসর্বস্ব—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দান করা সার্থক হবে এবং যার জন্য আমরা আমাদের প্রিয়তম এবং নিকটতম জনকে উৎসর্গ করতে পারি। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার নিজের ধারণা আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি এবং যে-ভারতবর্ষকে আমি

চাই, তার চিত্র আপনাদের সামনে আঁকবার চেষ্টা করেছি ; সম্পূর্ণ স্বাধীন এক ভারতবর্ষ পৃথিবীতে তার নিজের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করুক। অন্ধ স্বদেশপ্রেমিক বলে আখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও আমার স্বদেশবাসীকে আমি বলব যে, 'সফল করে তুলতে হবে' এমন একটি ব্রত ভারতের আছে এবং এর জন্যই ভারত এখনও জীবিত আছে। এই 'ব্রত' শব্দটির সঙ্গে অতীন্দ্রিয়তার কোনও সম্পর্ক নেই। মানবজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথিবীর কৃষ্টি এবং সভ্যতায় ভারতের মৌলিক কিছু দেবার আছে। নিজের বর্তমান হীনাবস্থা এবং দাসত্বের মধ্যেও ভারতের অবদান তুচ্ছ নয়। একবার নিজের পথে এবং নিজের প্রয়োজনানুযায়ী বিকাশের স্বাধীনতা পেলে তার অবদান কত বিরাট হবে একবার কল্পনা করুন। এ-দেশে এমন ব্যক্তি আছেন, এবং যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধেয়—যাঁরা সার্বিকভাবে স্বাধীনতার নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে একমত হবেন না। তাঁদের খুশি করতে না পারলে আমরা দুঃখিত, কিন্তু যে-নীতি সত্য, ন্যায় এবং সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে আমরা কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ করতে পারি না। অন্যরা আমাদের সঙ্গে আসুন বা না আসুন, আমরা আমাদের নিজেদের পথেই চলব—তবে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমাদের পরিত্যাগ করলেও হাজার-হাজার, এমন কি লক্ষ-লক্ষ লোক শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতার সেনাদলে যোগ দেবেন। আমরা যেন দাসত্ব, অন্যায় এবং অসাম্যের সঙ্গে আপস না করি। বন্ধুগণ, সকল স্বাধীনতাপ্রেমীর নিজেদের একটি সুখী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এক স্বাধীনতার সেনাবাহিনী গড়ে তোলার সময় এসে গেছে।

এই সেনাবাহিনী শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যই সেনা পাঠাবে না, স্বাধীনতার নতুন ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্যও প্রচারকদের পাঠাবে। আপনাদের ভিতর থেকেই এই সব প্রচারক এবং সেনা সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের কর্মসূচিতে অবশ্যই এক দিকে থাকবে নিবিড় এবং ব্যাপক প্রচারকার্য এবং অপর দিকে থাকবে দেশব্যাপী এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। আমাদের প্রচারকদের কৃষক এবং কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে এই নতুন বাণী প্রচার করতে হবে। তাঁদের যুবকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং দেশের সর্বত্র যুবকসংঘ সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু সর্বশেষে বললেও গুরুত্বে যা কম নয়—তাঁদের দেশের সমগ্র নারীদের জাগরিত করতে হবে—কারণ পুরুষের সমান অংশীদার হিসাবে সমাজে এবং রাষ্ট্রে নিজের স্থান অধিকার করতে নারীদের এগিয়ে আসতেই হবে।

বন্ধুগণ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মিদলে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের অনেকে নিশ্চয় এখন নিজেদের প্রশিক্ষিত করছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নিঃসন্দেহে এই দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং একে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল আশা। কিন্তু তার শক্তি, প্রভাব এবং ক্ষমতা নির্ভর করে, অথবা করা উচিত, শ্রমিক আন্দোলন, যুব আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, নারী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি আন্দোলনের উপর। আমরা যদি আমাদের শ্রমিক, কৃষক, অনুন্নত সম্প্রদায়, যুবক, ছাত্র এবং নারীদের মুক্ত করতে সফল হই, তবে আমরা দেশে এমন এক শক্তি জাগ্রত করতে সক্ষম হব, যা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে এক শক্তিশালী অস্ত্র করে তুলবে। অতএব আপনারা যদি সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সেবা করতে চান, তা হলে একই সঙ্গে আমি যে-সব আন্দোলনের উল্লেখ করেছি, সেই সব সম্মিলিত আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

চিন আমাদের প্রতিবেশী—তাই চিনের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাক। দেখা যাক নিজেদের মাতৃভূমির জন্য চিনের ছাত্ররা কী করেছেন। ভারতে আমরা কি একই কাজ করতে পারি না ? আধুনিক চিনের নবজাগরণ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চিনের ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ের কার্যকলাপের জন্য। এক দিকে তাঁরা স্বাধীনতার নতুন বাণী প্রচার করতে গ্রামে, শহরে এবং কলকারখানায় গিয়েছেন এবং অপর দিকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র দেশকে তাঁরা সংগঠিত করেছেন। ভারতবর্ষেও আমাদের একই কাজ করতে হবে। স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। স্বাধীনতার পথ কন্টকাকীর্ণ তাতে সন্দেহ নেই, তবে এটি

এমন পথ যা গৌরব এবং অমরত্বের অঙ্গনে পৌঁছে দেয়। আসুন আমরা অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যুগ যুগ ধরে যে-শৃঙ্খলে আমরা আবদ্ধ, তা ভেঙে ফেলি এবং প্রকৃত তীর্থযাত্রীর মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার নির্ধারিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাই। স্বাধীনতার অর্থ জীবন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মৃত্যুর অর্থ সর্বোচ্চ অক্ষয় গৌরব। অতএব আসুন, আমরা স্বাধীন হওয়ার জন্য অথবা অন্ততপক্ষে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মৃত্যু বরণের সংকল্প গ্রহণ করি—এবং আমরা যে মহান যতীন্দ্রনাথ দাসের স্বদেশবাসী হওয়ার যোগ্য, আমাদের কর্ম এবং চরিত্রদ্বারা তা দেখিয়ে দিই। বন্দেমাতরম্!

পাঞ্জাবের যুবকদের নিকট আবেদন

লাহোর, ২৪ অক্টোবর ১৯২৯

লাহোরে অবস্থানকালে আমার পাঞ্জাবের যুবক বন্ধুদের কাছে একান্তভাবে এই আবেদন করব যে, যখন তাঁদের এত স্বদেশবাসী এবং দেশপ্রেমিক কারাগারে পচে মরছেন, তখন তাঁরা যেন নিজেদের কর্তব্যের কথা চিন্তা করেন। তাঁরা যদি যন্ত্রণা ভোগ করেন তবে তা করছেন যাতে আমরা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করি, তাঁরা যদি মৃত্যুবরণ করেন তবে তা করছেন যাতে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারি। অতএব তাঁদের আত্মত্যাগ এবং যন্ত্রণাভোগের জন্য আমরা যদি সত্যিই তাঁদের ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি, তবে দেশের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। সরকার তার দমনমূলক নীতি পুরোদমে চালু করেছে এবং পাঞ্জাবের যুবকরা যদি এই মুহূর্তে সময়ের ডাকে সাড়া না দেন, সরকার তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। এই দমনমূলক নীতির একমাত্র উপযুক্ত জবাব হবে যুবকদের এটা দেখিয়ে দেওয়া যে, একটি কর্মীকে কারাগারে পাঠালে হাজার-হাজার লোক এগিয়ে এসে তাঁর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এ-বিষয়ে ছাত্রদের বিরাট এক দায়িত্ব আছে, কারণ তাঁরাই যুবকদের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর অংশ।

কলেজ কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার স্বেচ্ছাসেবক হতে ছাত্রদের বাধা দিলে, আমার মতে, ছাত্রদের পবিত্র কর্তব্য হবে এই অবস্থা উপেক্ষা করে নির্ভীকভাবে তাঁদের কর্তব্য করা। অন্যান্য দেশের ছাত্রদের মতো ভারতবর্ষের ছাত্রদেরও দেশের সেবা করার এবং রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার অধিকার আছে। এটা তাঁদের জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকার থেকে কেউ তাঁদের বঞ্চিত করলে তাঁদের তা সহ্য করা উচিত হবে না। আমি যুবকদের, এবং বিশেষ করে ছাত্রদের কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন করছি, তাঁরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে নাম লেখান।

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের একটি সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম তাঁদের সমাপ্ত করতে হবে এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় এক দক্ষ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ দল হিসাবে সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেস অধিবেশনের সাফল্য বেশির ভাগ নির্ভর করে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দক্ষতা এবং শৃঙ্খলার উপর। যাঁদের পিছনে এমন গৌরবময় সামরিক ঐতিহ্য আছে, পাঞ্জাবের সেই যুবকদের পক্ষে কেবলমাত্র প্রচেষ্টা থাকলেই একটি দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করা আদৌ কষ্টকর হওয়া উচিত নয়। ডিসেম্বরের শেষ আসতে আর বেশি দেরি নেই। অতএব ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সেবার জন্য অবিলম্বে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যুবক এবং ছাত্ররা তাঁদের শৃঙ্খলিত বীর এবং অমর শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করুন।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

সেবাদলের সাহায্যের জন্য আবেদন

লাহোর, ২৪ অক্টোবর ১৯২৮

স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণের জন্য 'হিন্দুস্তানি সেবাদল' নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠন কয়েক বছর ধরে কাজ করছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অংশরূপে প্রতি বৎসর একটি সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই বৎসরও বাৎসরিক স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন লাহারে অনুষ্ঠিত হবে।

দেশে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ একটি স্থায়ী সংগঠনের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে কোনও ভারতীয়ই প্রশ্ন তুলবেন না। দেশের কয়েকটি অংশে হিন্দুস্তানি সেবাদল এ পর্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করেছে, কিন্তু আরও কর্মী এবং আরও অর্থ এনে দল অবশ্যই আরও কাজ করতে পারত। প্রশিক্ষণ শিবির এবং প্রশিক্ষণ ক্লাস খোলার যে-কাজ দল হাতে নিয়েছে, তাতে অর্থ এবং কর্মীর প্রয়োজন। অতএব এই মহৎ প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা জনসাধারণের কর্তব্য।

সেবাদলের সদর কার্যালয় বগলকোটে। এখানে স্বেচ্ছাসেবক এবং স্বেচ্ছাসেবক অফিসারদের প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এখন দলের প্রয়োজন আরব্ধ কাজ অধিকতর নৈপুণ্যের সঙ্গে করে যাওয়া এবং যেখানে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এখনও শুরু হয়নি, সেখানে সংগঠন আরম্ভ করা। অতএব আমি জনসাধারণের, বিশেষ করে যুবকদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন হিন্দুস্তানি সেবাদলের কাজে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন।

যতীন্দ্রনাথ দাসের উপযুক্ত একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য আবেদন

যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্মদিনের সভায় ভাষণ, ২৮ অক্টোবর ১৯২৯

যতীন্দ্রনাথ দাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার অনুভূতিকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব। তবু যেহেতু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত, কর্তব্য সম্পাদন করতে আমি বাধ্য। যতীন্দ্রনাথের আত্মোৎসর্গ পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিবেশে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। পাঞ্জাবের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কয়েক বছর আগের অবস্থার তুলনা করলে জনসাধারণের উপর এর প্রভাব সহজেই বোধগম্য হবে। সাম্প্রদায়িকতার উর্বর ভূমি এবং অতীতে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঝটিকাকেন্দ্র পাঞ্জাব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, মিলন এবং শান্তির ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। তাঁর ত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গ প্রদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেই নয়, সাধারণ লোকের উপরেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতার কথা বলতে আজ কারও স্পর্ধা হবে না। "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক" এবং "প্রিয় দাস দীর্ঘজীবী হোন" এই দুটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ধ্বনি আজ প্রদেশব্যাপী অনুরণিত। বাংলার লোক পাঞ্জাবের লোকের মতো এত বিচলিত হয়েছে কি না কখনও কখনও আমার নিজেকে এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়। যতীন দাস ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, যে-সময়ে আমরাও যোগ দিয়েছিলাম। আমার মনে আছে, ১৯২১ সালে পূজার ঠিক আগে আমরা যখন রসা রোডে কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করি, তখন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। অনেকের মতো তাঁকেও জেলে পাঠানো হয়, কিন্তু মুক্তিলাভের পরেও তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে দেশের কাজে নিয়োজিত রাখেন, অনেকেই যা করেননি,

কারণ দেশের প্রতি তাঁর জ্বলন্ত প্রেম নির্বাপিত হয়নি। ১৯২৫ সালের অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁকে আবার জেলে পাঠানো হয়। যখন বর্মায় ছিলাম, তখন এক উচ্চপদস্থ সি. আই. ডি অফিসারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস উক্তি করেন, যতীন্দ্রনাথের পরবর্তী কর্মজীবন সেই উক্তিকে যথেষ্টরূপে সমর্থন করে।

কিছু লোক আছেন যাঁরা বলেন রাজনৈতিক নির্যাতিতদের অবস্থার উন্নতির জন্য যতীন্দ্রনাথ আত্মবলি দিয়েছিলেন। এটা আংশিক সত্য হতে পারে, পূর্ণ সত্য নয়। এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যতীন্দ্রনাথ যখন অনশন-ধর্মঘট শুরু করেন, তখন রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি অধিকতর ভাল আচরণই ছিল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, এমন একটি সামান্য এবং সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে কেউ জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। যখন কেউ অনশন-ধর্মঘট করেন তখন যা ঘটে তা এই যে, কিছু কাল পরে, কোনও প্রতিকার না হলে, মনে এক আমূল পরিবর্তন আসে। বিচার্য বিষয় প্রসারিত হয় এবং এমন একটি পর্যায় আসে, যখন বন্ধন এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সমগ্র আত্মা বিদ্রোহ করে, যে-উৎপীড়নের অন্যতম দৃষ্টান্ত রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি অমানবিক আচরণ। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক শাসনের ফলে উদ্ভূত সমস্ত বন্ধন এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আত্মা যখন বিদ্রোহী হয়— মানুষ তখন বন্ধন, উৎপীড়ন এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ নিজের প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হয়। যতীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকে যখন এই পরিবর্তন আসে তখনই তিনি প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুবরণ করতে পেরেছিলেন। অন্য যাঁরা এই মানসিক পর্যায়ে পৌঁছতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছিলেন—তাঁরা চূড়ান্ত মূল্য দিতে পারেননি।

আপনাদের হয়তো জানা নেই যে, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রথমে অনশন-ধর্মঘট করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অনশন-ধর্মঘট আমার কাছে নিতান্ত অপরিচিত নয়। এর কোনও অভিজ্ঞতা আপনাদের নেই, আমি একবার এটা শুরু করলে আর কখনও তা পরিত্যাগ করব না।" আমরা জানি এবং বিশ্ব জানে তিনি কীভাবে তাঁর বক্তব্যে অবিচলিত ছিলেন।

এই অতিমানবিক শক্তি তিনি কী করে অর্জন করলেন, তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। বস্তুত কলকাতায় বিগত নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসে আমি বলেছিলাম যে, অরণ্যে কৃচ্ছ্রসাধন অথবা আশ্রমে ধ্যান করে আমরা শক্তি এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না, পারব সংঘর্ষ, কর্ম এবং সংগ্রামের মাধ্যমে। যতীন্দ্রনাথের জীবন থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা লাভ করি যে, এই যুগে আমাদের একমাত্র "সাধনা" তাঁর মতো কর্ম এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মৃত্যুকে জয় করা।

তাঁর আত্মোৎসর্গ যে-জাগরণ এনেছে, ভারতের সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতার সমবেত প্রচেষ্টাও তা আনতে পারে না। অগ্রগতির পথ থেকে সাম্প্রদায়িকতার যে-পাথর দেশের কোনও নেতা সরাতে পারেননি, এক যুবকের আত্মোৎসর্গে তা গলে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য আমরা যে-সামান্য প্রচেষ্টা করছি, তার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। এই কাজের জন্য লাখ দুই টাকার প্রয়োজন হবে। বাংলার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কেবলমাত্র দক্ষিণ কলকাতার লোকই এই অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং যেহেতু তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, আমি বলব প্রয়োজন হলে শুধু দক্ষিণ কলকাতারই এই অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। আমি চাই পাঞ্জাবে সংগৃহীত অর্থ যেন সেখানেই থাকতে পারে। তিনি ছিলেন এক যুবক, ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবক এবং স্মারক তহবিলে মুক্তহস্তে অর্থ দান করা যুবক, ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্ত কর্তব্য। পাঞ্জাবের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমি বিভিন্ন কলেজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে দেখেছি।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর"-এর সংগঠকদের অন্যতম। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল প্রথমে যেন এই বাহিনীকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা হয়। আমি আশা করি, এই আবেদন প্রতিটি হৃদয়ে সাড়া জাগাবে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যে-একটি

আকাঙ্ক্ষাকে তিনি লালন করতেন তা হল বাংলার নারীদের উন্নতি এবং মুক্তি। আমি আশা করি, আমরা সকলে তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছানুসারে কাজ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

ঔপনিবেশিকতার যথার্থ রূপ

হাউস অব লর্ড্স-এ বিতর্ক সম্পর্কে বিবৃতি, ৮ নভেম্বর ১৯২৯

প্রথম যখন ভাইসরয়ের ঘোষণা প্রচারিত হয়, উদারপন্থী এবং রক্ষণশীলরা ইংল্যান্ডে তাঁদের ক্রোধ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এর থেকে আমাদের কিছু স্বদেশবাসী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁদের উচিত সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে শ্রমিক দলের সরকারের হাত শক্ত করা। কিন্তু অসন্তোষের ঝড় এত তাড়াতাড়ি কেটে গেছে, সন্দেহ হয় সমস্ত ঘটনাটাই কৌশলে সাজানো। ভাইসরয়ের ঘোষণার যা প্রকৃত অর্থ, যাঁরা তার মধ্যে অতিরিক্ত কিছু অর্থ খুঁজতে চেয়েছিলেন, হাউস অব লর্ডস-এ লর্ড পারমুরের ভাষণ তাঁদের কাছে নিশ্চয় কঠিন আঘাত নিয়ে এসেছে।

যে অযৌক্তিক আশার পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল ভাষণটি তা পরিষ্কার করতে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। হিজ লর্ডশিপ নিশ্চিতরূপে বলেছেন যে, ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস কবে মঞ্জুর করা হবে তার নিশ্চয়তা নেই। অধিকন্তু, এটা প্রাঞ্জল করা হয়েছে যে, ১৯১৭ সালের ঘোষণা এবং গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯১৯-এর মুখবন্ধের অন্তর্গত শর্তাবলী পূর্ণ শক্তিতে বর্তমান থাকবে এবং এই শর্তগুলি বিনা ব্যতিক্রমে অপরিবর্তিত রাখতে হবে। এটাও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, লর্ড রিডিং যে-দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করেছেন, তার সঙ্গে শ্রমিক দলের সরকারের এবং রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী দলের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির আদৌ কোনও পার্থক্য নেই।

শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। প্রকারান্তরে স্বীকার করা হয়েছে যে, প্রস্তাবিত বৈঠক প্রকৃত গোল-টেবিল বৈঠক নয়। সাইমন কমিশনের কাজ সম্পর্কে নির্ধারিত এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের সময় অনুসৃত সমগ্র কর্মপদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকবে। এই কর্মপদ্ধতির পর পর দুটি পর্যায়ের মধ্যে গোঁজ হিসাবে এই বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষের কাছে বাধ্যতামূলক হবে না, কারণ বলা হয়েছে বৈঠক শেষ হলে বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টকে নিতে হবে।

আমাদের মধ্যে কিছু লোক গত কয়েক দিন ধরে অলীক আশার যে-জাল বুনছিলেন, আশা করি এই পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর বিবৃতি সেই সমস্ত জাল ছিন্ন করবে। আমি জানি না নেতারা লর্ড পারমুর-এর এই বক্তৃতা কীভাবে দেখবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে একে নেতাদের বিবৃতির জবাব হিসাবেই গ্রহণ করছি এবং সেই জন্য এই ব্যাখ্যার আলোকেই আমি আমার কর্তব্য স্থির করব।

লর্ড আরউইনের দেওয়া বিবৃতির মতো একটি বিবৃতির বাস্তব ফল হল কেবলমাত্র বলিষ্ঠ কোনও পদক্ষেপের জন্য দেশকে প্রস্তুত করার প্রচেষ্টাকে শিথিল করতে আমাদের প্ররোচিত করা। যেহেতু আমরা দুর্বল মানুষ, আমাদের আশা দেওয়া হয় এবং বিশ্বাস করানো হয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত পথ আছে, যে-পথে দীর্ঘ এবং তীব্র সংগ্রাম এবং দীর্ঘকালব্যাপী যন্ত্রণা এবং ত্যাগ নেই। কিন্তু আমাদের আর আশার স্বর্গে বাস করার প্রয়োজন নেই—লর্ড পারমুর আমাদের পরিস্থিতির কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

অতএব চলুন আমরা লাহোরে স্বাধীনতার পতাকা উচ্চে তুলে ধরতে প্রস্তুত হই এবং দ্বিগুণ

কর্মশক্তি নিয়ে আসন্ন সঙ্কটের জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তুলি।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ প্রত্যাহার

কারণ ব্যাখ্যা করে বিবৃতি, ২২ নভেম্বর ১৯২৯

এলাহাবাদ থেকে ফিরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, কলকাতার সংবাদপত্রে নেতৃসম্মেলন এবং ওয়ার্কিং কমিটির কার্যবিবরণী সম্পর্কে ভুল সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটা ঘটেছে তার কারণ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা যে-সম্মেলন এবং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন না তার রিপোর্ট দেবার চেষ্টা করেছেন। এটা স্পষ্ট যে, এই রিপোর্ট লিখবার সময় তাঁরা যথেচ্ছভাবে জনশ্রুতি এবং কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন।

এই মাসের ২০ তারিখের "স্টেট্‌সম্যান"-এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে, ১৮ তারিখের মধ্যরাত্রির পর অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দিল্লিতে কংগ্রেস নেতাদের কাজ সমর্থন করে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। যদিও ১৮ তারিখে মধ্যরাত্রির পরে ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি জানি না, অন্তত এমন কোনও সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না। ১৮ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির দুটি অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু ওই দুটি সভায় চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ওই দুটি সভায় যে-আলোচনা হয় আমি তাতে যোগ দিইনি, কারণ, আমি সেখানে যেমন ব্যাখ্যা করেছিলাম, ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমি আগেই পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছি। সংবাদপত্রের রিপোর্টে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আমার সমর্থন ছিল। এটা আমার কাছে দুঃখজনক। আমার মনোভাব দিল্লিতে যা ছিল এখনও ঠিক তা-ই।

আমি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ কেন প্রত্যাহার করলাম, কয়েকজন বন্ধু আমাকে এই প্রশ্ন করেছেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন সর্বশ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জওহরলাল নেহেরু, সমহামূর্তি এবং আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে নির্বাচিত হই, আমরা "স্বাধীনতাওয়ালা" নামে পরিচিত ছিলাম। এই হিসাবেই আমরা নির্বাচিত হই। কলকাতা প্রস্তাবও আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রচারের অধিকার দেয়। তথাপি দিল্লি সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী যখন বললেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি এক মন্ত্রিসভার মতো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সকল সদস্যের কাছেই অবশ্যগ্রাহ্য হওয়া উচিত, তাঁর যুক্তির জোর অনুভব করে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করাই আমি শ্রেয় মনে করলাম। এর ফলে ওয়ার্কিং কমিটির অপর সদস্যদের বিব্রত না করে স্বাধীনতার জন্য প্রচারকার্য করতে এবং ভাইসরয়ের ঘোষণা সম্পর্কে আমার মতামত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হব। যখন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং অন্যান্য নেতারা বললেন যে আমার পদত্যাগের প্রয়োজন নেই, কারণ ওয়ার্কিং কমিটিতে বিভিন্ন মতামতের স্থান আছে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং আমাকে পদত্যাগ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করা হল, তখন এই অনুরোধ মেনে নেওয়া আমার কাছে সর্বোত্তম পন্থা বলে বিবেচিত হয়। যত দিন ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে বাক্য এবং কর্মের স্বাধীনতা দেবে, তত দিন আমার এই কমিটির সদস্য না থাকার কোনও কারণ দেখতে পাই না।

আমাদের জাতীয় জীবনে যুবকের ভূমিকা

প্রথম মধ্যপ্রদেশ যুবসম্মেলনে সভাপতিরূপে ভাষণ, নাগপুর, ২৯ নভেম্বর ১৯২৯

সভাপতি মহাশয় এবং বন্ধুগণ,

মধ্যপ্রদেশ প্রাদেশিক যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার আহ্বান জানিয়ে আমাকে যে-সম্মান দেখিয়েছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আমরা এক সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করতে সকল যুবকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। মধ্যপ্রদেশের যুবকরা যে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের নেতৃত্ব অথবা নির্দেশের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেদের উদ্যমে আমাদের জাতীয় জীবনের মৌলিক সমস্যা সমাধান অথবা সমাধানের প্রচেষ্টা করতে সমবেত হয়েছেন, আমি এটা বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা আশাপ্রদ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি, আমি নিজেকে ভাগ্যবান এবং আমার প্রচেষ্টা পুরস্কৃত হয়েছে বলে মনে করব।

এই দেশে এমন লোক আছেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ জনজীবনে প্রখ্যাত, যাঁরা বর্তমান যুব আন্দোলনকে কিছুটা অপছন্দ করেন অথবা স্বীকার করেন যে, তাঁরা এই আন্দোলনের প্রয়োজন এবং তাৎপর্য অনুধাবনে অক্ষম। অন্য কিছু লোক আছেন যাঁরা যুব আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করলেও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন সম্ভবত এই কথা ভেবে যে, যে-আন্দোলনে তাঁদের কোনও ভূমিকা নেই, তেমন আন্দোলন বাড়তে দেওয়া উচিত নয়।

ভারতবর্ষে বর্তমান জাগরণের প্রভাত থেকে আজ পর্যন্ত পর পর কয়েকটি আন্দোলন এবং চিন্তাপ্রবাহ দেখা দিয়েছে। এই সব আন্দোলনের পরেও যুব আন্দোলনরূপে অতিরিক্ত একটি আন্দোলন যে জন্ম নিয়েছে এটাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, এমন একটি বাহ্য প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। অবশ্যই ব্যক্তি এবং জাতির হৃদয়ে এমন কিছু মৌলিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার আছে, যার জন্য যুব আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হয়েছে। সেই মৌলিক আকাঙ্ক্ষা কী ? তা হল স্বাধীনতা এবং আত্মসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা।

দেশে আজ এমন এক আন্দোলনের প্রয়োজন যা ব্যক্তি এবং জাতিকে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি এবং সেই সঙ্গে আত্মসিদ্ধি এবং আত্মপ্রকাশের চূড়ান্ত ক্ষমতা দেবে। এমন লোক আছেন যাঁরা আমাদের যুব সম্মেলনগুলিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লেজুর বানাতে চাইবেন, কিন্তু তাঁরা যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মূলত একটি রাজনৈতিক সংস্থা বলে, স্বভাবতই এর সুযোগ সীমাবদ্ধ। এমন কি রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারেও পূর্ণ স্বাধীনতা এর লক্ষ্য বলে এখন পর্যন্ত ঘোষিত হয়নি। অতএব তরুণ এবং তরুণীরা, যাঁরা জীবনকে অখণ্ডিতরূপে দেখেন এবং যাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা কামনা করেন, তাঁরা যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতো নিতান্তই এক রাজনৈতিক সংস্থা নিয়ে অসন্তুষ্ট বোধ করবেন এবং এমন এক আন্দোলনের বাসনা পোষণ করবেন যা মনুষ্য-হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবে এবং আমাদের জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মেটাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অতএব এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, যুব আন্দোলন যেমন নিতান্ত রাজনৈতিক নয়, তেমনই অরাজনৈতিকও নয়। নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে এটি জীবনের মতনই বিরাট। এবং যেহেতু সমগ্রের মধ্যে আছে তার সকল অংশ, এটা নিশ্চিত যে যুব আন্দোলনের বিকাশ আমাদের রাজনৈতিক অগ্রগতিকেও প্রোৎসাহিত করবে।

যুব আন্দোলন বর্তমান অবস্থার প্রতি আমাদের অসন্তোষের প্রতীক। যুব আন্দোলন মানে দীর্ঘকালের দাসত্ব, অত্যাচার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যুবকদের বিদ্রোহ। এই আন্দোলন সকল শৃঙ্খল অপসারিত করে এবং মানুষের সৃষ্টিমূলক কর্মকে সর্বাধিক সুযোগ দিয়ে আমাদের

নিজেদের এবং মনুষ্যসমাজের জন্য এক নতুন এবং সুন্দরতর পৃথিবী সৃষ্টি করতে চায়। অতএব যুব আন্দোলন আজকের আন্দোলনগুলির মাথায় উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অথবা বাইরে থেকে আমদানি করা কোনও বস্তু নয়। এটি এক নির্ভেজাল স্বাধীনতা আন্দোলন, যার মূল স্রোত মনুষ্যস্বভাবে গভীরভাবে নিহিত।

এই আন্দোলন জন্ম নিয়েছে এই কারণে যে, এটি বর্তমান সময়ের একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন এবং মানব-অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে অথবা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। কেউ যদি এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং প্রয়োজন উপলব্ধি করতে না পারেন, তবে কেবলমাত্র এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে অথবা যুব সংগঠনগুলি "দখল" করে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। আমার মতে যুবক এবং যুবতীদের যে-কোনও সংগঠনই 'যুবসংঘ' অভিধায় অভিহিত হতে পারে না, যদি তার মধ্যে যুবসংঘের সমস্ত বৈশিষ্ট্য না থাকে। আমি ইতিমধ্যেই যেমন ইঙ্গিত করেছি, সমস্ত যুব আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য হল এক অস্থিরতার অনুভূতি এবং বর্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইচ্ছা। যেখানে প্রথা এবং কর্তৃপক্ষ মানুষের বিবেকের বাণীর প্রতিকূলতা করে, সেখানে এই আন্দোলন দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং প্রথা আর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক। এই আন্দোলনের আদর্শ বয়োজ্যোষ্ঠদের প্রতি অন্ধ ভক্তি এবং প্রশ্নাতীত আনুগত্যের স্থলে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা। এই পরিস্থিতিতে আমাদের বয়োজ্যোষ্ঠদের কেউ কেউ যদি এই সব আন্দোলন পছন্দ না করেন, তবে বিস্ময়ের কিছু নেই।

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদের সমগ্র জীবনকে নতুন করে সৃষ্টি করা এবং জীবনে এক নতুন আদর্শের প্রেরণা সঞ্চারিত করা। এটা এই আদর্শ যা আমরা যে-জীবন সৃষ্টি করব তাতে এক নতুন অর্থ এবং তাৎপর্য এনে দেবে। এই আদর্শ হল পরিপূর্ণ সার্বিক স্বাধীনতা এবং সম্পূর্ণ আত্মসিদ্ধি। স্বাধীনতা এবং আত্মসিদ্ধির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং অবিচ্ছেদ্য। স্বাধীনতা ছাড়া আত্মসিদ্ধি সম্ভব নয় এবং স্বাধীনতা এই কারণে মূল্যবান যে তা আত্মসিদ্ধিতে পৌঁছে দেয়।

যুব আন্দোলন তার নিজের পরিধির মধ্যেই জীবনের সঙ্গে সহাবস্থান করছে। অতএব তদনুসারে আমাদের জীবনের যতগুলি দিক আছে, যুব আন্দোলনেরও ততগুলি বিভাগ থাকবে। আমরা যদি শরীরকে পূর্ণ যৌবন দিতে চাই, আমাদের খেলাধূলা এবং শরীরচর্চা করতে হবে। আমাদের মনকে বন্ধনমুক্ত এবং নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হবে এক নতুন সাহিত্য, উচ্চতর এবং উন্নত ধরনের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর নৈতিক ধারণা। সমাজকে পুনর্যৌবন দিতে হলে সঙ্কীর্ণ ধারণা এাং প্রথাকে কঠোর হস্তে নির্মূল করতে হবে এবং তার বদলে নতুন এবং স্বাস্থ্যকর ধারণা এবং প্রথার প্রবর্তন করতে হবে। অধিকন্তু, বর্তমান সময়ের আদর্শের আলোয় প্রচলিত সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে এবং সম্ভবত মূল্যের এক নতুন মানদণ্ড প্রবর্তন করতে হবে, যা ভবিষ্যতের সমাজকে শাসন করবে।

এটা স্বাভাবিক যে, নতুন এক চিন্তাধারা এবং কর্মের প্রবর্তন করতে হলে বর্তমান চিন্তাধারা, কায়েমি স্বার্থ এবং শাসকশক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তাতে আমাদের ভয় পেলে চলবে না। বিরোধিতা এবং অনেক রকম বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে যুব আন্দোলনের অগ্রগতিকে কার্যকর করতে হবে। এমন সব অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যখন আমরা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টিত এবং মনে হবে যেন অবশিষ্ট পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমরা নিজেদের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছি। এই রকম সঙ্কটের সময় আমাদের সেই আইরিশ দেশপ্রেমীর তাৎপর্যময় উক্তি স্মরণ রাখা উচিত, যিনি আশু বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে জয়ীর মতো সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন, "যেমন পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন একটি মানুষ, তেমনই আয়ার্ল্যান্ডকে বাঁচাতে পারেন একটি মানুষ।" যুব আন্দোলনের ব্যাখ্যাতারূপে আপনারা যখনই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নীতি প্রয়োগ করবেন, তখনই চতুর্দিকে শত্রু সৃষ্টি করবেন এবং আপনাদের প্রচারে যাদের ক্ষতি হবে সেইসব কায়েমি স্বার্থগুলি

আপনাদের পিষে মারতে জোটবদ্ধ হতে পারে। একটি রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গেও সংগ্রাম করা সহজ, কিন্তু একই সময়ে প্রতিটি রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা কঠিন। অতএব রাজনৈতিক কর্মীদের যে-সব শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হতে পারে, তার চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য যুব আন্দোলনের কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের, যাঁরা যুব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের, আরও একটি প্রতিবন্ধক সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং এটি সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কোনও রাজনৈতিক অথবা শ্রমিক আন্দোলনে আপনাদের বিরাট জনতাকে সামলাতে হবে এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে কখনও কখনও তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য অভিনয় করতে হবে। জনসাধারণের সঙ্গে আপনাদের সংযোগ অব্যাহত রাখার জন্য কখনও কখনও নিজেদের তাঁদের সমান স্তরে নামিয়ে আনতেও হতে পারে। অপর দিকে, আন্দোলনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তার প্রতি প্রীতি বিসর্জন দিতে হবে—যদি তেমন অনুভূতি আপনাদের থাকে। আপনাদের কখনও কখনও জনমত সৃষ্টির অথবা জনপ্রিয় অনুভূতির বন্যা রোধের দায়িত্ব নিতে হবে। আপনারা যদি জাতীয় জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধান করতে চান, আপনাদের দৃষ্টি সমসাময়িকদের ছাড়িয়ে অনেক দূরে প্রসারিত করতে হবে। জনগণের মন প্রায়ই বর্তমান সময়ের নোঙর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে অক্ষম। এটা অসম্ভব নয় যে, ভবিষ্যতের অশুভের কথা চিন্তা করে প্রতিবিধানের প্রস্তাব করলে জনগণের মন তা প্রত্যাখ্যান করবে। এই প্রকার পরিস্থিতিতে আপনাদের অবশ্যই হার না মেনে একা এবং নির্বান্ধব হওয়ার সাহস সঞ্চয় করে, যেন ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তেমন করে, অবশিষ্ট পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। যিনি সর্বদাই জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাতে চান তিনি সেই সময়ের নায়ক হতে পারেন—কিন্তু ইতিহাস তাঁকে মনে রাখবে না, তিনি ইতিহাসও সৃষ্টি করতে পারবেন না। আমাদের যদি ইতিহাস সৃষ্টির অভিলাষ থাকে, যে-কোনও মাত্রায় ভুল-বোঝাবুঝি এবং নিপীড়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বাপেক্ষা স্বার্থহীন কর্মের জন্য আমাদের নিন্দা এবং দুর্নামের জন্য প্রস্তুত থাকবে হবে ; ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের কাছ থেকে অনুচিত প্রতিকূলতার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

কিন্তু মানবচরিত্র মূলত স্বর্গীয়। তাই ভুল-বোঝাবুঝি, গালাগাল এবং নির্যাতনের দিন যত দীর্ঘই হোক, শেষ হবে। এমন কি আন্তরিকতম বিশ্বাসের জন্য আমাদের মৃত্যু হলেও মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরত্ব লাভ করব। অতএব আসুন, যে-কোনও জরুরি অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। কাঁটা আছে বলে গোলাপ তিনগুণ সুন্দর, মানুষের জীবনও তা-ই। ত্যাগ, যন্ত্রণা এবং নির্যাতন ছাড়া জীবন কি নীরস এবং বিস্বাদ হয়ে উঠত না ?

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যুব আন্দোলনের পাঁচটি দিক আছে—যেমন : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিবিধ—এই পাঁচ প্রকার দাসত্ববন্ধন ছিন্ন করা এবং এই মুক্তির ফলস্বরূপ আত্মসিদ্ধি এবং আত্মপ্রকাশকে প্রেরণা দেওয়া। অতএব চরিত্রের দিক থেকে এই আন্দোলন ধ্বংসকারী এবং সৃষ্টিশীল দুই-ই। ধ্বংস ছাড়া নতুন সৃষ্টি পেতে পারেন না। এই কারণেই প্রকৃতির সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই ধ্বংস এবং সৃষ্টি পাশাপাশি চলছে। যদি ভাবি যে, ধ্বংস খারাপ এবং সৃষ্টি ভাল এবং যদি বিশ্বাস করি যে, ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব তবে আমরা দুঃখজনক ভুল করব। আবার ধ্বংসকেই যদি পরিসমাপ্তি মনে করি তা হলেও আমরা ভুল করব। জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশ এবং বিস্তারের অর্থ ধ্বংস—এবং কখনও কখনও নির্মম ধ্বংস। অসত্য, কাপট্য, দাসত্ব এবং অসাম্যের সঙ্গে কোনও আপস হতে পারে না। এই শৃঙ্খল ভাঙতে হলে আমাদের আঘাত হানতে হবে জোরে। যখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য সামনে এগিয়ে যাওয়া, তখন আমাদের দ্বিধা করা অথবা পিছন ফিরে তাকানো উচিত নয়।

আমাদের ভেতরে যদি প্রাণশক্তি থাকে—আমরা যদি কেবলমাত্র "অগ্নিস্ফুলিঙ্গে অ-তরঙ্গিত কর্দমপিণ্ড" না হই, ধ্বংস অনিবার্যরূপে সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়ার সঙ্গী হবে।

আজ আমরা ভারতে এবং বিদেশে যে-সব আন্দোলন দেখতে পাই, তার অনেকগুলি

চরিত্রের দিক থেকে সংশোধনমূলক। এই সব আন্দোলন আমাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন না করে কেবল জীবনের প্রান্ত স্পর্শ করে যায়। কিন্তু আমরা সংশোধন চাই না—চাই আমূল পরিবর্তন। আমাদের সমগ্র জীবন—ব্যক্তিগত এবং যৌথ উভয়ই—নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। তাই পুনর্যৌবন দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করতে আমরা চাই স্বাধীনতার এক নতুন ধারণা। বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা বিভিন্ন অভিধা পেয়েছে। বস্তুত যেমন অন্যত্র তেমনই আমাদের দেশে স্বাধীনতার ধারণা বিবর্তন হয়েছে। অবশেষে স্বাধীনতার অর্থ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে সম্পূর্ণ এবং সার্বিক বন্ধনমুক্তি। অন্তত এই ব্যাখ্যাই যুবকদের মনে সাড়া জাগায়। আমরা আর অর্ধেক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা চাই এবং তা চাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আমরা যদি স্বাধীনতাকে ভালবাসি এবং স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতাকে ভালবাসি, তা হলে আমরা সম্ভবত কোনও প্রকার বন্ধন এবং অসাম্য সহ্য করতে পারি না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা সামাজিক যে-ক্ষেত্রেই হোক না কেন—স্বাধীনতার নীতিকে সামগ্রিকরূপে প্রয়োগের জন্য আমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। পুরুষ অথবা নারী প্রতিটি মানুষই জন্ম থেকেই সমান এবং তাঁরা সকলেই উন্নতির সমান সুযোগ পাবে—এটাই আমাদের নীতিবাক্য। এই নীতিকে কার্যকর করতে হলে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে এবং সেই জন্যই এটি এমন এক নীতি, যা বলা সহজ কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করা কঠিন।

বন্ধুগণ, যাঁরা যুব আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং বিস্তারে সাহায্যের অভিলাষী, তাঁরা কী বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করবেন তার উল্লেখ করে আমি অকারণে সময় নেব না। এই আন্দোলনের নীতি, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেই আমার দায়িত্ব শেষ। আমাদের আদর্শ অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সম্ভবত মানুষ যা কল্পনা করতে পারে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আমরা আমাদের এবং মানবসমাজের জন্য আমাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত করতে এবং এক নতুন ও শ্রেয়তর পৃথিবী সৃষ্টি করতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাকে জাগ্রত করতে হবে। কেবলমাত্র স্বাধীনতার জাদুস্পর্শই পারে আমাদের ভিতরের সুপ্ত কর্মশক্তিকে জাগ্রত করতে এবং আমাদের নিরন্তর কর্মে উদ্দীপিত করতে। প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে এবং অতঃপর আমাদের দেশবাসীর মধ্যে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কীভাবে জাগ্রত করা যায় সেটাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতার জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সোচ্চার দাবি জানাতে হলে আমাদের অবশ্যই দাসত্বের বন্ধন এবং পরাধীনতার যন্ত্রণা অনুভব করতে হবে। এই অনুভূতি তীব্র হলে আমরা উপলব্ধি করব যে, স্বাধীনতাহীন জীবন যাপনযোগ্য নয় এবং এই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেলে এমন এক সময় আসবে যখন আমাদের সমগ্র আত্মা মুক্তির কামনায় দগ্ধ হবে।

এই পর্যায়েই আমরা স্বাধীনতার বাণী প্রচারে ব্রতী হতে পারি। স্বাধীনতাপ্রমত্ত নরনারীরূপে স্বাধীনতার নতুন বিশ্বাস প্রচারের জন্য আমরা দুয়ার থেকে দুয়ারে, গ্রাম থেকে গ্রামে এবং শহর থেকে শহরে যাব। এই প্রচারের ফলে প্রত্যেকটি লোক প্রাণের স্পন্দন অনুভব করবে। শুরু হবে ধ্বংস এবং সৃষ্টি। রাজনৈতিক দল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থা এক নতুন স্পন্দন এবং নতুন আদর্শে আলোড়িত হবে—যার নাম স্বাধীনতা এবং সাম্যের আদর্শ। মেকি আদর্শ, রক্ষণশীল প্রথা এবং দীর্ঘকালের বাধানিষেধ ভেঙে ফেলা হবে এবং ক্রমশ জন্ম নেবে এক নতুন ব্যবস্থা। আমরা যদি স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই নতুন ব্যবস্থার জন্ম দিতে সফল হই, তা হলে আমরা কেবল একটি জাতীয় সমস্যারই সমাধান করব না, একটি বিশ্বসমস্যারও সমাধান করব।

ভারতবর্ষ বিশ্বের এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহ ক্ষুদ্রাকারে বিশ্বের সমস্যা। তাই ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান বিশ্বসমস্যারও সমাধান। অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং অসংখ্য বহিরাক্রমণ সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আজ বেঁচে আছে, তার কারণ তাকে এক ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে। ভারতবর্ষকে নিজেকে বাঁচাতে হবে, যেহেতু নিজেকে বাঁচিয়ে সে বিশ্বকে বাঁচাতে পারবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষ বিশ্বের

কৃষ্টি এবং সভ্যতায় উপযুক্ত স্থান নিতে সক্ষম হবে। ভারতবর্ষের উপহারের জন্য বিশ্ব সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। এটা ছাড়া পৃথিবী দরিদ্রতর হবে।

বন্ধুগণ, আমাদের দায়িত্ব বিরাট। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে যুবকরা স্বাধীনতার বর্তিকাবাহক হয়েছে। বহির্বিশ্বের যুবকরা যে-উদাহরণ স্থাপন করেছেন আমাদের তার যোগ্য হয়ে উঠতে হবে। আমরা যদি শুধু সময়োপযোগী কাজ করতে পারি, তা হলে অন্যত্র যা সাধিত হয়েছে এখানে ভারতবর্ষের যুবকরাও তা সাধন করতে পারেন। আমরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে বাস করছি এবং ভারতের ভাগ্য তার যুবকদের হাতে। আমার সন্দেহ নেই যে, যে-গুরু দায়িত্ব তাঁদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, তাঁরা তা উপলব্ধি করছেন। আমার সন্দেহ নেই যে, তাঁদের ত্যাগ, যন্ত্রণাভোগ এবং শ্রমের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ অনতিবিলম্বে এক স্বাধীন দেশ হবে—এমন এক দেশ যেখানে নরনারী জন্ম নেবে স্বাধীন হয়ে এবং শিক্ষা আর বিকাশের সমান সুযোগ পাবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একমাত্র প্রশ্ন হল—সে কখন স্বাধীন হবে। আমরা সবাই দাস হয়ে জন্মেছি, কিন্তু আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে মরব, আসুন আমরা এই সঙ্কল্প করি। কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে না পাই— তবে আসুন, অন্তত ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় আমরা মৃত্যু বরণ করি। স্বাধীনতার পথ কন্টকাকীর্ণ—কিন্তু এটা অমরত্বের পথ। আমার মধ্যপ্রদেশের ভ্রাতা এবং ভগিনিগণ, সেই মহান পথে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই। বন্দেমাতরম্!

দক্ষিণ, বাম এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দায়িত্ব

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বিবৃতি, ৬ ডিসেম্বর ১৯২৯

আমার কাছ থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অবস্থা সম্পর্কে একটি বিবৃতির সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি ইচ্ছাপূর্বক বিবৃতি প্রকাশে বিলম্ব করেছি, কারণ সমস্ত তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমি সময় চেয়েছিলাম। ১ ডিসেম্বর, যখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হয়, আমি নাগপুরে উপস্থিত ছিলাম না। প্রাদেশিক ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে ৩০ নভেম্বর আমি নাগপুর ছেড়ে অমরাবতী রওনা হই। এর ফলে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য বিভাজন হয় তার অধিকাংশ সম্পর্কেই আমার জ্ঞান পরোক্ষ। অমরাবতী থেকে নাগপুরে ফিরে আমি চাঞ্চল্যকর অগ্রগতি এবং নতুন কর্মকর্তাদের সম্পর্কে শুনি। আমি দক্ষিণ এবং বামপন্থী উভয় প্রতিনিধিদের সঙ্গেই কথা বলেছি। আমি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বিবৃতি পড়েছি, যে-বিবৃতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক প্রশংসার্হ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। এখন আমি বর্তমান অবস্থা এবং এ-বিষয়ে আমার কর্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হওয়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছি।

প্রথমেই আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের পরস্পরের মধ্যে যে অভিযোগ চলেছে, আমি আন্তরিকভাবে তার নিন্দা করি। এই দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বামপন্থার আবির্ভাব হয়েছে এবং সম্প্রতি তার শক্তি এবং গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং আমার মতে, কাম্য লক্ষণ। আমি তাঁদের কাছ থেকে যা শুনেছি, তার পরে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, এমন কি সৎ দক্ষিণপন্থীরাও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থার আবির্ভাবকে স্বাগত জানান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁদের সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা গভীরতম, এমন কথাও বলেছেন যে, একদিন না একদিন বামপন্থীরা অনিবার্যভাবে ক্ষমতায় আসবে। অতএব

বামপন্থীদের প্রতি দক্ষিণপন্থীরা বিদ্বেষ পোষণ করবেন কেন আমি তার কোনও কারণ দেখতে পাই না।

যে-সমস্ত ব্যক্তিগত বিবাদ এবং দোষারোপ দেখা দিয়েছে তার পিছনে আছে দক্ষিণ এবং বামপন্থীদের মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক ব্যবধান। বামপন্থীরা নির্দিষ্ট নীতি এবং বিশেষ এক মানসিকতার সমর্থক। জনসমর্থন লাভের জন্য তাঁদের নিজেদের বক্তব্যের গুণের উপর নির্ভর করা উচিত, দক্ষিণপন্থীদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের উপর নয়। বস্তুত, দক্ষিণপন্থীদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রশ্রয় না দিয়ে এ-কাজে বিরত থাকলেই বামপন্থীরা তাঁদের কাজ আরও এগিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। হুইটলি কমিশনের উপর ভোটের ঠিক আগেই আমি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এই নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলাম। আমাকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এ-কথা বলতে হবে যে, দোষারোপের অবাঞ্ছিত কাজ ছাড়াও, একজন দক্ষিণপন্থীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং একজন বামপন্থীকে মস্কোর দালাল মনে করা ভুল।

আমার জানা আছে যে, ৪০,০০০ সদস্যসম্বলিত গিরনি কামগর ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় থেকে এই ভ্রান্ত ধারণার শুরু। দক্ষিণপন্থীদের মনে হয় যে, এই স্বীকৃতির ফলে বামপন্থীদের শক্তি হঠাৎ উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য বামপন্থীদের কেউ দোষ দিতে পারে না, কারণ কার্যনির্বাহী পরিষদে তাঁরা নিজেরা কখনও এই প্রস্তাব পাস করাতে পারতেন না। প্রস্তাব শুধু এই কারণে পাস হয়েছিল যে, দক্ষিণপন্থী অথবা অ-কমিউনিস্ট বামপন্থী কিছু সদস্য, অবশ্যই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, কমিউনিস্ট বামপন্থীরা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। গিরনি কামগর ইউনিয়নের উপর ভোটের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু গিরনির কামগর ইউনিয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এমন কয়েকজন অ-কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা এই কারণে এ-কাজ করেছেন যে, এই ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের হাতে প্রচণ্ড উৎপীড়িত হচ্ছিল এবং সমর্থন লাভের যোগ্য ছিল। তাঁরা এ-কথাও বলেছিলেন যে, তাঁদের ভোটের অর্থ এই নয় যে, সব ব্যাপারেই তাঁরা গিরনি কামগর ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। দক্ষিণপন্থীরা হঠাৎ কেন পরাজিতের মনোভাব অবলম্বন করলেন এবং কংগ্রেস থেকে নিজেদের সরিয়ে নিলেন জানি না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর বিবৃতিতে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থকরা উপস্থিত থাকলে এই অবস্থাতেও তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতেন ; এবং আমি এটা নিশ্চিতরূপে জানি যে, যে-সব সদস্য গিরনি কামগর ইউনিয়নের স্বীকৃতির এবং হুইটলি কমিশন সম্পূর্ণরূপে বর্জনের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরা সবা প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির মতো প্রশ্নে একমত ছিলেন না। দক্ষিণপন্থীরা যদি উপস্থিত থাকতেন তবে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, যে-সব প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের প্রবল আপত্তি, তাঁরা যাঁদের নিশ্চিতরূপে 'লাল' মনে করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই সেই সব প্রস্তাব বাতিল করতে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে ভোট দিতেন। প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়নের সচিবালয়ের স্বীকৃতির মতো প্রস্তাবগুলির পক্ষে ভোট দিয়ে দক্ষিণপন্থীরা অবস্থা আরও খারাপ করে তোলেন। এখন তাঁরা বলছেন যে, বিবেকের দিক থেকে তাঁরা এর বিরোধী। এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থীদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বে তাঁরা আপত্তি করতে পারেন না, গিরনি কামগর ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দানেও তাঁরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন না। অধিকন্তু, তাঁদের উপস্থিতিতে হুইটলি কমিশন বর্জনের প্রশ্নে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদ যে-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাঁদের উচিত খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়ে তা গ্রহণ করা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সচিবালয়ের শাখারূপে অনুমোদনের প্রশ্নটি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। এর ফলে, আমার কাছে যা কলহের

প্রকৃত কারণ বলে মনে হয়, তার আর অস্তিত্ব নেই। 'লিগ এগেন্স্ট ইম্পিরিয়্যালিজম'-এর শাখারূপে অনুমোদন দক্ষিণপন্থীদের কাছে যথেষ্ট অসন্তোষের হেতু হতে পারে না। কারণ, এই অনুমোদন গত বছর ঝরিয়া কংগ্রেসেও স্বীকৃতি পেয়েছিল। জেনিভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে আমি নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, অনেক দক্ষিণপন্থী এখন এর বিরোধী। তাঁদের বিরোধিতা নীতিগত কারণে নয়। তাঁরা মনে করেন যে, সরকারের খরচায় ইউরোপ যাতায়াতের ব্যবস্থার ফলে শ্রমিক জগতের কোনও কোনও অংশের মনোভাব ভেঙে পড়বে। অতএব সেই কারণে এই প্রকার কোনও প্রলোভনের অস্তিত্ব না থাকলেই দলমতনির্বিশেষে সকল শ্রমিককর্মীর পক্ষেই মঙ্গলজনক। যাই হোক না কেন, জেনিভায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত যখন সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন লাভ করেছে, কোনও শ্রেণী বা গোষ্ঠী তার বিরোধিতা করতে পারে না। নেহেরু রিপোর্ট, ভাইসরয়ের ঘোষণা এবং প্যান-এশিয়াটিক লেবার কনফারেন্সের উপর প্রস্তাব সম্পর্কেও আমি একই কথা বলব।

পরিশেষে, আমার দক্ষিণপন্থী বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে এই আবেদন করছি যে, তাঁরা যেন তাঁদের বর্তমান মনোভাবের পুনর্বিচার করেন। যা কিছু ঘটেছে তার পরেও যদি তাঁরা মূল সংস্থা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেবার সিদ্ধান্ত নেন, তবে তাঁরা এক বিরাট দায়িত্ব নেবেন। আমার মতো সামান্য লোকের মতে এমন কাজ হবে অখেলোয়াড়জনোচিত, অগণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেম-বিরোধী। সংবাদপত্রে যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে তা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বিভাজন হবে না। এমন কি নিজেরা আজ সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনা এ বিষয়ে দক্ষিণপন্থীদের সন্দেহ থাকলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তাঁরা এক শক্তিশালী এবং কার্যক্ষম উনজন। তাঁরা যদি বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের নীতি অভ্রান্ত তা হলে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের আগে এই উনজনকে অধিজনে পরিণত করার প্রচেষ্টার দায়িত্ব তাঁদের। এমন কি বামপন্থীরা যখন অকিঞ্চিৎকর সংখ্যালঘু ছিলেন তখনও তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন এবং কখনও সংখ্যালঘুতে পরিণত হলে দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসের বাইরে চলে যাবেন কেন আমি তার কোনও কারণ দেখতে পাই না। আমি নিরপেক্ষভাবে পরিস্থিতি বিবেচনার চেষ্টা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এমন যথেষ্ট কোনও কারণ নেই যার জন্য বিভাজন হতে পারে। দেওয়ান চমনলাল সম্প্রতি যে-বিবৃতি প্রচার করেছেন তা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক ; কিন্তু তিনি যা বলেছেন এবং যে-পরামর্শ দিয়েছেন তা পুনরায় বিবেচনা করে দেখতেও আমি তাঁর কাছে আবেদন জানাব। আজ যা অবস্থা তাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতেও অটল থাকলে এই সন্দেহ দেখা না দিয়ে পারে না যে, আসলে হুইটলি কমিশন বর্জনই দক্ষিণপন্থীদের অথবা তাঁদের একাংশকে বিরক্ত এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে তুলেছে। হুইটলি কমিশনের প্রশ্নে এই বিভাজন শুধু অবাঞ্ছনীয়ই নয়, দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে অরাজনৈতিকও বটে।

আগামী বছরের জন্য আমাকে সভাপতি করে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আমার উপর যে-দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে আমি তা গ্রহণ করব স্থির করেছি। কংগ্রেস যখন এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন, তখন দায়িত্ব পরিহার করলে কর্তব্য পালনে আমি ব্যর্থ হতাম বলে মনে করি। কংগ্রেসের উভয় বিভাগেই আমার বন্ধু আছেন এবং আমি যা জানতে পেরেছি তাতে আমার সন্দেহ নেই যে, আমি তাঁদের সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে পারি। প্রয়োজন বোধ করলে বিভেদ দূর করতে এবং যৌথ কর্মসূচির জন্য প্রস্তুত হতে এই মাসের কোনও এক সময়ে উভয় দলের এক সম্মেলন আহ্বানের ইচ্ছা আমার আছে।

ছাত্র এবং তাঁদের আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব

১৯২৯ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রচারিত বিবৃতি

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত আমার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ সংবলিত একটি প্রচারপত্রের প্রতি কিছু দিন আগে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। গত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বাৎসরিক সভার সময় এই প্রচারপত্রগুলি সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। কয়েকজন ছাত্রবন্ধু আমাকে বার বার এই অনুরোধ করেছিলেন যে, এই প্রচারপত্রে কয়েকটি ভুল বিবৃতির জবাব আমার দেওয়া উচিত। দুটি কারণে এ পর্যন্ত আমি এ কাজ থেকে বিরত থেকেছি। প্রথমত, যদিও রাজনৈতিক মতবিরোধে আমি অভ্যস্ত, আমার মনে হয়েছিল যে, বয়সে অনেক ছোট এবং যাকে আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি এমন একজনের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া আমার পক্ষে অশোভন। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়েছিল যে, আমাকে যদি বিবৃতি দিতে হয় তা হলে অন্য এমন সব যুবক বন্ধুদের সমালোচনা করতে হবে যাঁদের সম্পর্কে আমি চিরদিন স্নেহ পোষণ করে এসেছি, অন্যান্য স্বার্থান্বেষী লোকের প্ররোচনায় সম্প্রতি তাঁরা আমার বিরুদ্ধে যা বলছেন বা করছেন তা সত্ত্বেও। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, কোনও কোনও মহলে আমার নীরবতার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং সাধারণত আমার সংস্পর্শে যাঁরা আসেন না ছাত্রসমাজের সেই বৃহৎ অংশের জ্ঞাতার্থে আমার কিছু বলা উচিত।

যখন দেখি জনসাধারণের কেউ কেউ, যাঁরা নিজেদের নেতা বলে দাবি করেন, হঠাৎ ছাত্রসমাজের প্রতি স্নেহপরায়ণ এবং দরদী হয়ে উঠছেন এবং ছাত্র আন্দোলনের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে অন্যকে উপদেশ দিচ্ছেন, তখন আমি বরং কৌতুক বোধ করি। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের এই সব নতুন বন্ধুরা এই আন্দোলনের প্রতি প্রায় কোনও আগ্রহই দেখাননি এবং এই আন্দোলনের শৈশবাবস্থা অতিক্রম করতে কোনও সাহায্যই করেননি। এই প্রদেশে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী এই আন্দোলনকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য করেছেন, আমি তাঁদের একজন এবং বর্তমানে যাঁরা আমাকে আক্রমণ করতে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন এই সত্য, এমনকি, তাঁদেরও অজ্ঞাত নয়। আমি যে কারণে এই আন্দোলনকে সাহায্যের চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতেও যথাসাধ্য সাহায্য করব তা স্পষ্ট। প্রথমত, অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তির পর থেকেই আমি সর্বদা এই দেশে যুব এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছি, কারণ আমি নিশ্চিত যে, ছাত্র এবং যুবকদের হাতেই এই দেশের ভবিষ্যৎ। দ্বিতীয়ত, আমি যখন ছাত্র ছিলাম আমাকে এবং আমার কিছু সহাধ্যায়ীকে, যাঁদের মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠরাও ছিলেন, কর্তৃপক্ষের হাতে উৎপীড়ন সইতে হয়েছিল। সেই সময় স্বর্গীয় বাবু মতিলাল ঘোষ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যতীত কোনও রাজনৈতিক নেতা আমাদের সমর্থন করতে এবং আশ্রয় দিতে এগিয়ে আসেননি। এর ফলে আমাদের দেশে ছাত্রদের ভাগ্যে কখনও কখনও যে অপমান এবং উৎপীড়ন জোটে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে। সবশেষে, এই দেশে ছাত্রদের হীন অবস্থার তুলনায় জনসাধারণ এবং সরকারের চোখেও ইংল্যান্ডের ছাত্ররা যে উৎকৃষ্টতর মর্যাদা ভোগ করে, আমার মনে তা এক চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। আমাদের দেশে উচ্চতর মর্যাদা এবং স্থান লাভের জন্য ছাত্রদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। এই সব কারণে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের যে অপমান এবং লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় আমি তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে পারি, এবং আমার দৃঢ় সঙ্কল্প এই যে, ছাত্ররা যখনই আমার কাছে সাহায্য চাইবেন আমি তখনই তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে যাব। নিজেদের জীবনে উপরে বর্ণিত অভিজ্ঞতা না থাকলে আমিও ছাত্রদের ব্যাপারে আজকের অন্য কিছু রাজনৈতিক নেতার মতো সহানুভূতিহীন এবং উদাসীন থাকতে পারতাম।

আমি স্বীকার করছি সম্প্রতি কিছু ছাত্র যে-কৌশল অবলম্বন করেছেন তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি। ছাত্রদের ব্যাপারে আমি অতীতে কী করেছি, ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের প্রতি সর্বদাই আমার মনে কী সহানুভূতি পোষণ করেছি, তাঁরা তা ভালভাবেই জানেন। বাংলায় এ ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, বিভিন্ন সময়ে ছাত্রদের বন্ধুত্ব অর্জনের জন্য আমি কর্তৃপক্ষের এবং জাতীয়তাবিরোধী সংবাদপত্রের ক্রোধ এবং বিরাগভাজন হয়েছি। তাই বর্তমান পরিস্থিতি সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়ে এই সব সংবাদপত্র ছাত্র আন্দোলনের প্রতি গভীর উৎকণ্ঠা প্রদর্শন করে আন্দোলনের শত্রুরূপে আমাকে আক্রমণ করছে দেখে আমি কৌতুক বোধ করি। এত দিন ধরে যখন-তখন ছাত্র আন্দোলনকে আক্রমণ করে আজ যদি এই সব সংবাদপত্র সত্যিই ছাত্র আন্দোলনের কার্যকারিতা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে থাকে, তা হলে আমার পক্ষে এটা সত্যিই আনন্দের দিন।

যে-সব ছাত্ররা বর্তমানে আমাকে আক্রমণ করছেন আমি তাঁদের পুরোপুরি দোষ দিচ্ছি না, কারণ আমি মনে করি ওঁরা কী করছেন তা ওঁরা জানেন না। বর্তমানে তাঁরা স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের হাতের পুতুল, কিন্তু সে দিন বেশি দূরে নেই, যে দিন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। আমি তাঁদের এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে চাই যে, তাঁদের সম্পর্কে আগে আমার যে সহানুভূতি ছিল মধ্যবর্তী সময়েও তা বজায় থাকবে। এমন কি তাঁরা ভুল করলে অথবা আমার ক্ষতি করতেও চাইলেও তাঁদের সম্পর্কে আমার যে সহানুভূতি ছিল রাতারাতি তার পরিবর্তন ঘটানো যাবে না।

স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার যে সমালোচনা করছেন তার সবটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় এবং তার ফলে তার সবগুলির জবাবও আমি দিতে পারি না। কিন্তু আমি চাই ছাত্রসমাজের বৃহত্তর অংশ, যাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই, আমার অতীত কার্যকলাপ এবং মনোভাব দেখে আমাকে বিচার করুন। আমি ক্রমাগত ছাত্রসম্প্রদায়কে সমর্থন করে এসেছি এবং এটা যদি যথেষ্ট না হয়, আমি চাই তাঁরা আমাদের সেই ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকুন, যে ভবিষ্যৎ প্রমাণ করবে ছাত্রদের প্রকৃত বন্ধু কে।

পূর্বে আমি যে প্রচারপত্রের উল্লেখ করেছি তাতে এমন কিছু মিথ্যা বিবৃতি আছে যার প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। লেখক বলছেন যে, এক ঘরোয়া সম্মেলনে আমি নাকি এই মত প্রকাশ করেছি যে, ছাত্র সমিতির একমাত্র লক্ষ্য রাজনৈতিক। ঘরোয়াভাবে অথবা জনসমক্ষে আমি কখনও এমন কথা বলিনি। ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত এবং আমি সর্বদাই এই মত সমর্থন করেছি যে, ছাত্র আন্দোলন হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক স্বাধীন আন্দোলন। ১৯৩০ সালে ছাত্রদের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েক মাস আগে হাওড়া রাজনৈতিক সম্মেলনে আমি যা বলেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করব, অর্থাৎ ত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিলে জাতির আহ্বানে ছাত্রদের লেখাপড়া বন্ধ রাখতে প্রস্তুত থাকতে হবে, অন্যান্য দেশে ছাত্ররা যেমন করেছে। কিন্তু এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য নয়, মাত্র অল্প সময়ের জন্য— ধরুন এক বছর। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, প্রচারপত্রের লেখকের সঙ্গে ১৯৩০ সালে ছাত্রসমিতির লক্ষ্য সম্পর্কে গত কয়েক মাসে আমার কোনও কথা হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না।

প্রচারপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, আমার কিছু সহকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে নিখিল বঙ্গ ছাত্রসমিতি (A.B.S.A) কাজকর্মকে ব্যঙ্গ করেছেন। "আমার সহকারী" বলতে কী বোঝায় আমি জানি না, তবে আমি যতটুকু জানি তাতে নিখিল বঙ্গ ছাত্রসমিতির এমন কোনও কাজকর্ম সম্পর্কে আমি অবহিত নই এবং সে-হেতু, সে সম্পর্কে কোনও মতামত গঠনের সুযোগ আমার আসেনি।

ময়মনসিংহ সম্মেলনের সভাপতিত্ব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য এই যে, আমার অনুরোধে এবং আমার ঘরে আমি উভয়পক্ষকে (অর্থাৎ নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির প্রতিনিধিগণকে) ডঃ আলমকে সভাপতি নির্বাচিত করতে রাজি করাই। এই বিবৃতির

প্রতিবাদ করতে আমি যে কোনও লোককে চ্যালেঞ্জ করছি এবং সাহসের সঙ্গে বলছি যে, আমার হস্তক্ষেপ ছাড়া ডঃ আলমের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত না এবং ডঃ আলম ছাড়া সম্মেলন সফল হত না। কলকাতায় থাকার সময় ডঃ আলম অনুগ্রহ করে আমার অতিথি হয়েছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিকে সর্বোত্তমরূপে কাজে লাগিয়ে সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সব কিছু করতে আমার ময়মনসিংহের বন্ধুদের কাছে আবেদন করেছিলাম। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে দেখা গিয়েছে এই আবেদনে ফল হয়েছিল। বিবাদটি আরও আগে আমার নজরে আনা হয়নি বলে আমি ছাত্রদের তিরস্কার করেছিলাম, কারণ তা হলে শুরুতেই আমি সকল পরিস্থিতি সহজ করে দিতে পারতাম, যেমন করেছিলাম ১৯২৮ সালে ছাত্রদের তরফ থেকে জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতিত্ব গ্রহণের অনুরোধ করে।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির গঠনতন্ত্র অনুসারে জেলা সমিতিগুলি সভাপতিত্বের জন্য সুপারিশ করবে এবং সুপারিশ পাওয়ার পরে অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতির একটি তালিকা নির্বাচন করবে। এর ফলে পছন্দমাফিক যে কোনও ব্যক্তিকে নির্বাচনের অধিকার অভ্যর্থনা সমিতির ছিল। গোলমালটা হয়েছিল এই কারণে যে, সাধারণ কার্যনিবাহী সদস্যদের কয়েকজন নিজেদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত কাউকে সভাপতি করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা ডঃ আলমের নামটি আসল উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য ব্যবহার করছিলেন। ভাবী প্রার্থী ওই ভদ্রলোকের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে কখনও কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে অনেক দিন আগে। তাঁকে সম্মেলনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দলের একজনকে প্রখ্যাত বানিয়ে দলকে জয়ী করা। যে আমি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বাংলা এবং বাংলার বাইরে ছাত্রসভা এবং ছাত্রসম্মেলনে বক্তৃতা করতে এবং সারা বছর অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে অভ্যস্ত, তার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করার বাসনা পোষণের অপবাদ এমন এক অভিযোগ, যা আমার অতি বড় শত্রুকেও প্রতারিত করবে না। পরিস্থিতিকে এভাবে আমার বিরুদ্ধে পরিচালনার জন্য তরুণ লেখকের নৈপুণ্য এবং চাতুর্যকে আমি প্রশংসা করি, যদিও এই নবীন বয়সে তাঁর নৈতিকতার অভাবকে আমি নিন্দা করি।

নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কিছু সদস্যের অভ্যর্থনা সমিতির কাজের বিরোধিতার প্রকৃত কারণ ছিল যাঁকে নির্বাচিত করার জন্য তাঁরা কয়েক মাস প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন, ভবিষ্যতে তাঁদের সেই নিজেদের লোককে নির্বাচিত করার বাসনা। ডঃ আলমের জন্য তাঁদের উদ্বেগ ছিল পশ্চাৎচিন্তা, যার উদ্দেশ্য নিজেদের পরাজয়কে গোপন করা। যাঁরা নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কার্যনির্বাহকদের বিরোধী ছিলেন, তাঁদের তরফ থেকে ডঃ আলমের প্রার্থী হওয়ায় কোনও আপত্তি ছিল না এবং আমি তাঁর নাম সুপারিশ করলে অভ্যর্থনা সমিতি সানন্দে রাজি হয়।

আমার মনে হয় আজ ছাত্রদের মধ্যে গোলমালের কারণ কী এখন আমার তা খোলাখুলি বলা উচিত। ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ নিতান্তই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির বিবাদের ফল। অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে আমি সর্বদাই কর্মে ঐক্য প্রতিষ্ঠার এবং কংগ্রেসকর্মীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ দূর করার কথা বলে আসছি। কিছু সময়ের জন্য চমৎকার ফল পাওয়া গিয়েছিল এবং এক সাধারণ কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য অধিকাংশ গোষ্ঠীই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। সম্প্রতি তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং একটি দল অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। যেহেতু আমার নীতি, কার্যধারা এবং কর্মসূচি সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন এবং সমর্থন লাভ করেছে, বিরোধী দল সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীতে, অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছে এবং বর্তমানে তাঁদের সঙ্গে এবং আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে। নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির সদস্যরা, যাঁরা এখন আমার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে রত, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই বিশেষ গোষ্ঠীর প্রভাবাধীন। এই রাজনৈতিক গোষ্ঠী এই ছাত্রদের তাঁদের নিজেদের এবং ছাত্রসমাজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। তাঁদের জন্য আমি দুঃখ বোধ

না করে পারি না, কারণ আগের মতো এখনও তাঁদের জন্য আমি স্নেহ অনুভব করি। আমার বিশ্বাস আজ যদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিভেদ দূর হয়, পরের দিনই ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ দূর হবে। আমি আগেই বলেছি এই রাজনৈতিক গোষ্ঠী চেয়েছিল তাদের কোনও সদস্য ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করুক এবং তিনি যাতে প্রার্থীরূপে গৃহীত হন সেই জন্য নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতির কিছু সদস্য ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে অনেক জেলায় প্রতিনিধি পাঠানো হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে যাঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে সেই সব সমিতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যারা নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির এই তাঁবেদারি মেনে নেবে। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অবশিষ্ট ছাত্রদের উপর নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্ধত এবং স্বেচ্ছাচারীরূপে কাজ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই সব কৌশলের ফলে এক প্রতিক্রিয়া হয় এবং বাংলার ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এই ক্রোধ ময়মনসিংহ সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করে। আমি এটা ডঃ আলমের কাছ থেকে প্রামাণিকভাবে জেনেছি যে, তাঁর বিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির মাধ্যমে সম্মেলনে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পেশ করা না হলেও, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, প্রতিনিধিদের এক বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কার্যনির্বাহকদের বিরোধী ছিলেন। সুতরাং তিনি কার্যনির্বাহকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপসরফা করতে উপদেশ দেন। আমি যত দূর জানি তাঁরা এখনও তা করেননি।

আমি পড়ে বিস্মিত হয়েছি যে, আমি ছাত্রদের অথবা তাঁদের কোনও গোষ্ঠীকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছি। পূর্ববর্ণিত কারণে ছাত্র আন্দোলনের শৈশব থেকেই আমি এর প্রসারকে উৎসাহিত করেছি। রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্ররোচনায় আজ যাঁরা আমার বিরোধিতা করছেন, তাঁদের অন্যের চেয়ে বেশি জানা উচিত ছাত্রদের জন্য আমি কী কাজ করেছি। নিজেদের স্বার্থে আজ যাঁরা আমার বিরোাতা করছেন, তাঁরা সেই লোক, যাঁরা জন্ম থেকে ছাত্র আন্দোলনকে কোনওভাবে সাহায্য না করেও সত্যিই ছাত্রদের কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছেন।

অভ্যর্থনা সমিতি এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির মধ্যে বিবাদ সম্পর্কে বলতে চাই যে, আমি চিঠিপত্র এবং নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির গঠনতন্ত্র পড়ে দেখেছি এবং দেখতে পাচ্ছি যে, গঠনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অভ্যর্থনা সমিতি নির্ভুল কাজ করেছে। প্রচারপত্রে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে কিছু অসৌজন্যমূলক মন্তব্য আছে এবং তাঁরা এমন কিছু বিবৃতি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে যা স্পষ্টতই উদ্ভট। এই দুই ভদ্রলোকেরই নিজেদের ভার গ্রহণের মতো যথেষ্ট শক্তি আছে। আমি শুধু এইটুকু বলব যে, নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির সচিব কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রে আমার সঙ্গে এই দুই ভদ্রলোককেও যে টেনে আনা হয়েছে তা থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, এই প্রচারপত্রের লক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক এবং এই সব কৌশলের পিছনে আছেন রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। আমি এখানে এ কথাও বলতে চাই যে, কলকাতায় থাকার সময় ডঃ আলম আমাকে বলেছিলেন— নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কার্যনিবহী সদস্য ময়মনসিংহে তাঁকে বলেছিলেন যে, সকলে যদি চান তবে তাঁরা পদত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সংবাদপত্রে এই তথ্য প্রকাশিত হোক ডঃ আলম তা চাননি, কারণ এটা ছিল গোপন আলোচনা। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমি এখন এই ঘটনা বলছি তার কারণ প্রচারপত্রের লেখক বিবৃতিটি চ্যালেঞ্জ করেছেন।

সবশেষে, যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বর্তমানে আমার বিরোধিতা করছেন, নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির কিছু কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক তাদের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হয়েছেন বলে আমি গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করতে চাই। আত্মরক্ষা করার মতো যথেষ্ট শক্তি আমার আছে এবং ওরা আমার যে ক্ষতি করতে পারবেন তা নগণ্য, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের যে ক্ষতি তারা করতে পারেন এবং করছেন তা অপরিসীম। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রচারিত এই প্রচারপত্র যে প্রথমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস

কমিটির সদস্যরা কলকাতা পৌঁছলে শেয়ালদা স্টেশনে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিসে নির্বাচনের সময়েই বিলি করা হয় এটা আপতিক ঘটনার চেয়ে কিছু বেশি। এই সব প্রচারপত্র হাজার হাজার ছাপানো হয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে বিলি করা হয়েছে। কারা আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছেন এবং অর্থ যোগাচ্ছেন তা কারও অজানা নেই। সমস্ত প্রচারপত্রে ছাত্রদের অথবা ছাত্রদের কোনও গোষ্ঠীকে আক্রমণ করা হয়নি ; সমস্ত সমালোচনা জমা রাখা হয়েছে আমার মতো কর্মীদের জন্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সব কৌশলের সঙ্গে আমি পরিচিত। কিন্তু যখন দেখি যে, যাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, আমাদের তেমন কিছু ছাত্র— প্রাক্তন ছাত্র, বাইরের লোক এবং রাজনীতিকদের প্ররোচনায় নিজেদের এবং নিজেদের আন্দোলনকে এতটা বিস্মৃত হয়েছেন যে এই সব অসৎ কৌশল অবলম্বন করছেন, তখন আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। কিন্তু আমার নিশ্চিত আশা আছে যে, শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারবেন এবং কে তাঁদের শত্রু এবং কে মিত্র তাঁরা নিজেরাই তা জানতে পারবেন। তত দিন আমি তাঁদের এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, ছাত্রদের এবং তাঁদের আন্দোলনের প্রতি আমার মনোভাব এবং সহানুভূতি আগে যেমন ছিল চিরকালই তেমন থাকবে।

স্বাধীনতার স্বার্থে আমূল রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

১৯২৯ সালের ১ ডিসেম্বর অমরাবতীতে প্রদত্ত মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ছাত্রসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ

মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের এই ছাত্রসম্মেলনে যোগ দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বস্তুত, এই প্রকার একটি ছাত্রসম্মেলনে যোগ দিতে পারা কেবলমাত্র অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপারই নয়, বিরাট এক সুযোগও বটে। আমি ভেবেচিন্তে এই কথা বলছি এবং এর মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই, কারণ ছাত্র সম্মেলনে আমি যেন নিজেকে সন্তোষজনক পরিবেশের মধ্যে খুঁজে পাই। যদিও আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পেরিয়ে এসেছি দশ বছর আগে, তবু নিজেকে আমি অন্য এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অতি বিনয়ী ছাত্রের বেশি কিছু মনে করি না। এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কিছুটা বড়— মানে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়। এবং যদিও বর্তমানে আমি জীবনের বিদ্যালয়ে পাঠ নিচ্ছি, আমার বিশ্বাস আপনাদের অসুবিধা এবং সমস্যা, সুখ এবং দুঃখ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করার মতো যথেষ্ট কল্পনাশক্তি এখনও আমার মধ্যে অবশিষ্ট আছে।

তথাপি ছাত্রদের এক সম্মেলনে সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে— কারণ, "সচ্চরিত্রতা"-র দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন নিষ্কলঙ্ক নয়। যে দিন আমার কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে বহিষ্কারের আদেশ শুনিয়েছিলেন, সে দিনটি এখনও আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর কথা এখনও আমার কানে বাজে— "তুমি কলেজের সবচেয়ে গোলমেলে লোক।" আমার জীবনে সেটা ছিল সত্যিই এক স্মরণীয় দিন— অনেক দিক থেকে আমার জীবনের এক সন্ধিক্ষণ। আমার জীবনে এটাই প্রথম ঘটনা যখন আমি কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুঃখভোগের আনন্দের আস্বাদ পাই— এমন আনন্দ, যার তুলনায় জীবনের অন্য সব আনন্দ ম্লান এবং তুচ্ছ হয়ে যায়। এটা আমার জীবনে প্রথম ঘটনাও বটে যখন আমার তাত্ত্বিক নৈতিকতা এবং তাত্ত্বিক দেশভক্তির পরীক্ষা হয়, এবং খুব কঠিন পরীক্ষা— এবং আমি যখন এই অগ্নিপরীক্ষায় অক্ষত অবস্থায় উত্তীর্ণ হলাম, তখন আমার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন চিরদিনের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, নিজের কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করছি বলে আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন আমি এক

অদ্ভুত লোক। কিন্তু আপনাদের কি মনে হচ্ছে না যে, নৈতিকতা এবং দেশপ্রেম সম্পর্কে উপদেশ দিতে আমি এখানে আসিনি, এসেছি নিজের উপলব্ধি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপনাদের যথাসম্ভব পরামর্শ দিতে ? এবং এটা কি সত্য নয় যে, তবু কেবল সেই শিক্ষাই মূল্যবান যা লাভ করা হয়েছে অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে ?

ভারতবর্ষে আজ এক আলোড়ন চলেছে। অনেক ভাবধারার স্রোত এবং অন্তঃস্রোত কাজ করছে— এবং বিভিন্ন আন্দোলন, চরিত্রে এদের কোনটি সংস্কারপন্থী এবং কোনটি চরমপন্থী, ভারতবর্ষের জীবন রূপান্তরিত করতে ব্যস্ত। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সামনে তাকিয়ে ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথ স্থির করা সব সময় সহজ নয়। কিন্তু যাঁরা তরুণ, যাঁরা আদর্শে অনুপ্রাণিত, যাঁরা ইতিহাস-সচেতন এবং যাঁরা জাতির চেতনার সুরের সঙ্গে নিজের চেতনার সুরটি বেঁধে নিতে পারেন, কেবলমাত্র তাঁরাই এ-কাজ করতে পারেন। আজ বিভিন্ন যে সব আন্দোলন দেখা যাচ্ছে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের প্রত্যেকটি মূল্য সম্পর্কে মতামত দিতে গেলে একাধিক বক্তৃতার প্রয়োজন হবে। সুতরাং সে চেষ্টা আমি করব না। কিন্তু যে একটি কথা আমি সুনিশ্চিতরূপে বলতে চাই তা হল— আমরা যদি ভারতবর্ষকে পুনর্যৌবন দিতে চাই এবং তাকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে চাই, তা হলে ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে আমাদের আগের ধারণার পরিবর্তন করতে হবে।

এমন কি অত্যন্ত অমনোযোগী পর্যবেক্ষকের নজরও এড়িয়ে যাবে না যে, আজকের অধিকাংশ আন্দোলনই চরিত্রের দিক থেকে অগভীর, মানুষের জীবনের গভীরে আলোড়ন না তুলে এগুলি শুধুমাত্র আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের প্রান্ত স্পর্শ করে যায়। এই সব আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় না হলেও জাতীয় জাগরণ আনতে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের সর্বাধিক কাম্য হল অন্তরের ভিতরে জাগরণ। জাতির আত্মার ভিতরে আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে— এবং স্বল্পতম সময়ে কী করে তা করতে পারি সেটাই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশ প্রাচীন ; আমাদের সভ্যতা তার গতিময় চারিত্র্য না হারালেও প্রাচীন। জাতি হিসাবে আমরা আমাদের জীবনে অসংখ্য উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে এসেছি এবং কখনও কখনও আমাদের পরাভূত করতে চেয়েছে এমন অনেক আক্রমণ আমরা সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করেছি। অতএব আমরা যদি কখনও কখনও শ্রান্তি, অবসন্নতা এবং আলস্যের কাছে হার মানি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ এমন কি প্রকৃতির ব্যবস্থাতেও প্রাণীকে বাঁচাতে সময়ে সময়ে বিশ্রাম এবং নিদ্রার প্রয়োজন। কিন্তু আমরা অলস হয়ে পড়লেও জাতি হিসাবে আমরা মৃত নই। জীবনের প্রমাণ চিন্তা মৌলিকতা এবং সৃজনধর্মী কার্যকলাপে এবং এই সব লক্ষণের দিক থেকে জাতি এবং ব্যক্তি হিসাবে আমরা এখনও গর্ব করতে পারি। আমরা বেঁচে না থাকলে জাতীয় জীবনের সমস্ত আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হত, কিন্তু যেহেতু আমরা জীবন্ত এবং প্রথম শ্রেণীর জাতি গঠন করতে যে সম্পদ প্রয়োজন তার সমস্তই আমাদের আছে, আমরা এক গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে পারি।

অতএব আমরা যা চাই তা হল অন্তরের ভিতর থেকে এক জাগরণ, যা আমাদের জীবনে এক আমূল রূপান্তর আনবে। জোড়াতালি দেওয়া সংস্কারে কাজ হবে না— ভাসা-ভাসা প্রতিকারে ফল পাওয়া যাবে না। যা প্রয়োজন তা হল আমাদের সমগ্র জীবনের রূপান্তর— এক সম্পূর্ণ বিপ্লব, যদি তা পারেন। 'বিপ্লব' শব্দটিকে 'এড়িয়ে' যাবেন না। 'বিপ্লব'-এর ধারণা সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাস করে না এমন একজন জীবন্ত মানুষের দেখা আমি এখনও পাইনি। "বিবর্তন" এবং "বিপ্লব"-এর মধ্যে সহজাত কোনও পার্থক্য নেই। বিপ্লব হল অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষেপিত বিবর্তন এবং বিবর্তন হল দীর্ঘতর সময়ে বিস্তারিত বিপ্লব। বিবর্তন এবং বিপ্লব উভয়ের মধ্যেই রয়েছে পরিবর্তন এবং প্রগতির ইঙ্গিত এবং প্রকৃতির মধ্যে উভয়েরই স্থান আছে। বস্তুত, এদের একটিকে বাদ দিলেও প্রকৃতির চলে না।

আমি বলেছি যে, ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে আমাদের অনেক ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। আমি বলেছি যে, আমরা আমাদের সমগ্র জীবনের আমূল রূপান্তর চাই। আমরা যদি

জাতি হিসাবে মহৎ হতে চাই এবং পৃথিবীর অগ্রগণ্য জাতিগুলির মধ্যে সম্মানের আসন অধিকার করতে চাই, তবে এর প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র একটি আদর্শের জন্য যাপন করলেই জীবন অর্থবহ, যোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোনও জাতি যদি অগ্রগতি না চায় এবং কেবলমাত্র স্বার্থপর অভিলাষ সিদ্ধ করতে শক্তি অর্জন করতে চায়, তবে সেই জাতির বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই, বস্তুত তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই ; মনুষ্যজাতিকে মহৎ করতে জাতির মহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত— যাতে শেষ পর্যন্ত পৃথিবী বাসের পক্ষে আরও ভাল এবং আরও সুখকর হয়ে ওঠে।

বৌদ্ধিক, নৈতিক এবং পার্থিব যে-সব সম্পদ কোনও জাতিকে মহৎ করে, সে সবই ভারতবর্ষের আছে ; এবং তার প্রাচীনত্বের জীর্ণতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ আজও বেঁচে আছে— যেহেতু আবার তাকে মহান হয়ে উঠতে হবে, যেহেতু তাকে এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। ভারতের উদ্দেশ্য প্রথমে নিজেকে বাঁচানো এবং তার পরে পৃথিবীর সামগ্রিক কৃষ্টি এবং সভ্যতার সঙ্গে নিজের অংশটুকু যোগ করা। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতের অবদান কোনও দিক থেকেই নগণ্য নয়। নিজের প্রতিভা অনুযায়ী নিজের জীবনকে বিকশিত করার স্বাধীনতা থাকলে তার অবদান কী হত এক মুহূর্তের জন্য তা কল্পনা করুন।

আমি নিশ্চিত যে, কেবলমাত্র অবিরাম কর্মে আত্মনিয়োগ করাতে পারলেই আমাদের দেশবাসী বিস্ময়কর কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। এ বিষয়েও আমি নিশ্চিত যে একবার সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হলে আমরা আজকের অগ্রগামী দেশগুলিকেও ("প্রতীচীর লুণ্ঠনকারীরা") ছাড়িয়ে যেতে পারব। আমরা যা চাই তা এক জাদুদণ্ড, যা সঞ্চালন করলে আমাদের সমগ্র জীবনে শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। ফরাসি দার্শনিক বার্গসঁ "elan vital"-এর কথা বলেছেন— অপরিহার্য উদ্যম— যা সমগ্র জগৎকে কর্ম এবং অগ্রগতির পথে পরিচালিত করে। আমাদের জাতীয় জীবনে "elan vital" কী ? তা হল স্বাধীনতার, বিস্তারের এবং আত্মপ্রকাশের বাসনা। এই বাসনারই পরিপূরক হল দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আপনারা যদি স্বাধীন হতে চান, যে-দাসত্ব আপনাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই বিদ্রোহ করতে হবে এবং দাসত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ করেন এবং সফল হন, তা হলে অবশ্যই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবেন।

যাদের নৈতিকতাবোধ একেবারে মৃত তারা ছাড়া প্রতিটি মানুষই দাসত্বের বেদনা এবং পরাধীনতার অপমান অল্পবিস্তর অনুভব করতে বাধ্য। এই অনুভূতি যখন তীব্র হয় তখন দাসত্ব এবং বন্ধন অসহ্য হয়ে ওঠে এবং দাসত্বের জোয়াল ছুড়ে ফেলে দেওয়ার বাসনা শক্তিশালী হয়। স্বাধীন দেশ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা স্বাধীনতার ফলে যে সুখী অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে পাঠ এবং কল্পনার মাধ্যমে স্বাধীনতার আনন্দের স্বাদ এই বাসনাকে তীব্রতর করে। আমাদের দেশের মুক্তির জন্য "তপস্যার" মনস্তাত্ত্বিক দিকটি নিহিত আছে আমাদের মনকে জাতীয় অবমাননা এবং বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে আরও সচেতন এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলার মধ্যে। এটা করা যেতে পারে ইতিহাস অধ্যয়ন, আমাদের বর্তমান অধঃপতন পর্যবেক্ষণ, জীবনের আদর্শ সম্পর্কে চিন্তা এবং সর্বোপরি, দাসত্বের যুগের সঙ্গে স্বাধীনতার যুগের অবস্থার তুলনা করে।

আমার কাছে সকল প্রকার "দীক্ষা"-র একটিই অর্থ— তা হল স্বাধীনতার বেদিতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করা। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ একদিনে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ক্রমে ক্রমে আরও উদ্বুদ্ধ হব, আমরা অবর্ণনীয় এক আনন্দের আস্বাদ পাব এবং আরও বেশি করে উপলব্ধি করব যে, জীবনের একটি অর্থ এবং লক্ষ্য আছে। এক বিপ্লব শুরু হবে— আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং আকাঙ্ক্ষায় এক রূপান্তর ঘটবে। আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি বস্তুরই মূল্য থাকবে— সেই বস্তুটি স্বাধীনতা। আমাদের অন্তরাত্মা এমনভাবে পরিবর্তিত হবে অথবা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবে যে সেই আদর্শের অনুরূপ হয়ে উঠবে। এই ক্রমরূপান্তরের অভিজ্ঞতা প্রায় অবর্ণনীয়। এই রূপান্তর সম্পূর্ণ হলে আমাদের পুনর্জন্ম হবে ; আমরা প্রকৃত অর্থে "দ্বিজ" হব। অতঃপর আমাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং

স্বপ্নও হবে কেবলমাত্র স্বাধীনতার এবং আমাদের সকল কর্ম কেবলমাত্র একটি আকাঙ্ক্ষায় আপ্লুত হবে— স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা। এক কথায় আমরা স্বাধীনতামত্ত মনুষ্যে পরিণত হব, যাঁরা স্বাধীনতার মধ্যে বাঁচে, চলাফেরা করে এবং কেবলমাত্র স্বাধীনতার মধ্যেই যাঁদের অস্তিত্ব।

আমাদের অন্তরে একবার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হলে তা পূর্ণ করতে যথাযথ উপায়ের প্রয়োজন হবে। এই জন্য আমাদের সমস্ত শারীরিক, নৈতিক এবং বৌদ্ধিক গুণ অধিগ্রহণ (requisition) করতে হবে। আমরা যা শিখেছি তার অনেকখানি ভুলতে হবে এবং যা আমাদের কখনও শেখানো হয়নি তা এই প্রথম শিখতে হবে। স্বাধীনতা অর্জনের যোগ্য হওয়ার জন্য আমাদের শরীর এবং মনকে অনুশীলন এবং শৃঙ্খলার এক নতুন শিক্ষাক্রম গ্রহণ করতে হবে। বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আরাম বিসর্জন দিতে হবে, জীবনের নতুন রীতি গ্রহণ এবং পুরনো অভ্যাস বর্জন করতে হবে। এইভাবেই আমাদের সমগ্র জীবন স্বাধীনতা অর্জনের এক পবিত্র মাধ্যম হয়ে উঠবে।

শত হলেও মানুষ এক সামাজিক জীব। সমাজের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার আত্মসিদ্ধি সম্ভব নয়। ব্যক্তি তার বুদ্ধি এবং বিকাশের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল, যেমন সমাজ নির্ভরশীল ব্যক্তির উপর। অধিকন্তু, ব্যক্তির অগ্রগতির বিশেষ কোনও মূল্য নেই, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিকভাবে সমাজের অগ্রগতি না হয়। যে আদর্শ নিঃসঙ্গ এক ব্যক্তি গ্রহণ করেছে কিন্তু সমাজ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেই কারণেই যা আমাদের যৌথ জীবনের অঙ্গ হয়নি, তার বিশেষ কোনও মূল্য নেই। যদি স্বাধীনতা আমাদের জীবনের প্রধান নীতি— সমস্ত কর্মের প্রাণশক্তি হয়, তা হলে একে সামাজিক পুনর্গঠনের ভিত্তিও করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাবে যে, স্বাধীনতার নীতিকে যদি সমাজে প্রয়োগ করা হয় এবং ভবিষ্যৎ সমাজের মূল ভিত্তি করা হয় তা হলে সেটা সামাজিক বিপ্লবের চেয়ে কোনও অংশে কম হবে না। সমগ্র সমাজের স্বাধীনতার অর্থ হবে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য স্বাধীনতা— কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণের জন্য নয়, অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্যও স্বাধীনতা— কেবলমাত্র ধনীর জন্য নয়, দরিদ্রের জন্যও স্বাধীনতা— কেবলমাত্র বৃদ্ধদের জন্যই নয়, যুবকদের জন্যও স্বাধীনতা— বাক্যান্তরে, সকল শ্রেণী, সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সকল ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা। এইভাবে স্বাধীনতা সমতার দ্যোতক এবং সমতার অন্তর্নিহিত অর্থ ভ্রাতৃত্ব। অতএব সমাজকে স্বাধীন করতে হলে আইনগত এবং সামাজিক বিষয়েও নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দিতে হবে ; যে সব সামাজিক প্রতিবন্ধক জন্মের কারণে কিছু শ্রেণী অথবা বর্ণের উপর হীনতার ছাপ এঁকে দেয়, সেগুলি কঠোর হস্তে ধ্বংস করতে হবে ; যে ধনবৈষম্য সামাজিক অগ্রগতির পথে অন্তরায় সেগুলি দূর করতে হবে এবং সকলকে শিক্ষা এবং বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। যৌবনকে অবশ্যই আর অপরাধরূপে গণ্য করা চলবে না এবং যুবক এবং যুবতীদের সমাজ পুনর্গঠনের এবং প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। সমাজে, রাষ্ট্রে এবং অর্থনৈতিক জগতে প্রতিটি ব্যক্তি সমান স্বাধীন হবে এবং একই মর্যাদা উপভোগ করবে। সবার জন্য সমান সুযোগ, ধনের সুষম বণ্টন, জাতিভেদসহ সকল সামাজিক বাধার অপসারণ এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি— আমরা যে নতুন সমাজ গড়তে চাই, এগুলি হবে তার মূল নীতির কয়েকটি।

বন্ধুগণ, জানি না আমার তত্ত্বকে আপনারা অবাস্তব আদর্শবাদীর তত্ত্ব বলে বিবেচনা অথবা আমাকে কল্পনাবিলাসী বলে আখ্যাত করবেন কিনা। কিন্তু আমাকে যদি স্বপ্নবিলাসী বলে অভিযুক্ত করেন সে অভিযোগ আমি মেনে নেব। আমি আমার স্বপ্নকে ভালবাসি। একটি সাধারণ লোকের কাছে বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যেমন বাস্তব, এই সব স্বপ্নও আমার কাছে তেমন বাস্তব। আমার স্বপ্ন থেকে আমি পাই অনুপ্রেরণা এবং কর্মশক্তি। এই সব স্বপ্ন ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না, কারণ তা হলে জীবন তার অর্থ এবং আকর্ষণ হারাবে। আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি তা স্বাধীন ভারতবর্ষের— সকল শক্তি এবং গৌরবে সমুজ্জ্বল ভারতবর্ষের স্বপ্ন। আমি চাই ভারত তার নিজের সংসারের কর্ত্রী এবং নিজের ভবিষ্যতের রানি হোক।

আমি চাই ভারত হোক এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, যার নিজের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী থাকবে— স্বাধীন দেশগুলির রাজধানীতে থাকবে তার নিজের রাষ্ট্রদূত। আমি চাই প্রাচী ও প্রতীচীর যা কিছু ভাল তার নিখুঁত সমন্বয়ে ভারতবর্ষ পৃথিরী সামনে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াক। আমি চাই ভারতবর্ষ নতুন এক স্বাধীনতার বাণী, এক পরিপূর্ণ এবং সার্বিক মুক্তির বাণী নিয়ে জগতের সামনে যাক।

আজকের ছাত্ররা, আপনারা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবেন, আপনারা হবেন এক স্বাধীন ভারতের উত্তরাধিকারী। আমার কিছু স্বপ্ন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাগ নিতে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনাদের দেবার মতো আমার অন্য কিছুই নেই। আমি যা দিতে চাইছি আপনারা কি তা গ্রহণ করবেন? আপনারা নিশ্চয় মহত্তম আদর্শবাদে পরিপূর্ণ। মহৎ আদর্শের আবেদন আপনাদের কাছে না পৌঁছেই পারে না, সে আদর্শ যত মহত্তর হবে তত বেশি আপনাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আপনাদের অন্তরে সুপ্ত সর্বোত্তমকে জাগ্রত করবে। সুতরাং উঠে দাঁড়ান, জেগে উঠুন। আপনাদের ছাত্রজীবন শুধুই কর্মজীবনে পেশার জন্য শিক্ষানবিশি নয়। এটা গ্রাসাচ্ছদন সংগ্রহের চেয়ে উন্নততর এবং মহত্তর কিছুর জন্য প্রস্তুতি। মানুষ শুধু উদর পূর্তি করেই বেঁচে থাকে না। যে ভবিষ্যৎ আপনাদের অপেক্ষায় আছে আপনাদের সামনে আমি তার ভাবরূপটি তুলে ধরছি। এ সেই ভবিষ্যৎ যা আপনাদের গড়ে তুলতে হবে নিজেদের ত্যাগ, যন্ত্রণাভোগ এবং শ্রম দিয়ে। আপনাদের দেহ এবং মনকে এমন প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তা আপনাদের ভবিষ্যৎ জীবনের উপযুক্ত মাধ্যম হয়ে ওঠে। আপনাদের অন্তর্জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্হিজীবনের প্রথা এবং অভ্যাসগুলিকেও সেবা এবং ত্যাগের জীবনের সঙ্গে অন্বিত করতে হবে। যে লক্ষ্য আপনাদের সামনে, তারই দিকে পরিচালিত করতে হবে আপনাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে। যে-জীবনের ইঙ্গিত আমি দিয়েছি, সে জীবনে ত্যাগ স্বীকার করতে হতে পারে, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন, সে জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ। যে পথে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি তা কণ্টকাকীর্ণ হতে পারে, কিন্তু সেটা কি অবিনশ্বর গৌরবের পথ নয়? অতএব আসুন, আমরা আনন্দে দলবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই মহান পথে এগিয়ে যাই। তবেই আমরা আমাদের ক্ষণজীবনের সার্থকতা প্রমাণ করতে পারব এবং অন্ধকার এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে, বেদনা এবং ত্যাগের ভিতর দিয়ে জীবনের চরম লক্ষ্য— পরম সুখ এবং অমরত্ব লাভ করব। বন্দেমাতরম

বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনে বিবাদ

এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিবৃতি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৯

এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আমাকে বাংলার নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদে শালিস নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই অপ্রীতিকর কাজ করতে আমি এই শর্তে রাজি হয়েছিলাম যে, আমি পূর্বনির্ধারিত কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়...ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সদস্য ডঃ সীতারামাইয়াকে, যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশনার হিসাবে নিয়োগের সুপারিশ করেন। ডঃ সীতারামাইয়া অনিচ্ছুক ছিলেন এবং অনতিকাল পরেই তিনি সভা থেকে চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন একটি কাজ সুবিধাজনকভাবে কে সম্পাদন করতে পারবেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এই প্রশ্নটি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তর উপস্থিতিতে আলোচিত হয়। অতএব শেষ পর্যন্ত এটা স্থির হয় যে, এ-কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে পুনরায় অনুরোধ করা হোক। এই বোঝাপড়ায় পৌঁছবার পরে শ্রীযুক্ত

সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা রওনা হন। আমি ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে সম্মত করাতে রাজি হই। তদনুযায়ী আমি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে তার পাঠাই যে, আমার হয়ে তদন্তের কাজ করতে আমি ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়কে নিযুক্ত করেছি।

...ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করবে এই প্রত্যাশায় আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, বর্তমান বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত গত বছর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বাংলা থেকে যে সব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা স্বপদে বহাল থাকবেন।

...শ্রীযুক্ত জে. সি. গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত এস. কে. মিত্র যে সব আপত্তি তুলেছেন এবার আমি সেই প্রসঙ্গে আসছি। তাঁদের প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁরা কমিশনারের কাছে তাঁদের সমস্ত প্রমাণ দাখিল করেছিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ বিলম্বকারী কৌশল অবলম্বন করে বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি বিলম্বিত করতে সফল হয়েছে। যাই হোক, শ্রীযুক্ত গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত মিত্র যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমার সামনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য পেশ করতে আর একটি সুযোগ দেবার সময় আছে এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের শীঘ্র ডেকে পাঠাবার জন্য আমাকে চাপ দিয়েছেন...গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শূন্য পদ পূর্ণ করা ছাড়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আর কিছুই করণীয় নেই। প্রতিনিধি নির্বাচন করবে জেলা কমিটিগুলি...ফলে আমি তদন্ত স্থগিত রাখছি।

সুভাষচন্দ্র বসুর বিবৃতি

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিবৃতিতে আমি বিস্মিত এবং বেদনাহত হয়েছি। ভয় হচ্ছে আমি চুপ করে থাকলে পাছে জনসাধারণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, তাই আমাকে তাঁর বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত কিছু মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।

বাংলার বিবাদ সম্পর্কে তদন্তের দায়িত্ব কে নেবেন সে সম্পর্কে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এক এক করে কয়েকটি নাম প্রস্তাব করা হয়। যখন ডঃ পট্টভির নাম প্রস্তাব করা হয়, তখন তিনি নিজেই এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, বাংলার বিবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য তদন্তের দায়িত্ব বিখ্যাত কোনও ব্যক্তির গ্রহণ করা উচিত। অতঃপর তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয় এবং আমরা অন্যান্য নাম নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। অন্যান্যদের মধ্যে আমরা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নাম আলোচনা করি, কিন্তু আমাদের জানানো হয় যে, পণ্ডিত মালব্য এলাহাবাদে নেই। শেষ পর্যন্ত আমরা একমত হই যে, সভাপতির নিজেরই দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত।

কমিশনার নিযুক্ত করার প্রশ্ন এলাহাবাদে কখনও আলোচিত হয়নি। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতিই স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এ-বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত করার পরেই আমরা সবাই এলাহাবাদ পরিত্যাগ করি। 'ডঃ পট্টভি বিবাদের তদন্ত করতে আসছেন'—কলকাতায় ফিরে পণ্ডিতজির এই তার পেয়ে আমি বিস্মিত হই। ডঃ পট্টভিকে কী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার থেকে আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। আমি অবিলম্বে ডঃ পট্টভির নিয়োগে বিস্ময় প্রকাশ করে পণ্ডিতজিকে তার পাঠাই। উত্তরে পণ্ডিতজি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে এবং ডঃ পট্টভিকে কমিশনার রূপে পাঠানো হচ্ছে কেবলমাত্র তদন্ত করতে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করতে। আমি যা পবিত্র বলে জ্ঞান করি তার নামে শপথ নিয়ে বলছি—কমিশনার হিসাবে ডঃ পট্টভির নিয়োগের সঙ্গে আমার কখনও কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং কলকাতায় ফিরে পণ্ডিতজির তারেই আমি প্রথম এই নিয়োগের কথা জানতে পারি। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁর বিবৃতিতে নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর

তারে ডঃ পট্টভির নিয়োগের কথা অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ময় প্রকাশ করে আমি তাঁকে তার পাঠাই। এই নিয়োগে আমার সম্মতি থাকলে আমি বিস্ময় প্রকাশ করব কেন ?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্রের একতরফা বক্তব্য শুনে এবং ডঃ পট্টভির একতরফা রিপোর্ট বিবেচনা করে তাঁর বিবৃতিতে অন্যান্য মন্তব্য করা উপযুক্ত মনে করেছেন। রায় দেবার আগে তাঁকে আমাদের বক্তব্য শুনতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁর বিবৃতি প্রকাশের আগে তাঁর কাছে আমাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ আমরা পাইনি। আমি নিশ্চিত যে, পণ্ডিতজি শ্রীযুক্ত গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত মিত্রের বক্তব্য শুনেছিলেন। মন স্থির করার আগে তেমনই যদি আমাদের বক্তব্য তিনি শুনতেন, তা হলে এই বিবৃতি আদৌ প্রকাশিত হত না অথবা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হত। 'ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তদন্ত স্থগিত রেখেছেন'—লখনউ থেকে এই মর্মে আমাদের কাছে তার পাঠাবার পরে কী কারণে তাঁকে আমাদের অনুপস্থিতিতে ডঃ পট্টভির "একতরফা" রিপোর্ট এবং আমাদের প্রতিপক্ষ শ্রীযুক্ত গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত মিত্রের "একতরফা" বিবৃতি মেনে নিতে হল ?

বিবাদের মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বাংলা থেকে নির্বাচিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পুরনো সদস্যরা কাজ করে যাবেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির এই নির্দেশও আমাকে বিস্মিত করেছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নবনির্বাচিত কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকেও আমি প্রতিবাদ পেয়েছি। মধ্যপ্রদেশের (মারাঠি) নজিরের সঙ্গেও বাংলার অবস্থা তুলনীয় নয়, কারণ, পণ্ডিতজি যেমন তাঁর বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন, মধ্যপ্রদেশে (মারাঠি) নির্বাচন হয়নি ; আর সেখানে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিয়ম অনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন হয়েছে। পণ্ডিতজি হয়তো স্মরণ করতে পারবেন যে, আমাকে তিনি তারে এই কথা বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে কাজকর্ম থেকে নিরস্ত করা যাবে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বৈধ কর্তব্য পালন করে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচন করেছে। এই সদস্যদের কর্ম সম্পাদনে বাধা দেওয়া যাবে কীভাবে ?

বর্তমান বিবাদ সম্পর্কে আমার অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু এ-কাজ আমি পরবর্তী পর্যায়ে করব। এখানে আমি শুধু এইটুকু বলব যে, তদন্ত শুরু করার আগে ডঃ পট্টভি আপস মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন এ-কথা সত্য নয়, এবং পণ্ডিতজিকে এই সংবাদ কে দিয়েছেন আমি তা জানি না। বাংলার কুড়িটি জেলার হয়ে কথা বলার অধিকার শ্রীযুক্ত যোগেশ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্রকে কে দিয়েছে আমি তাও জানি না। কার্যত, আমরা এ-পর্যন্ত বাংলার প্রতিটি জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তালিকা পেয়েছি, এবং দূরত্বের জন্য অনেক প্রতিনিধি লাহোর যেতে না পারলেও, লাহোর কংগ্রেসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব যথেষ্টই থাকবে।

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রচারিত বিবৃতি, ২০ ডিসেম্বর ১৯২৯

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, ছ' মাস ধরে যশোহর জেলার বান্দাবিল্লা ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। প্রথমে বান্দাবিল্লা কংগ্রেস কমিটি এই আন্দোলন শুরু করে এবং সেই কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র রায় এ-ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন। গত জুলাই মাসে যখন যশোহরে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন হয়, তখন বান্দাবিল্লার পরিস্থিতি

আলোচিত হয় এবং এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে। তখন থেকে যশোহরের প্রখ্যাত নেতারা এই আন্দোলনে নিজেদের আগ্রহী করে তুলেছেন।

যশোহর কংগ্রেস কমিটি এবং বান্দাবিল্লার স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকেও আমাদের কাছে এই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ আসে। তার ফলে পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট পেশের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি কমিটি নিযুক্ত করে। কমিটি অঞ্চলটি পরিদর্শন করে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুকূলে রিপোর্ট দেয়। তার পরে আমি যশোহর এবং বান্দাবিল্লা পরিদর্শন করি এবং আমার এই ধারণা হয় যে, আমাদের হাতে আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। আজ বিকেলে (২০ ডিসেম্বর) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনিবহী পরিষদের সভা হয় এবং উপরে বর্ণিত তথ্যসমূহ এবং বান্দাবিল্লা এবং যশোহরেরও অবস্থা বিবেচনা করে আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

১৯১৯ সালের বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী সরকার যে-কোনও জেলায় অথবা জেলার যে-কোনও অংশে নিজের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করতে পারে। অতীতে যেখানে জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধিতা করেছে, সেখান থেকে ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নেওয়া হয়েছে। লোকে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরোধী কেন তার বিভিন্ন কারণ আছে, কিন্তু এই সব কারণের মধ্যে প্রধান হল ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের পরে কর বৃদ্ধি—ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের পরে যশোহরে যা হয়েছে। বান্দাবিল্লা ইউনিয়নে জনগণ ইউনিয়ন বোর্ড কর দিতে অস্বীকার করেছে এবং কর-বন্ধ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলছে। সরকার এক কঠোর উৎপীড়নের নীতি গ্রহণ করেছে এবং আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মীসহ অনেক গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। যাঁরা কর দেননি তাঁদের সকলের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হচ্ছে এবং কখনও কখনও গোপনে নিলাম করা হচ্ছে। চল্লিশ, পঞ্চাশ এবং ষাট টাকা মূল্যের গরু নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও গ্রামবাসীরা নির্ভীক, এবং সফল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সকল মতভেদ ভুলে এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য সাহায্য করতে আমি জনগণ এবং সকল দলের কাছে আন্তরিকভাবে আবেদন করছি।

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য

মেদিনীপুর যুব সম্মেলনে ভাষণ, ২১ ডিসেম্বর ১৯২৯

আজ আপনারা মেদিনীপুর যুব সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাকে সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমিও সানন্দে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু আপনারা যখন এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করছিলেন, তখন কি আপনাদের মনে হয়েছিল কেন আপনারা রাজনৈতিক সম্মেলনের বদলে যুব সম্মেলন আহ্বান করছেন ? দেশে অথবা বিদেশে প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের অভাব নেই। কারণ খুঁজতে বেশি দূরে যেতে হবে না। সকল দেশের যুবকরা অধীর এবং অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন। তাঁরা যা চান তা পান না। বাস্তব জীবনের মধ্যে তাঁরা তাঁদের লালিত আদর্শকে দেখতে পান না। অতএব তাঁরা বিদ্রোহী হয়েছেন এবং যে-সব মানুষ এবং ব্যবস্থা তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে-সব সরিয়ে ফেলতে তাঁরা দৃঢ়সঙ্কল্প।

আজকাল অনেকেই যুব সমিতি সংগঠনের কাজে নিযুক্ত। কিন্তু অল্প লোকই যুব আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য এবং কর্মসূচি বোঝেন। যুব সমিতিগুলিকে সামাজিক সঙ্ঘের অনুরূপ বলে ভাবলে চলবে না। যুব সমিতিগুলি ভিন্ন নামে এবং পরিচয়ে কংগ্রেস কমিটিও নয়। বস্তুত, যুব আন্দোলন নিজস্ব আদর্শ এবং কর্মসূচি সম্বলিত সম্পূর্ণ পৃথক এক আন্দোলন। অতএব যাঁরা কংগ্রেসে নেতার ভূমিকা পেতে ব্যর্থ হয়ে যুব আন্দোলনে সেই ভূমিকা গ্রহণ করতে চান, তাঁদের দিয়ে যুব আন্দোলনে কোনও কাজ হবে না।

একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে দেখুন আন্দোলনে কতজন আন্তরিক কর্মী আছেন। শুরুতে আমি আরও একবার নিশ্চয় করে বলছি যে, যুব সমিতি কংগ্রেস অথবা সমাজসেবা সংঘের সম্প্রসারিত অংশ নয়। যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য নতুনের সন্ধান ; এক নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র এবং নতুন রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিষ্ঠা ; মানুষকে এক নতুন এবং মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাঁদের পথ দেখিয়ে উন্নততর স্থানে নিয়ে যাওয়া। যিনি এই নতুন এবং মহত্তর জীবন অর্জনের জ্বলন্ত বাসনা পোষণ করেন, তিনি বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করেই পারেন না।

মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য জানতে চায়, জানতে চায় সে কেন জীবনধারণ করে এবং কোথায় আছে তার আত্মসিদ্ধি। এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত জীবন তার কাছে বোঝা হয়ে ওঠে এবং তার কর্মক্ষমতা সুপ্ত থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর সবাই দিতে পারে না। যে-ব্যক্তি নিজে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সমর্থ হয়নি, সে অন্যকে সাহায্য করবে কীভাবে ? পক্ষান্তরে, স্বপ্ন অনেকেই লালন করে। আমাদের প্রয়াত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন ছিল তাঁর সকল কর্মশক্তি এবং আনন্দের উৎস। আমরা সেই স্বপ্নের উত্তরাধিকারী। আমাদের সকল কর্ম সেই স্বপ্নের ছাঁচে ঢালা। কী সেই স্বপ্ন বা আদর্শ ? আমি যা চাই তা হল সার্বিক স্বাধীনতা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ। আমি এমন এক সমাজ চাই যেখানে ব্যক্তি প্রবল বাধানিষেধের ভারে পীড়িত হবে না, যে-সমাজে জাতিভেদ প্রথার কোনও স্থান হবে না, যে-সমাজে নারী স্বাধীন হবে, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে এবং নিজে সকল নাগরিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে ; যে-সমাজ সকল বর্ণবৈষম্যরহিত হবে এবং যে-সমাজে সকলে শিক্ষা এবং বিকাশের সমান সুযোগ পাবে। আমি সকল প্রকার বিদেশী আধিপত্যবর্জিত এক রাষ্ট্র চাই, যে-রাষ্ট্র আমাদের সমাজের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। সর্বোপরি, আমি এমন এক সমাজ এবং এমন এক রাষ্ট্র চাই যা কেবলমাত্র ভারতীয়দের সব অভাবই দূর করবে না, স্বাধীন জগতের কাছে এক আদর্শরূপেও কাজ করবে। আমি এই সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখি। আমার তরুণ বন্ধুগণ, এই স্বপ্ন ছাড়া আপনাদের দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই। যে-স্বপ্ন আমাকে সীমাহীন কর্মশক্তি এবং আনন্দ সরবরাহ করেছে এবং যে-স্বপ্নের ভিতরে আমার জীবন আত্মসিদ্ধি লাভ করেছে, সেই স্বপ্ন আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি।

নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে সাম্যের ভিত্তির উপরে। জাতিভেদপ্রথা দূর করতে হবে। নারীকে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে তাকে পুরুষের সমান অধিকার এবং দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। বর্ণবৈষম্য দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এবং জাতি, ধর্ম এবং বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষা এবং আত্মোপলব্ধির সমান সুযোগ দিতে হবে।

সংক্ষেপে, ভারতবর্ষের জন্য আমি পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। এই স্বাধীন ভারতবর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করবে, তারা বিশ্বের সকল জাতির কাছে মানুষের সম্মান পাবে। দর্শনে এবং বিজ্ঞানে, ধর্মে এবং কর্মে, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষ আবার সকল দেশের চেয়ে উন্নত হয়ে উঠবে। আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আর বিস্তারিতভাবে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমরা নতুন ভারতবর্ষের স্রষ্টা। আসুন, আমাদের উপর ন্যস্ত এই পবিত্র এবং বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনের জন্য আমরা হাতে হাত মেলাই।

সমান্তরাল সরকার এবং পূর্ণ বর্জন

১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় বিরোধী প্রস্তাব

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে উঠে দাঁড়িয়েছি এই কারণে যে, এটি এমন কর্মসূচি নয় যা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আমার সংশোধন এক সম্পূর্ণ, সমগ্র এবং কার্যে রূপায়িত করার মতো কর্মসূচি। আমার কর্মসূচির দুটি স্বতন্ত্র অংশ আছে—গঠনাত্মক এবং সেই সঙ্গে ধ্বংসাত্মক। মানুষের শুভেচ্ছার ভিত্তির উপর এক সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আমরা কী করে লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি তা আমি বুঝতে অক্ষম। আয়ার্ল্যান্ডের সিনফিনারদের দৃষ্টান্ত উন্মাদনার একটি দৃষ্টান্ত। তার মানে এই নয় যে, আমি চাই জনগণ তাঁদের আন্দোলনে আয়ার্ল্যান্ডের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করুক। কিন্তু এটা দেখাতে চাই যে, সমান্তরাল সরকারের পরিকল্পনা কেবলমাত্র লক্ষ্য অর্জনের একটি পরিকল্পনা।

আমার বিশ্বাস আমরা যদি কর্মসূচিকে পুরুষোচিত এবং সংগ্রামী করি, তা হলে যাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের অনেককে নিয়ে আসতে সফল হব। আমি কৃষক, শ্রমিক এবং তরুণদের কথা বলছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সব সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অভিযোগ আছে এবং সেই হেতু তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কংগ্রেসের উচিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করা এবং কেবল রাজনৈতিক অভিযোগ দূর করেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। আমাদের উচিত তাঁদের আমাদের ভিতরে টেনে এনে তাঁদের শক্তি এবং সম্পদকে সংহত করা। কংগ্রেস যদি উৎপীড়িত শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করতে না পারে তবে কীভাবে তার রাজনৈতিক কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে জানি না।

বর্জনকে যদি ফলপ্রসূ, বোধগম্য এবং কার্যকর করতে হয়, আমাদের লক্ষ্য অর্জনের আগে এক পূর্ণ বর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আংশিক বর্জনের কোনও প্রয়োজনীয়তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আদালতে ওকালতি করা স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কলকাতা কর্পোরেশনের মতো সংস্থায় প্রবেশের সময় আনুগত্যের শপথ গ্রহণও তা-ই। আমাদের সমস্ত শক্তি কর্মে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। আমার নীতি হল—সমস্ত অথবা কিছুই না। অতএব আবার যদি বর্জন শুরু করতে হয়, তবে অবশ্যই তা হবে পূর্ণ। অন্যথায় আদালত এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় প্রবেশ করে পরিষদ (Council) বর্জন হবে অর্থহীন। রাজনীতিতে কখনও কখনও পরিস্থিতির প্রয়োজনের কাছে মাথা নত করতে হয়, যেমন সিনফিনাররা করেছিল এবং আনুগত্যের শপথ নিয়ে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেছিল। সেখানে বসে কমিউনিস্টরাও তা-ই করেছিল। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় যাওয়া স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, আমার মতে এই অবস্থায় পূর্ণ বর্জন অত্যাবশ্যক।

শেষ করার আগে মহাত্মা গান্ধীর পেশ-করা প্রস্তাব সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি বলতে চাই যে, দিল্লির ঘোষণাপত্রে আমার সম্মতি ছিল না এবং আজ ৩১ ডিসেম্বর আমরা যে-অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় এটি কেউ অনুমোদন করুক আমি তা চাই না। আপনারা কি দিল্লির ঘোষণাপত্র অনুমোদন করতে প্রস্তুত? আপনারা কি দিল্লির ভাইসরয়ের তারিফ করবেন? গোলটেবিল বৈঠক এক ধোঁকা। আপনারা কি বিবেকের সায় নিয়ে ভূমিকাটি অনুমোদন করতে পারবেন? মহাত্মা গান্ধী অনুগ্রহ করে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, নিজের দিক থেকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার কোনও ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এই অংশটি রাখার প্রয়োজন আছে কি না এখন তা এই সভার

বিচার্য।

এবার আমি 'গোলটেবিল বৈঠক' এই বাক্যাংশটির উল্লেখ করছি। জানি না আমাদের দেশের লোক একে গোলটেবিল বৈঠক বলতে ব্যগ্র কেন। এটা অবশ্যই "গোলটেবিল" নয়। আমার মতে এটা চতুষ্কোণ টেবিল বৈঠক। গোলটেবিল বৈঠক এমন এক বৈঠক, যা অনুষ্ঠিত হয় পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত দুই শক্তির মধ্যে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে। এবং সেই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয়ের নিকটই অবশ্যপালনীয়। আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি—আপনারা কি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যে, ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সমানাধিকারের ভিত্তিতে আলোচনা করতে ভারতবর্ষের লোকদের তাঁদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের পাঠাবার অনুমতি দেওয়া হবে ? আপনারা কি নিশ্চিত যে, এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবে ? আপনারা সবাই জানেন যে, সন্ধির শর্ত যখন প্রস্তুত হয়, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে সন্ধিপত্র প্রস্তুতের সময়েও, বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষই অলঙ্ঘনীয় মনে করে। আমি জানি, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে বৈঠকে যে সংবিধান প্রস্তুত করা হয়, ব্যাকরণগত ভুল সত্ত্বেও পার্লামেন্টে তা অনুমোদিত হয়। ব্রিটিশ রাজনীতিকরা ব্যাকরণের ভুলও সংশোধন করতে পারেননি। এটাই প্রকৃত গোলটেবিল বৈঠক। কিন্তু এখানে ব্যবস্থাদি কী রকম ? শুনতে পাচ্ছি, সামন্ত রাজারা এবং ইউরোপিয় বণিকসভাগুলি তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাবেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে সামন্ত রাজাদের অথবা ব্রিটিশ বণিকসভাগুলির কোনও যুদ্ধ চলছে কি ? ওখানে ইংরেজ জাতি রয়েছে। রাজভক্তদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের কোনও যুদ্ধ চলছে কি ? তা হলে এরা গোলটেবিল বৈঠকে এদের প্রতিনিধি পাঠাবে কেন ?

কিন্তু আমাদের দেশের লোক যেহেতু একে গোলটেবিল বৈঠক বলছে, দেখা যাক ব্রিটিশরা একে কী বলে।

ব্রিটিশ রাজনীতিকরা তাদের বক্তৃতায়, যুক্তিসঙ্গত কারণেই, একে গোলটেবিল বৈঠক বলেন না। সভাপতি মহাশয়, আমার বক্তব্য শেষ করেছি। আমি প্রশ্ন করছি, বিগত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচি কি স্বাধীনতা আনার পক্ষে যথেষ্ট ? আমার মতে যথেষ্ট নয়। সন্দেহ নেই কর্মসূচিতে আইন অমান্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি বলছি যে, এই কর্মসূচি দ্বারা কখনও আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠন করা সম্ভব নয়। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, যুবক, কৃষক, শ্রমিক এবং অন্যান্য উৎপীড়িত শ্রেণীদের সংগঠিত না করলে আইন অমান্য চিরদিনই মরীচিকা থেকে যাবে। অতএব আপনারা যদি প্রস্তাবটিকে কার্যকর করতে চান, আমি অনুরোধ করব আপনারা কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন করুন। এমন কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং ছাত্র, যুবক, কৃষক এবং শ্রমিকরা যাকে স্বাগত জানাবে।

গত বছর কলকাতা কংগ্রেসে আমরা নীতির পরিবর্তন করে তাকে স্বাধীনতা করতে চেয়েছিলাম। সেটা স্থগিত রাখা হয়েছিল। আমার ধারণা আমরা এক বছর অপেক্ষা করেছি। আমি অনুনয় করছি নীতির পরিবর্তন না করে আপনাদের কী লাভ হয়েছে বিবেচনা করে দেখুন। একটা বছর নষ্ট হয়েছে। এই সংশোধন যদি গৃহীত না হয়, ঈশ্বরের অভিপ্রেত হলে অদূর ভবিষ্যতেই এটা গৃহীত হবে, সম্ভবত আগামী বছর।

মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব দেশের যুবসমাজের পছন্দ হবে না। অতএব আমি মহাত্মা গান্ধী এবং শ্রদ্ধেয় নেতাদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন দেশের অবস্থা এবং যে-আবেগ যুব সম্প্রদায়ের হৃদয়কে আলোড়িত করে তার কথা বিবেচনা করেন। আসন গ্রহণ করার আগে দেশের সামনে এই লক্ষ্যকে নিয়ে আসার জন্য আমি আবারও মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পূর্ণ বর্জনের কর্মসূচি

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ভাষণ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯২৯

আমার বক্তব্য উপস্থিত করার আগে 'স্বরাজের অর্থপূর্ণ স্বাধীনতা' এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করার জন্য এই সুযোগে আমি মহাত্মা গান্ধীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই। কিন্তু আমি এই সংশোধন-প্রস্তাব আনতে চাই এই কারণে যে, তাঁর প্রস্তাবে যে-কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে তা এমন নয় যা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে। আমার সংশোধন-প্রস্তাব লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সময়ের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমার সন্দেহ নেই যে, আজ না হলেও আগামী কংগ্রেসে এই সংশোধন-প্রস্তাব তরুণতর প্রজন্মের আনুকূল্য লাভ করবে।

আমার কর্মসূচি সার্বিক বর্জনের। বর্জনের কর্মসূচির একটি দফা গ্রহণ করে অন্যগুলি পরিত্যাগ করলে কোনও কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। আদালতে ওকালতি করা আমাদের স্বাধীনতার নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় যোগ দেওয়াও সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। এই রকম কিছু সংস্থায়, যেমন কলকাতা কর্পোরেশন, ঢুকতে গেলে আনুগত্যের শপথ নিতে হয়। আরও একটি কারণ আছে যার জন্য এই সমস্তই বর্জন করা উচিত। আমাদের সামনে যে-কর্তব্য তা এত কঠিন এবং আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত দায়িত্ব এত বিরাট যে, আমাদের সমগ্র সময় এবং শক্তি কর্মসূচিতে নিয়োজিত করতে হবে। এখন আমি বলতে চাই যে, আপনারা যদি পূর্ণ বর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ না করেন তবে কেবলমাত্র পরিষদ বর্জন করে কোনও কাজ হবে না।

আমাদের কাজ যেন সঙ্গতিপূর্ণ হয়। হয় সব কিছু বর্জন করুন, নয় কিছুই বর্জন করবেন না। আমি চরমপন্থী এবং আমার নীতি হল—সব অথবা কিছুই নয়। আমি যদি স্থানীয় স্বয়ংশাসিত সংস্থা দখলের নীতি সমর্থন করি, তা হলে প্রতিটি স্বশাসিত সংস্থাই দখল করতে চাইব। বর্জন যদি আদৌ করতে হয় তবে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে অন্য কোনও কর্মসূচিতে আমার মনোযোগ এবং শক্তি সংহত করব না কেন ? অতএব আমি আমার সংশোধন-প্রস্তাব গ্রহণের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করব। আমি জানি ভারতের জনমতের কাছে আজ এর প্রয়োজন আছে।

এবার মহাত্মাজির প্রস্তাব সম্পর্কে দু-একটি কথা। মুখবন্ধে দিল্লির ঘোষণাপত্রের সমর্থনে ওয়ার্কিং কমিটির কাজকে আপনাদের অনুমোদন করতে বলা হয়েছে। আমি কাউকে এই কাজ করতে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত নই। পুনশ্চ, আপনারা কি গোলটেবিল বৈঠকের উল্লেখ গ্রহণ করতে প্রস্তুত ? আমি একে গোলটেবিল বলব না। এটা অবশ্যই গোল না। আমি একে বলব চতুষ্কোণ। গোলটেবিল বৈঠক যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে বৈঠক, বিরোধী দুই পক্ষের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক। আপনাদের আমি জিজ্ঞাসা করছি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ভারতবর্ষকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে তার কোনও প্রতিনিধিকে পাঠাবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কি ? আমাদের কি এ-বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষই অনুমোদন করবে ? আমরা কি নিশ্চিত যে, বৈঠকের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য যাবে না ?

আপনারা জানেন যে, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে যখন সন্ধিপত্র রচিত হয়, তখন বৈঠকে গৃহীত উভয় পক্ষের সিদ্ধান্তগুলি উভয়ের কাছেই অলঙ্ঘনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, বৈঠকে দক্ষিণ আফ্রিকার যে-শাসনতন্ত্র রচিত হয়, ব্যাকরণগত ভুল থাকা সত্ত্বেও, ব্রিটিশ সরকারকে তা অনুমোদন করতে হয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই সব ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করতে পারেনি। একেই বলে গোলটেবিল বৈঠক। ভারতবর্ষের কাছে যে-বৈঠকের প্রস্তাব করা হয়েছে তার চরিত্র কী ? সাইমন কমিশন এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি এতে থাকবে এবং বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি পার্লামেন্টে যাবে।

কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জনগণই বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাবেন না, ইউরোপীয় বণিকসভা এবং দেশীয় নৃপতিরাও প্রতিনিধি পাঠাবেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকসভা এবং দেশীয় নৃপতিদের কি কোনও যুদ্ধ চলছে ? এমন কোনও যুদ্ধের কথা আমি জানি না। এই সব সংস্থা যখন বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে, আমি বলছি এটা গোলটেবিল বৈঠক নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশের লোকেরা একে তা-ই বলতে জিদ করছে এবং ব্রিটিশরাও একে গোলটেবিল বৈঠক নয় বলতে একই রকম জিদ করছে।

আর একটি যুক্তি পেশ করলেই আমার বক্তব্য শেষ। প্রস্তাবে গঠনমূলক কর্মসূচির উল্লেখ আছে, যার দ্বারা আমাদের ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস যে-গঠনমূলক কর্মসূচি অনুসরণ করছে, তা কি এমন কিছু যা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ? সভাকে আমি এটা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করব। সন্দেহ নেই প্রস্তাবে আইন অমান্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি বলছি যত দিন আমরা শ্রমিক, কৃষক এবং অনুন্নত শ্রেণীকে তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলি মনে রেখে সংগঠিত করতে না পারব, তত দিন আইন অমান্য কখনও বাস্তব হয়ে উঠবে না। আমার কর্মসূচি গৃহীত হলে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে। প্রস্তাবের সমর্থকদের কাছে আমার আবেদন : তাঁরা যেন পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং জনগণের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কথা অনুধাবন করেন এবং আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

পূর্ণ বর্জন

এক সাক্ষাৎকারের সময় প্রদত্ত বিবৃতি, ২ জানুয়ারি ১৯৩০

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের গতকালের কার্যবিবরণী থেকে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর কলকাতায় আমরা স্বাধীনতার নীতি গ্রহণের জন্য চাপ দিয়েছিলাম। সন্দেহ নেই আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। এমন কি তখনও আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমাদের নৈতিক জয় হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং অন্যান্য নেতাদের প্রভাবে কলকাতায় যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এখন লাহোর কংগ্রেসে তা গৃহীত হয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, গান্ধীই স্বয়ং স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রস্তাবটি পেশ করেছেন এবং পণ্ডিত মতিলাল তা সমর্থন করেছেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নটি বারো মাস মুলতুবি রেখে আমাদের কী লাভ হয়েছে এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি বিশ্বাস করি যে, আমরা যদি কলকাতা কংগ্রেসে এই নীতি গ্রহণ করতাম, তা হলে কার্যত আমাদের যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে গত বারো মাসে তার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগতি হত।

এই প্রস্তাব পেশের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে উল্লেখ করতে হয়েছিল যে, সেই প্রস্তাবে তিনি যে-কর্মসূচি রচনা করেছিলেন তা কালের চেতনা এবং আজকের তরুণতর প্রজন্মের মানসিকতা এবং ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আমার মতে কর্মসূচিটি স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে কার্যকরও ছিল না। আমার সংশোধন-প্রস্তাব গৃহীত হয়নি বলে আমি দুঃখিত হইনি, যেমন হইনি কলকাতা কংগ্রেসে আমার সংশোধন-প্রস্তাব পরাজিত হলে। আগামী বারো মাসের মধ্যে দেশকে আমার সংশোধনের মূল্য বিবেচনা করতে হবে এবং আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই যে, আগামী কংগ্রেস আমার প্রস্তাব, অথবা প্রায় অনুরূপ একটি প্রস্তাব, গ্রহণ করবে। কিন্তু আমার একমাত্র আপসোস এই যে, তত দিনে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। তবে এর কোনও প্রতিকার নেই, কারণ রাজনৈতিক শিক্ষার

গতি কখনও কখনও মন্থর, বিশেষত যখন সমস্ত প্রখ্যাত নেতার প্রভাব কার্যত এর বিরুদ্ধে সক্রিয়।

বর্জনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমার মতামত আরও একবার পরিষ্কার করে বলতে চাই। কাল প্রকাশ্য কংগ্রেসে যেমন বলেছি—শুধুমাত্র আইনসভা বর্জন হবে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। কংগ্রেস যখন স্বরাজের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তখন যাঁরা আঘাত পেয়েছিলেন, আমি তাঁদের অহমিকাকে তৃপ্ত করতে পারি, কিন্তু ওই পর্যন্তই। দেখে বিস্মিত হলাম যে, এক কালের তিন দফা বর্জনের সমর্থকরা আমার সমর্থিত পূর্ণ বর্জন গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। দুটি কারণে আইনসভা এবং অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান বর্জন সমর্থন করা যেতে পারে। প্রথমত, একই সময়ে স্বাধীনতার নীতি গ্রহণ এবং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কঠোর নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এই সকল প্রতিষ্ঠান বর্জন করলে আমাদের সমস্ত সময় এবং শক্তিকে সমান্তরাল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অন্য কোনও কর্মসূচিতে নিবদ্ধ করতে সমর্থ হব।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটাই আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল যে, হয় এই সব সংস্থাকে সার্বিকভাবে বর্জন করতে হবে অথবা যেমন আছে সেই অবস্থায় রেখে দিতে হবে। আইনসভার ভিতরে থেকে আইন প্রণয়নে সাহায্য করা অন্যায়। আদালতের ভিতরে থেকে আইন পরিচালনায় সাহায্য করাও সমান অন্যায় এবং আইনসভার ভিতরে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ অন্যায় হলে স্বশাসিত সংস্থায় সেই শপথ গ্রহণও সমান অন্যায়। যাই হোক, যেহেতু কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে, এখন আর এর দোষ-গুণ বিচার করে লাভ নেই।

আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে স্বাধীনতার জন্য দেশের সর্বত্র প্রচণ্ড এক আন্দোলন চালানো। এই আন্দোলন এক নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এবং এক নতুন মানসিকতা নিয়ে আমরা এক নতুন কর্মসূচি গ্রহণে সমর্থ হব—যে-কর্মসূচি কংগ্রেস আজ নাকচ করেছে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র বাস্তব-পন্থা যুবক, শ্রমিক এবং সমাজের উৎপীড়িত শ্রেণীকে সংগঠিত করা, তাঁদের উচিত আর সময় নষ্ট না করে নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে নিজেদের পথে এগিয়ে যাওয়া। শীঘ্রই এমন দিন আসবে, যে দিন কংগ্রেস নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করবে এবং এক সংগ্রামী এবং ফলপ্রসূ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কংগ্রেস যদি এ-কাজ করতে ব্যর্থ হয়, আমার সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য সংগঠন কর্মক্ষেত্রে আসবে এবং এ-দেশের জনগণের মুখপাত্র হবে।

অসাংবিধানিক রায়

"ফ্রি প্রেস"-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত বিবৃতি, ৭ জানুয়ারি ১৯৩০

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম দিনের সভায় (অর্থাৎ ২৭ ডিসেম্বর) ওয়ার্কিং কমিটির যে-সিদ্ধান্ত দ্বারা বাংলার নবনির্বাচিত সদস্যদের কাজে বাধা আরোপ করা হয়, আমি তার বিরুদ্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে আবেদন করতে চেয়েছিলাম। আমার যুক্তি ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বিধিমতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচন করেছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যান্য প্রত্যেকটি কাজ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তালিকায় দেখানো শূন্য স্থান পূর্ণ করা সমেত, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বৈধরূপে গ্রহণ করেছে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা কেন অনুরূপভাবে বৈধ সদস্যরূপে গৃহীত হবেন না আমি তার কোনও

কারণ দেখতে পাইনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিকার এবং মর্যাদার রক্ষক হিসাবে নবনির্বাচিত সদস্যদের হয়ে আমাকে লড়তে হয়েছে। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য চাপ দিতে আমাদের দল যে-সমস্ত প্রস্তাব (সভা মুলতুবির প্রস্তাবসহ) পেশ করে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মতিলাল নেহরু যখন তার প্রত্যেকটিই অবৈধ বলে ঘোষণা করেন, তখন প্রতিবাদে সভা পরিত্যাগ করা ছাড়া আমাদের কোনও বিকল্প পন্থা ছিল না। আমার অবস্থায় বিন্দুমাত্র সম্মানবোধসম্পন্ন যে-কোনও ব্যক্তি একই কাজ করতেন। নবনির্বাচিত বৈধ সদস্যদের বাদ দিয়ে বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাজে যোগ দেওয়া ছিল সম্পূর্ণরূপে অকল্পনীয়। আমাদের সভা পরিত্যাগে ফল হয়েছিল এবং পরের দিন, ডঃ বি সি রায়কে ধন্যবাদ, এক আপস হয় এবং মিঃ জে এম সেনগুপ্তর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটি এবং বিষয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যরা নবনির্বাচিত সদস্যদের স্বীকার করে নিতে রাজি হলেন। অতঃপর আমরা সদলে সভায় প্রবেশ করি।

শেষ দিন (অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ১৯৩০) আবার প্রতিবাদে আমাদের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি পরিত্যাগ করতে হয়। এবার ছিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নতুন সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ। যখন সভায় আসি তখন আমাদের কেউ জানত না যে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার আমাদের সভা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। আমার ধারণা শ্রীযুক্ত জে এম সেনগুপ্ত এই ইঙ্গিত করেছেন যে, আমাদের সভা পরিত্যাগ করাটা নতুন এক দল গঠনের অজুহাত। তিনি এ-কাজ করেছেন বলে আমি দুঃখিত এবং আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, অন্যের উপর উদ্দেশ্য আরোপ করে তিনি সমস্ত ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ লোকের চোখে নিজেকে হেয় করেছেন। সত্য এই যে, ১ জানুয়ারি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা প্রবাদের সেই শেষ কুটোটি। কংগ্রেস অধিবেশনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সভাপতি আমাদের দলের সদস্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা, আমাদের সাহায্য করা তো দূরের কথা, কার্যত সভাপতিকেই সমর্থন করেন। ১ জানুয়ারি আমাদের সকলের মনের অবস্থাই ছিল ক্ষুব্ধ। অবস্থা চরমে পৌঁছল তখন, যখন আমরা দেখলাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী এবং অন্য কয়েকজন নেতা, তাঁরা যাঁদের সমমনোভাবাপন্ন বলে মনে করেন তাঁদের নিয়ে এক দল গঠনের এবং অসহিষ্ণু মেজাজের অজুহাত দেখিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির পুরনো এবং অভিজ্ঞ সদস্যদের বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই অস্বাভাবিক কার্যপ্রণালী ছিল কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং প্রচলিত রীতির বিপরীত। ওয়ার্কিং কমিটির জন্য একসঙ্গে দশ জনের একটি নামের প্রস্তাব পেশের জন্য মহাত্মা গান্ধীর সাহায্য চাওয়া হয়। এই তালিকা থেকে অন্যান্যদের মধ্যে মিঃ শ্রীনিবাসন আয়েঙ্গার, মিঃ প্রকাশম এবং আমার নিজের নাম বাদ দেওয়া হয় এবং যাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাঁরা হলেন ডঃ পট্টভি, যাঁর সম্পর্কে সভায় প্রচণ্ড বিরোধী মনোভাব ছিল, এবং মিঃ জয়রামদাস দৌলতরাম, যিনি সে-দিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার প্রখ্যাত প্রবক্তা ছিলেন। আমরা অনুভব করেছিলাম যে, মহাত্মা গান্ধীকে দিয়ে তালিকা পেশ করাবার জন্য নেতারা অন্যায়ভাবে তাঁর প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। যা আমাদের আরও বিরক্ত করেছিল তা হল এই ঘটনা যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে আমাদের প্রাক্তন সহকর্মীদের এই সৌজন্যবোধটুকুও ছিল না যে, এই রকম অস্বাভাবিক পদক্ষেপের আগে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তা যদি তাঁরা করতেন তবে সম্ভবত আমরা সরে দাঁড়াতে রাজি হতাম।

মহাত্মা গান্ধী নামের মূল তালিকা পেশ করলে ডঃ সত্যমূর্তি সংশোধক রূপে অন্য কিছু নাম প্রস্তাব করেন। সংশোধক প্রস্তাব যাতে গৃহীত না হয় সেই জন্য এই সময়ে সবগুলি নাম ভোটে দেওয়া এড়াবার জন্য নেতারা আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেন। মিঃ যমুনালাল বাজাজ প্রস্তাব করেন যে, অতিরিক্ত নামগুলি ভোটে দেওয়ার আগে মহাত্মা গান্ধীর তালিকা সম্পর্কে সভার মতামত নেওয়া উচিত। সংশোধনের পথ বন্ধ করবার জন্য এবং গান্ধীজির নাম এবং

প্রভাব ব্যবহার করে গোটা মূল তালিকাটি পাস করিয়ে নেওয়ার জন্য এটা ছিল এক চাল। মিঃ সত্যমূর্তি এই প্রথার বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, এটা অগণতান্ত্রিক এবং নিয়মতন্ত্র বিরোধী। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তখন বলেন যে, মিঃ বাজাজের পদ্ধতি অথবা মিঃ সত্যমূর্তির পদ্ধতি এর কোনটি সভা চায় এ-বিষয়ে সভার ভোট নেওয়া হোক। মিঃ সত্যমূর্তি এই বলে পণ্ডিতজির প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন যে, এটা গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক এবং যেহেতু পদ্ধতির প্রশ্নটি এমন কিছু, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠতার ঊর্ধ্বে, এটা সভায় ভোটে দেওয়া উচিত নয়। তখন সভাপতি রায় দেন যে, প্রস্তাবের মধ্যে অগণতান্ত্রিক অথবা গঠনতন্ত্র বিরোধী কিছু নেই এবং তিনি পদ্ধতি সম্পর্কে সভার ভোট নিতে অগ্রসর হন। সভাপতির রায় স্পষ্টতই অন্যায় এবং ভুল ছিল এবং তখনই এর প্রতিবাদে আমাদের সভা পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম যে, প্রথমে সভাকে আমাদের প্রতি ন্যায় বিচারের সুযোগ দেওয়া উচিত, কারণ সভা আমাদের পক্ষে রায় দেবে এমন সম্ভাবনা থাকতেও পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সভা ৬২-৪৮ ভোটে এমন এক পদ্ধতির পক্ষে রায় দেয়, যা জোর করে আমাদের সব সংশোধনের পথ বন্ধ করে দেয়।

ফলাফল যখন ঘোষণা করা হল তখন পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনের কোনও আশা ছিল না এবং সভাপতি এবং নেতার কার্যের এবং সংখ্যাগুরুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আমরা সভা পরিত্যাগ করে যাই। তার পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, তিনি আরও মনোনয়ন এবং ব্যালট অনুমোদন করবেন। এই ঘোষণা সভাপতির করা আরও একটি অন্যায়। তাঁর প্রথম ভুল ছিল সর্বজনীন একটি প্রথাকে সভায় ভোটে দেওয়া। দ্বিতীয় ভুল ছিল ভোট গ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা করার পরে সভার সিদ্ধান্ত বাতিল করা। স্পষ্টতই তিনি যে-ভুল করেছিলেন তার সংশোধনের জন্য এটা ছিল তাঁর পশ্চাৎচিন্তা। দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল সংশোধন করতে তাঁর অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমরা তখন সভা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছি। তাঁর রায়ের জন্য অপেক্ষা না করে আমরা তড়িঘড়ি সভা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলাম—সভাপতি জওহরলাল নেহরুর এই বিবৃতির আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ সুবিচার পাওয়ার বিন্দুমাত্র আশা ছিল ততক্ষণ আমরা আমাদের আসন আঁকড়ে বসে ছিলাম। যখন দেখলাম ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে ন্যায়বিচার লাভের কোনও আশা নেই, তখন সভা পরিত্যাগ করা ছাড়া আমাদের কোনও বিকল্প ছিল না। সভা পরিত্যাগের পরে একটি দল গঠনের কথা আলোচিত হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে এবং বিশেষ করে এই ঘটনা বিবেচনা করে যে, নেতারা নিজেদের এক সমপ্রকৃতির দলে আবদ্ধ করেছেন, আমাদের মনে হয়েছিল যে, আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র উপায় হল নিজেদের একটি দল গঠন করা। সংক্ষেপে এটাই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের ভাষ্য। এখানে যা বলেছি সে-সম্পর্কে শীঘ্রই আমি বিস্তৃততর একটি বিবৃতি দেব।

সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রূপে বিবৃতি, লাহোর, ৮ জানুয়ারি ১৯৩০

১ জানুয়ারি আমাদের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা পরিত্যাগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে-সব বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমরা সভা পরিত্যাগ করে যাওয়ার পরে একই সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে-মন্তব্য করেছিলেন এবং সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে তিনি যার পুনরুক্তি করেছিলেন সেই কথা মনে রেখে, আমরা

যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম তা ব্যাখ্যা করতে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রচার করা আমরা প্রয়োজন বোধ করছি।

সভাপতির যে-কাজের জন্য আমরা সভা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম এই প্রকার কাজ তাঁর এই প্রথম নয়। এটা পরপর অনেকগুলি গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং অগণতান্ত্রিক কাজের পরিণতি, যা আমরা আর সহ্য করতে পারিনি। শুরু থেকেই সভাপতি সভার কিছু সদস্য সম্পর্কে এমন মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন যা কেবলমাত্র অন্যায় নয়, প্রতিশোধমূলকও বটে। চরম অবস্থার তখনই সৃষ্টি হল যখন সভাপতিসহ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন প্রখ্যাত সদস্য বিদায়ী ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন প্রখ্যাত সদস্যকে বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেন। এমন কি, এই ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তাঁদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেননি। কার্যত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবং কংগ্রেসের উন্মুক্ত সভায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যেমন গান্ধীজির সাহায্য তলব করতে হয়, আগে থেকে প্রস্তুত নামের তালিকাটি অনুমোদনের জন্যও একইভাবে গান্ধীজির সাহায্য তলব করতে হয়।

যথাসম্ভব কৌশলে গান্ধীজি তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু তাঁর উত্থাপিত যুক্তি বিশ্বাস উৎপাদন করেনি। মিঃ সত্যমূর্তি এই মর্মে একটি সংশোধন-প্রস্তাব আনেন যে, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীযুক্ত প্রকাশম এবং শ্রীযুক্ত সুভাষ বোসকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। অপর এক সদস্য শ্রীযুক্ত গোবিন্দানন্দের নাম প্রস্তাব করেন। অতঃপর শেঠ যমুনালাল বাজাজ প্রস্তাব করেন যে, প্রথমে মহাত্মাজির পেশ-করা সম্পূর্ণ তালিকাটি সম্পর্কে সমগ্র সভার অভিমত গ্রহণ করা হোক। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল মিঃ সত্যমূর্তির উত্থাপিত সংশোধন-প্রস্তাব বন্ধ করা। মিঃ সত্যমূর্তি মিঃ বাজাজের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, এটা নিয়মতন্ত্রবিরোধী এবং সংখ্যালঘুর উপরে সংখ্যাগুরুর অত্যাচার।

এর পরে পণ্ডিত মতিলালজি বলেন যে, নিজের পদ্ধতি নির্ধারণের অধিকার সভার আছে এবং আরও মনোনয়ন এবং ব্যালট বন্ধ রাখা সম্পর্কে মিঃ বাজাজের প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত নয়। পণ্ডিতজি বলেন যে, দুটি পদ্ধতির, অর্থাৎ মিঃ বাজাজ এবং মিঃ সত্যমূর্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতির, কোনটি গ্রহণ করা হবে সে-সম্পর্কে আগে সভার অভিমত গ্রহণ করা উচিত। মিঃ সত্যমূর্তি পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, কারণ, এটা ছিল অগণতান্ত্রিক এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী।

তখন সভাপতি রায় দেন যে, প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির মধ্যে অগণতান্ত্রিক এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী কিছু নেই এবং মিঃ সত্যমূর্তির প্রতিবাদ বাতিল করে প্রস্তাবটি ভোটে দেন। ভোট নেওয়ার পরে দেখা গেল মিঃ বাজাজের প্রস্তাবের পক্ষে ৭২ এবং আরও মনোনয়ন এবং ব্যালটের পক্ষে ৬২। অতঃপর মিঃ সত্যমূর্তি এই পদ্ধতি গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সভা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর সঙ্গে আরও ৫৪ জন সভা পরিত্যাগ করে যান। প্রশ্ন করা হয়েছে আমরা কেন ভোটের পরে সভা পরিত্যাগ করলাম। এর জবাব এই যে, আমরা সভাকে প্রস্তাবিত অগণতান্ত্রিক এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী পদ্ধতি নাকচ করার একটি সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিবেচনায় যা অগণতান্ত্রিক এবং গঠনতন্ত্র বিরোধী—সভা সেই পদ্ধতিকেই সমর্থন করে। ফলে সভা পরিত্যাগ করে প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আমাদের অন্য উপায় ছিল না।

আমাদের ধারণা যে, সভা পরিত্যাগের ঘটনার পরে সভাপতি সভার সিদ্ধান্ত, যা পরিষ্কারভাবে আরও মনোনয়ন এবং ব্যালটের বিরুদ্ধে ছিল, থেকে পিছু হটেন এবং সমগ্র সভার এই সিদ্ধান্ত নাকচ করে তিনি ভোট নেন এবং যেমন প্রচারিত হয়েছে, সেই ফলাফল ঘোষণা করেন। সভার প্রাগুক্ত সিদ্ধান্তের পরে সংশোধন রূপে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত নামগুলি সভার সামনে ছিল না এবং এই কারণে ব্যালটের অনুমোদন অথবা তার মধ্যে অতিরিক্ত নামের অন্তর্ভুক্তির কোনও অধিকার সভাপতির ছিল না। এইভাবে সভার ভোট নিয়ে সংশোধনের রাস্তা বন্ধ করে সভাপতি অন্যায় করেছেন এবং এমন কাজ করে সভার সিদ্ধান্ত

থেকে পিছু হটে তিনি আরও একটি অন্যায় করেছেন। আমাদের সমর্থকরা চলে যাওয়ার পরে সভাপতির গৃহীত পদ্ধতি গঠনতন্ত্রের ৮৪ ধারার বিরোধী। এই ধারা অনুযায়ী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের নিজেদের ভিতর থেকে ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত করতে হবে।

সভাপতি কর্তৃক তাঁর মন্ত্রিসভা মনোনয়ন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের দ্বারা তা অনুমোদনের একটি প্রথা গড়ে উঠেছে—সভাপতির এই বিবৃতি সম্পূর্ণ অসত্য। গৌহাটিতে কেবলমাত্র বিদায়ী ওয়ার্কিং কমিটিই নয়, উপস্থিত সদস্যরাও নতুন ওয়ার্কিং কমিটির জন্য নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং এইভাবে প্রস্তাবিত সব নামের উপরেই ভোট নেওয়া হয়। 'নিজের পছন্দ অনুযায়ী লোক নিয়ে মন্ত্রিসভা গড়বেন মাদ্রাজে' ডঃ আনসারির এই প্রস্তাব নাকচ করা হয় এবং তাঁর প্রস্তাবিত এবং সেই সঙ্গে অন্যের প্রস্তাবিত নামগুলির উপরে ভোট নেওয়া হয়। কলকাতায় বিভিন্ন দলের মধ্যে তালিকা নিয়ে মতৈক্য হয় এবং শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রী সুভাষ বসু, সর্দার শার্দুল সিং, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং শ্রী সত্যমূর্তির অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয় এবং বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া তালিকাটি গৃহীত হয়।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু জোর দিয়ে বলেন যে, নিজস্ব বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সভার আছে এবং আরও মনোনয়ন বন্ধ করা বিধিবহির্ভূত নয়। মহাত্মাজি যথাসম্ভব কৌশলে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন এবং একটি পূর্ণ তালিকা পেশের সমর্থনে তিনি যে-কারণ দেখান, তা আর যা-ই হোক, বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। গান্ধীজি এই মর্মে এক বিস্ময়কর দাবি করেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিসভার মতো এবং সভাপতির উপরে কেউ কোনও সদস্যকে চাপিয়ে দিতে পারে না। মন্ত্রিসভার পদ্ধতিতে দলীয় সরকারকে পূর্বস্বীকৃতি দিতে হয়, কারণ মন্ত্রিসভার সদস্যদের অবশ্যই একই দৃষ্টিভঙ্গি এবং একই উদ্দেশ্য থাকতে হবে—অর্থাৎ তাঁদের মত এক হবে এবং সেই-হেতু তাদের একই দলভুক্ত হতে হবে। মন্ত্রিসভা পদ্ধতির প্রবর্তন করে মহাত্মাজি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দলীয় পদ্ধতিকে ডেকে আনলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের অথবা মেজাজের অসঙ্গতির জন্য যাঁদের ইচ্ছাকৃতভাবে গান্ধীজির দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাঁদেরই হয় রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হতে হয়েছিল অথবা নিজেদের একটি দলে আবদ্ধ করতে হয়েছিল।

আমাদের মতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৯২১ সাল থেকে এই নীতি অনুসারে কাজ করছে যে, আমরা যুদ্ধরত অবস্থায় আছি এবং সেই কারণে, ওয়ার্কিং কমিটির যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার মতো একাধিক দলের সম্মিলিত কমিটি হওয়া উচিত। এই কারণেই অতীতে পণ্ডিত মালব্যের মতো ব্যক্তিদের ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল, যদিও তাঁরা কংগ্রেসের তদানীন্তন নীতি এবং কর্মসূচির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। এবং এই কারণেই গত বছর কলকাতায় কংগ্রেসের ভিতরে দু'টি মতবাদের ব্যক্তিরা ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মহাত্মাজি এ কথাও বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির একমত হওয়া উচিত। অনেকের কাছেই এটা বিস্ময়কর মনে হবে যে, মহাত্মাজি এবং জওহরলাল নেহরুর মত এক নয় এবং তাঁদের মেজাজের মধ্যে সঙ্গতি নেই। আমরা জানি না ভারতবর্ষের তরুণ প্রজন্ম এই সংবাদ কীভাবে গ্রহণ করবে। অনেকের কাছেই এটা খবর বলে মনে হবে। বর্তমানে তাঁর ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগের প্রাক্তন সহকর্মীদের চেয়ে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসপন্থী প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মিল বেশি।

মহাত্মাজি এও বলেছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি এমনভাবে বাছাই করা হয়েছিল, যাতে আইন অমান্যের কাজ যতটা সম্ভব এগিয়ে দিতে তাঁদের সমর্থন করে। বর্তমানে ভারতবর্ষের মাত্র একটি জায়য়ায় আইন অমান্য চলেছে, অর্থাৎ বাংলার যশোহর জেলায় বান্দাবিল্লা গ্রামে—যেখানে গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এবং ত্যাগ স্বীকার করে ইউনিয়ন বোর্ডের কর দেওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু যে-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দায়িত্বে এই আইন অমান্য হয়েছিল, তার সভাপতিকে ওয়ার্কিং কমিটির যোগ্য প্রার্থী বলে বিবেচনা করা হয়নি।

প্রতিবাদ হিসাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা পরিত্যাগ কতটা সমর্থনযোগ্য তার বিচারের ভার আমরা এখন জনসাধারণের উপরেই ছেড়ে দেব।

যেহেতু ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এখন স্বাধীনতার নীতি গ্রহণ করেছে, সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে এখনই কাজ আরম্ভ করা আমাদের কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রদেশ জুড়ে প্রচণ্ড এবং উত্তাল এক আন্দোলন প্রয়োজন। বাংলার ঘরে ঘরে পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে দিতে হবে। এ ছাড়াও কংগ্রেস স্থির করেছে যে, যেখানেই পরিস্থিতি অনুকূল হবে সেখানেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে হবে। এর মধ্যে যশোর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের কর বন্ধের মাধ্যমে আইন অমান্য শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি জানি বাংলাদেশে আরও জেলা আছে যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড জনপ্রিয় নয় এবং জনসাধারণ এই সব বোর্ডের বিলোপ চায়। এই সব জেলার কংগ্রেসকে আমি অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এবং নিজেদের এলাকায় তাদেরও ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা উচিত কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করছি। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমা, যেখানে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছে, এর মধ্যেই ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে।

অনেক বন্ধু এবং সহকর্মী জিজ্ঞাসা করছেন যে, গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাবার সময় তাঁরা প্রকৃত কী কাজ করবেন। আমি তাঁদের এই পরামর্শ দিচ্ছি যে, তাঁদের উচিত প্রতিটি গ্রামে একটি কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা এবং সেই কমিটির সামনে এই ত্রিমুখী কর্মসূচি পেশ করা :—

(১) গ্রাম কংগ্রেস কমিটি একটি গ্রামীণ সেনাদল গঠন করবে, যারা গ্রহণ করবে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব এবং গ্রামের চৌকিদাররূপে গ্রামবাসীদের পুলিশের উপর নির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেবে।

(২) গ্রাম কংগ্রেস কমিটি গ্রামবাসীদের আদালতে না গিয়ে নিজেদের বিবাদ কংগ্রেস কমিটির মাধ্যমে সালিসি দ্বারা নিষ্পত্তি করে নিতে অনুরোধ করবে।

(৩) গ্রাম কংগ্রেস কমিটি ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের কার্যকর প্রচেষ্টা চালাবে এবং একই সঙ্গে স্বদেশী উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে, স্বদেশী শিল্পকে সাহায্য করবে এবং এইভাবে গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করবে।

আমি এক সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন জেলার কর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে উল্লিখিত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করব এবং তাঁদের বলব এই সম্পর্কে আরও পরামর্শ দিতে।

স্বাধীনতার প্রস্তাব

কলকাতার হরিশ পার্কের সভায় ভাষণ, ১০ জানুয়ারি ১৯৩০

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য অপরিহার্য, কিন্তু কোনও বিষয়ে একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে প্রত্যেককে অবশ্যই সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

পূর্ণ স্বাধীনতাকে আমাদের আদর্শ ঘোষণা করে প্রস্তাবটি পাস হয়েছে, কিন্তু এটা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা খতিয়ে দেখতে হবে। এর উপযোগিতা সম্পর্কে বলতে গেলে আয়ার্ল্যান্ডের ইতিহাস থেকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীরা 'স্বাধীনতা তাঁদের লক্ষ্য' কেবলমাত্র এই ঘোষণা করে প্রস্তাবই পাস করেননি,

পূর্ণ স্বাধীনতাও ঘোষণা করেছিলেন। যাঁদের সহায়তায় এই ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁদের কেউ কেউ স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, যদিও মুষ্টিমেয় কিছু লোক এই ঘোষণা সমর্থন করেছিলেন তবু সেই সময়ে এটা ছিল অপ্রয়োজনীয়, কারণ জাতির সামনে এই প্রকার একটি আদর্শ স্থাপন না করলে জাতিকে জাগ্রত করা যেত না। অতঃপর আয়ার্ল্যান্ডের সমগ্র জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ এক পরিবর্তন আসে।

লাহোরে যে ঘোষণা করা হয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘোষণায় জাতির মন কীভাবে সাড়া দিয়েছে তা উপলব্ধি করতে হলে ৪৪ বছর আগে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম থেকে তার ইতিহাস পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। প্রথম দিকের ১৫ বছর কংগ্রেসের কার্যবিবরণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আনুগত্যের প্রস্তাব পাস করা। বিগত শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি পরিবর্তন আসে।

কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশিষ্ট ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং প্রচার করেন যে ভারতীয়রা কোনও দিক থেকেই পশ্চিমের কোনও স্বাধীন জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁরা নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মনির্ভরতা অনুধ্যানের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

এই আদর্শ প্রথমে সাহিত্যে দেখা দেয় এবং পরে রাজনীতিতে প্রসারিত হয়। আমাদের যুবকরা তখন প্রশ্ন করতে শুরু করেন যে, যে-জাতি রামমোহন রায় এবং স্যার সৈয়দ আমেদের মতো ব্যক্তির জন্ম দিয়েছে, সেই জাতির এমন চরম হীন অবস্থা হবে কেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন এবং এটাই জাপান, আয়ার্ল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস পড়তে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। লোকের মনে একটা পরিবর্তন এল এবং চিরাচরিত "আনুগত্য প্রস্তাব" সমর্থন করতে ক্রমশ তাঁদের মনে অনিচ্ছা দেখা দিল।

ফলে কংগ্রেসের রাজনীতিকদের মধ্যে ফাটল দেখা দিল এবং চরমপন্থী এবং মধ্যপন্থী নামে পরিচিত দলের সৃষ্টি হল। নাগপুরে চরমপন্থীদের—সুরাটে যারা সংখ্যালঘু ছিল—জয় সম্পূর্ণ হলে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে বাংলার যুবকরা যে-আদর্শ লালন করেছিলেন তা রূপায়িত হতে চলেছে।

লাহোর স্বাধীনতার প্রস্তাব বিনা-বাধায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার দুটি কারণ দেখানো যায় ; প্রথম কারণ, এতে নীতির কোনও পরিবর্তন ছিল না এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, সরকারের মনোভাবে মিটমাটের কোনও আশা ছিল না। মহাত্মা গান্ধী এটি পেশ করেন এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সমর্থন করেন। এর থেকে বোঝা যায় তাঁরা এই আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং এটা অবশ্যই যুবকদের বৃহত্তম জয়।

এখন একমাত্র যে-সমস্যা দেখা দিতে পারে তা কর্মসূচি নিয়ে, যা আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। অবশ্য ব্যাপকভাবে প্রচণ্ড এবং উত্তাল এক আন্দোলন সব সময়েই পরিচালনা করা যায়। পরবর্তী বারো মাসে আমরা যে-সব কাজ করতে পারি তার মধ্যে সহজতম কাজ সম্ভবত, স্বাধীনতার ধারণা অনুপ্রবিষ্ট করাতে এবং বান্দাবিল্লার মতো আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে প্রচারকার্য।

প্রচারকার্য সম্পর্কে বলা যায় যে, এর প্রতি আমলাদের মনোভাব আমরা জানি। ইতিমধ্যে ম্যাজিকলণ্ঠন-বক্তৃতার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সরকার এত ভয় পেয়েছে যে, শুধু বক্তাদেরই গ্রেফতার করেনি, লণ্ঠনগুলিও বাজেয়াপ্ত করেছে।

প্রচারশিল্পে ব্রিটেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ। গত যুদ্ধের সময় তারা নিরপেক্ষ দেশগুলিতে জার্মানির বিরুদ্ধে বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ এনে নিবিড় এবং ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। ফন লুভেনভর্ফ এবং অন্যান্য যুদ্ধাভিজ্ঞ জার্মানগণ পরবর্তীকালে লিখেছেন যে, এই দিকটি তাঁরা প্রথমে অবজ্ঞা করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিরপেক্ষ দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, ব্রিটিশরা এর মধ্যেই মাঠ দখল

করে নিয়েছে। এখন রাশিয়া অত্যন্ত কার্যকরভাবে এই কৌশল চালাচ্ছে এবং এই কারণেই ব্রিটেন তাকে এত অপছন্দ করে—ঘৃণা করে তা বলব না। অস্ত্রশস্ত্র অথবা অন্য কোনও বস্তুসম্পদে রাশিয়া ব্রিটেনের সমকক্ষ নয়।

বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে আরও কিছু

বান্দাবিল্লার অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি, যশোহর, ১৭ জানুয়ারি ১৯৩০

যশোহর জেলার বান্দাবিল্লায় যে-সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছে, সে-সম্পর্কে প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতি সম্পর্কে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কার্যত শেষ হয়ে গেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। শেষ হওয়া তো দূরের কথা, আন্দোলন এখন পূর্ণ গতিতে চলছে এবং কেবলমাত্র সম্মানজনক কোনও মীমাংসা হলেই তা শেষ হবে। সর্বশেষ সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, এক দিকে সর্বশক্তিতে সরকারি নির্যাতন চলছে এবং অপর দিকে গ্রামবাসীরা দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনের স্থানীয় নেতা শ্রীবিজয়চন্দ্র রায় বিচারের অপেক্ষায় আছেন, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রচারিত এই সংবাদ বাসি হয়ে গেছে। শুধু বিজয়বাবু নন, তাঁর সকল সহকর্মীও অনেক আগে গ্রেফতার হয়েছেন এবং এখন বিচারের প্রতীক্ষায় আছেন। কিন্তু নতুন কর্মীরা এর মধ্যেই সেখানে তাঁদের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ যে আন্দোলনে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন এটাও পুরনো খবর, কারণ তারা শুরু থেকেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করছেন।

বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ভাল দাম পাচ্ছে এই বিবৃতিও একই রকম মিথ্যা, কারণ প্রকৃত ঘটনা এই যে—চল্লিশ, পঞ্চাশ অথবা ষাট টাকা দামের গরু আট আনা অথবা এক টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই কথা বোঝাতে চাইছে যে, গ্রামবাসীরা আর তাঁদের পূর্বাবস্থায় নেই। বরং তাঁদের সামরিক পুলিশের তাঁবুতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, আমার বান্দাবিল্লা পরিদর্শনের পরে আন্দোলন কেবলমাত্র যশোহর জেলার অন্যান্য ইউনিয়নেই ছড়িয়ে পড়েনি, পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতার মেয়রের নিকট পত্র

আলিপুর কোর্ট
২৩.১.৩০

মেয়র মহোদয় সমীপেষু,
কলকাতা কর্পোরেশন।

মহাশয়,

আমার কয়েকজন কাউন্সিলার বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়েছি যে গতকাল অনুষ্ঠিত সভায় আমাকে কাউন্সিলার হিসাবে আমার পদত্যাগপত্র পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে কর্পোরেশন

সর্বসম্মত এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবের জন্য কর্পোরেশনের নিকট আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রস্তাবকে আমি আমার প্রতি আস্থা এবং যত দিন আমি কর্পোরেশনে যুক্ত ছিলাম সেই সময়ে আমার সামান্য সেবার স্বীকৃতি বলে বিবেচনা করছি। এই প্রস্তাবের জন্য আমি আরও কৃতজ্ঞ বোধ করছি, কারণ আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমি কারাগারে প্রবেশ করতে চলেছি। যেহেতু এক বছরের মেয়াদে আমাকে কারাগারে যেতে হচ্ছে, আমার মনে হয় আমার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। বরং কারাবাসের সময় আমার আসনটি বজায় রাখলে আমার নির্বাচকদের প্রতি অন্যায় করা হবে। আমার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে আমার প্রতি যে-সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে তার জন্য পুনরায় আমি কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভবদীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ এবং বাংলা কংগ্রেস

১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি

আজ আমরা কয়েকজন এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে কারাগারের পথে চলেছি। স্বাভাবিক কারণেই পরিস্থিতি যশোহর এবং বান্দাবিল্লাকে আমাদের ভাবনায় সবার উপরে স্থান দিয়েছে। প্রার্থনা করি, শক্তিমান আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রামে ঈশ্বর যেন বান্দাবিল্লার জনগণকে সাফল্যের শিরোপা পরিয়ে দেন। ইতিপূর্বে মেদিনীপুরের জনগণ এই প্রকার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং সরকারকে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিলেন। যশোহরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড নিয়ে সংগ্রাম ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বান্দাবিল্লার জনগণ যে-আন্তরিক নিষ্ঠা দেখিয়েছেন এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাতে তাঁদের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তাঁরা আগের মতো অবিচলিত সাহসের সঙ্গে সংগ্রামের পথে এগিয়ে যান এবং তার জন্য যত ত্যাগ, সংগ্রাম এবং কষ্ট প্রয়োজন তা বরণ করুন। তাঁদের কাছে এই আমাদের আন্তরিক আবেদন। বান্দাবিল্লার সাহায্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে আমরা যশোহরবাসীর কাছে আবেদন করছি। তাঁরা ছাড়া বান্দাবিল্লা একা কী করতে পারে ?

সব শেষে, আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমগ্র বাংলায় এবং সমগ্র ভারতেও এক নতুন শক্তি এবং সতেজ প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে।

কারাগারে প্রবেশের আগে আমরা বাংলার সমস্ত কংগ্রেসকর্মীর কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি তাঁরা যেন বিভেদ ভুলে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে সম্প্রতি যে-বিভেদ দেখা দিয়েছে, এখন তা দূর করতে হবে।

এখন এটা স্পষ্ট যে, সরকার এক নিষ্ঠুর নিপীড়নের নীতি অনুসরণ করতে চলেছে। সরকার যখন সংগঠিত এবং কৃতসঙ্কল্প, তখন স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের অবশ্যই অনুরূপভাবে সুসংগঠিত এবং কৃতসঙ্কল্প হতে হবে।

জনসাধারণের জানা আছে যে, বাংলা সরকারের নিপীড়নমূলক নীতির জন্য অধিকাংশ জেলায় আমাদের কর্মীরা বিরাট সংখ্যায় অভিযুক্ত হচ্ছেন। আদালতে আমাদের কর্মীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক দিকে অর্থের এবং অন্য দিকে উকিলের সাহায্য প্রয়োজন হবে। যতক্ষণ কংগ্রেস আত্মপক্ষ সমর্থন না করার নীতি গ্রহণ না করে, ততক্ষণ আদালতে আমাদের

কর্মীদের পক্ষ সমর্থনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে কর্তব্য পালনে আমরা ব্যর্থ হব।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যে আমি জনসাধারণকে জানাব এবং তাঁদের সহানুভূতি এবং সমর্থনের জন্য আবেদন করব। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। একদিকে আমরা ঋণগ্রস্ত এবং অপর দিকে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মসূচি চালু রাখতে, বান্দাবিল্লা সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং বাংলায় স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন পরিচালনা করতে অবিলম্বে আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন। বর্তমান সঙ্কটে মুক্তহস্তে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে আমি দানশীল জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমি তাঁদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যদি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অর্থের অনটন না হয়, তা হলে আমাদের অনুপস্থিতিতেও বাংলায় আন্দোলন পরিপূর্ণ শক্তিতে এবং অদম্য উৎসাহে চলতে থাকবে।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি

বন্ধুগণ, আমরা আজ আমাদের ইতিহাসের এক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখি। সরকারের উৎপীড়নের চাকা আমাদের চূর্ণ করে পরাজিত করতে চাইছে। সুতরাং যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মধ্যে আছেন অথবা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাঁদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নিজেদের সংগঠিত এবং শক্তিশালী করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। আমাকে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করে ভারতবর্ষের শ্রমিকরা আমার প্রতি যে-সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ। আজ আমার দুঃখ এই যে, ভারতবর্ষের সেবায় আমার কাজটুকু করবার স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হবে না। সরকারি উৎপীড়ন ছাড়াও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে বিরোধের ফলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অপর একটি গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয়েছে। এই সন্ধিক্ষণে আমি সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং শ্রমিক সাধারণের কাছেও আন্তরিক আবেদন করছি যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁরা যেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং এর পাশে দাঁড়ান। শ্রমিকদের স্বার্থ ন্যায় বিচার এবং মানবিকতার স্বার্থ। আমি নিঃসন্দেহ যে শ্রমিকদের স্বার্থ শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এবং ভারতবর্ষের শ্রমিকরা সময়োপযোগী কাজ করবে এবং আন্দোলনকে সাহায্য করবে এবং গৌরবমণ্ডিত করবে।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স

১৯৩০ সালের ২৩ জানুয়ারি প্রচারিত বিবৃতি

মনে হচ্ছে "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" বাহিনী কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছে। অতএব ঠিক এই সময়েই এই বাহিনীতে অধিক সংখ্যায় যোগ দেওয়ার জন্য বাংলার যুবকদের আমার আহ্বান করা উচিত। ইতিমধ্যেই যাঁরা এই বাহিনীর সদস্য হয়েছেন, তাঁদের কাছে আমার এই আবেদন যে, তাঁরা যেন আন্তরিকভাবে কাজ করেন এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে বাহিনীর কাজ যাতে ব্যাহত না হয় সে-দিকে দৃষ্টি রাখেন। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, সরকারের

দমনমূলক নীতি আমাদের বাহিনীকে কেবল সংখ্যা, শৃঙ্খলা এবং সংগঠনের দিক থেকে শক্তিশালী করতেই সাহায্য করবে।

আমাদের অফিসার এবং নন-কমিশন্ড অফিসারদের দায়িত্ব যথার্থই খুব বড়। আমাদের বাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মীদের সামনে তাঁদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তাঁদের এবং নিম্নপদস্থ কর্মীদের উপরেও আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে তাঁরা সময়োপযোগী কাজ করবেন।

সুভাষচন্দ্র বসু
জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং, বি.ভি.
আলিপুর কোর্ট।

স্বাধীনতা দিবস

কলকাতার নাগরিকবৃন্দের প্রতি আবেদন, ২৪ জানুয়ারি ১৯৩০

যে-দিনটি সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হবে, তার আগেই যে আমাদের কারাদণ্ড দেওয়া হল, এটা সম্ভবত নিতান্ত আপতিক ঘটনার চেয়ে কিছু বেশি।

হয়তো সরকার ভাবছে যে, ২৬ জানুয়ারির আগে আমাদের কারাগারে পাঠালে স্বাধীনতা-দিবসের উদ্‌যাপন ব্যাহত হবে।

অতএব কলকাতার নাগরিকদের কাছে আমি এটা লক্ষ রাখতে আবেদন করছি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে কলকাতায় স্বাধীনতা-দিবস যেন এমনভাবে উদ্‌যাপিত হয় যাতে যে-মহান নগরের নাগরিক বলে আমরা গর্ব করি, তার মর্যাদা রক্ষিত হয়। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের অনুপস্থিতিতে কিছু এসে যাবে না, বরং অধিকতর প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আমাদের সহনাগরিকদের অনুপ্রাণিত করবে।

কারাগারের রোজনামচা

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, ১৯৩০

৭.২.৩০—গত রাতে এক নতুন ঝঞ্ঝাট শুরু হয়েছে। আমাদের দলের প্রেম সিং বলতে শুরু করেছেন যে, যেহেতু লাহোর জেলের রাজনৈতিক বন্দিরা অনশন শুরু করেছেন, তাঁদের প্রতি সহানুভূতিতে তিনিও অনশন ধর্মঘট শুরু করবেন। গত রাত্রে, শেষবার তালা বন্ধ হওয়ার আগে, আমরা বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। কিন্তু বোঝা গেল, তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল। কারণ, সকালে যখন আমরা চা খেতে গেলাম, প্রেম সিংয়ের দেখা পাওয়া গেল না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিনি তখনও বিছানায়। তখন আমরা স্থির করলাম তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করানোই সর্বোত্তম পন্থা এবং এই কাজটি আগে করতে হবে; কারণ, একবার অনশন শুরু করলে তাঁর মানসিক দৃঢ়তা বেড়ে যাবে এবং সম্ভবত নিজের থেকে অনশন ভঙ্গ করতে দ্বিধা করবেন এবং লজ্জিত বোধ করবেন। আমরা সবাই একসঙ্গে

তাঁর ঘরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলাম। ডঃ দাশগুপ্তকে আমাদের দলের প্রধান মুখপাত্র করা হল এবং অনেক বোঝানোর পরে তিনি অনশন পরিত্যাগ করতে রাজি হলেন। তাঁর খাওয়া হলে আমরা ভ্রমণ করতে গেলাম।

সকালের ভ্রমণ সেরে ফিরে এসে শুনলাম, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ আমাদের পরিদর্শন করতে আসবেন। যদিও উনি এসেছিলেন, আমাদের চত্বরে ঢোকেননি।

তিনটের পরে শ্রীযুক্ত বরদা পাইন, শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—উকিল বন্ধুরা—আমাদের দেখতে এসেছিলেন। অনেক দিন পরে বরদাবাবুকে দেখে আমি উল্লসিত হয়েছিলাম। বলা যায় তাঁদের অনুসরণ করেই এলেন মা, বাবা, বড়দিদি, মেজবৌদি ইত্যাদি। তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন শ্যামাদাস কবিরাজ। তাঁরা এখানে ঘণ্টাখানেক ছিলেন। জাতীয় পতাকার ঘটনা সম্পর্কে—ওটা কোথা থেকে এল, ওটার কী হল—সব কথা জানতে তাঁরা অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। সম্ভবত কারাবাসই বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের মনোভাবে এমন প্রতিক্রিয়া এবং পরিবর্তন আনে, অন্য কোনও অবস্থা যা পারে না।

৮.২.৩০—আজ শনিবার। সকালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসেছিলেন। আমরা আমাদের কর্মসূচি সম্পর্কে কথা বললাম এবং তিনি আমাদের কয়েকজনকে কনিষ্ঠ কয়েদীদের স্কুলে পড়াবার প্রস্তাব দিলেন। বস্তুতপক্ষে কিছু দিন আগে আমরাই এই প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং উনিই বলেছিলেন প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যাবে না। এখন তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন দেখে আমরা খুবই খুশি হলাম। মনে হল, উনি নিশ্চয় ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্-এর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁর ফলেই তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। উনি আরও বললেন যে, কয়েদীদের চরকার ব্যবহার শেখাতে তিনি আমাদের সাহায্য নিতে পারেন। একবার ওরা এটা শিখলে জেলের মধ্যে "খদ্দর" প্রস্তুত করা যাবে, কারণ তাঁত এখানে বরাবরই ছিল।

বাইরে থেকে খাবার আনা সম্পর্কে কথা হল এবং উনি বললেন যে, ভবিষ্যতে সপ্তাহে মাত্র একবার উনি বাইরে থেকে খাবার আনার অনুমতি দেবেন। অবশ্য ভাত এবং ডালের মতো তণ্ডুল জাতীয় খাবার সব সময়েই আনা যেতে পারে।

৯.২.৩০—আজ রবিবার এবং ছুটির দিন। আজকের দিনে কয়েদীরা তাঁদের জামাকাপড় কাচেন এবং বিশ্রাম করেন। তাই আমরা স্থির করলাম আজ সুতো কাটব না। তার বদলে আমাদের ঘর পরিষ্কার করে, বিছানা খোলা হাওয়ায় রেখে এবং জামাকাপড় কেচে আমরা গল্প করব। এবং এইভাবেই দিনটি কাটল। বিকেলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু এবং অন্যান্য উকিলরা এলেন। মামলাটি সম্পর্কে কথা হল। অফিসে গিয়ে দেখলাম, বাড়ি থেকে একরাশ বই এসেছে। রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি আচরণের বিষয়ে আমি সরকারের কাছে লিখেছিলাম। ডেপুটি জেলার জানালেন যে, তাঁকে ইনস্পেক্টর জেনারেল আমাকে এই কথা বলতে বলেছেন যে, বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। আমি যে-চিঠিটি লিখেছিলাম তার অনুলিপি নীচে দেওয়া হল।*

১০.২.৩০—আজ সোমবার এবং সাধারণ পরিদর্শনের (general inspection) দিন। এই দিন কয়েদীদের তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র (যেমন—কম্বল, অন্তর্বাস, থালা, বাটি) প্রদর্শন করে প্রভুর পরিদর্শনের অপেক্ষায় বসে থাকার কথা। প্রভু—অর্থাৎ সুপারিন্টেন্ডেন্ট—আসেন, প্রতিটি চত্বরে যান এবং তাঁদের জিনিসপত্র পরিদর্শন করেন। কোনও অভিযোগ থাকলে কয়েদীরা তা জানাবার সুযোগ পান। এবং যেহেতু সোমবার কয়েদীরা পরিদর্শনের জন্য পথে ভিড় করে থাকেন, আমরা প্রাতর্ভ্রমণে যেতে পারি না।

* (চিঠিটি রোজনামচার অন্তর্ভুক্ত হয়নি—সম্পাদক)।

আজ এই ব্যাপার ঘটেছিল।

গত কয়েক দিন প্রায় যাবতীয় বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ; বাংলার সাংস্কৃতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং অন্যান্য অন্বেষণ ; চিনের আধুনিক ইতিহাস ; রাশিয়া এবং আয়ার্ল্যান্ডের, সমাজবিজ্ঞান এবং আধুনিক মনস্তত্ত্ব সবই আলোচিত হচ্ছে—এমন কি মহাত্মা গান্ধীকেও বাদ দেওয়া হয়নি। একদিন নৃপেনবাবু কয়েকজন যুবকের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে জোর তর্ক করলেন। এক দিকে ছিলেন নৃপেনবাবু একা এবং অন্য দিকে কয়েকজন তার্কিক যুবক। কয়েক ঘণ্টা পরে বিতর্ক মুলতুবি হল। সারাক্ষণ একা তর্ক করে হঠাৎ নৃপেনবাবু আবিষ্কার করলেন এই রকম তরুণ বিরোধীদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থা অস্বস্তিকর। তাঁদের চরমপত্র এই ছিল যে, আজকের কোনও নেতা যদি তাঁর অনুগামীদের কথায় কান না দেন, তিনি তাঁর নেতৃত্বের অধিকার খোয়াতে বাধ্য। এবং নৃপেনবাবু যদি এ-বিষয়ে তাঁর মতের পরিবর্তন না করেন, তাঁর অনুগামীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। ফলে যা স্থগিত ছিল তা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হল।

১১.২.৩০—মঙ্গলবার। মেজর দত্ত আমাদের চত্বরে এলে কিছু গোলমাল হয়। একতলায় কিছু সেল-এ পরদা হিসাবে কম্বল ব্যবহার করা হচ্ছিল। এটা দেখে সুপারিন্টেন্ডেন্ট কারণ জিজ্ঞাসা করলেন (এটা নিশ্চয় নিয়মবিরুদ্ধ—আমাদের কাছে অন্যায় মনে হয়নি)। সেল-এর বাসিন্দা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাঁকে কিছুই বলা হয়নি। তার বদলে সার্জেন্টকে ভর্ৎসনা করা হয় এবং তাতে নিশ্চয় সেল-এর বাসিন্দা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র রক্ষিত ক্রুদ্ধ হন। এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের মতো রাজনৈতিক বন্দিরা সাধারণত অপমানজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এই রকম ঘটনায় আমরা উত্তেজিত হই এবং তা প্রকাশ করি। যা-ই হোক, ভূপেনবাবু সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। মিঃ দত্ত কম্বলকে পরদা হিসাবে ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ভূপেনবাবু বললেন ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে এটা করা হয়েছিল। (এখানে আমার বলে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক সেল-এর একটি দরজা এবং একটি জানালা আছে। দরজা লোহার শিক দিয়ে তৈরি এবং এর মধ্য দিয়ে ভিতরটা দেখা যায়। জানালাটা দরজার উলটো দিকে এবং সিলিং-এর বরগার খুব কাছে। জানালা একইভাবে লোহার শিক দিয়ে তৈরি।) চলে যাওয়ার সময় মিঃ দত্ত বললেন, এই রকম পরদা ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। তাঁর ছেলেমেয়েরা সারা রাত বাইরের বারান্দায় শোয়। ভূপেনবাবু এই কথার মুখের মতো জবাব দিলেন এই বলে যে, সেল-এর সমস্যাটা সম্পূর্ণ আলাদা এবং এটা কেমন জানতে হলে দত্তসাহেবকে একটা সেল-এর থেকে দেখতে হবে। এক অধস্তন কর্মচারীর সামনে এমন কথায় রেগে গিয়ে দত্তবাবুকে কিছু না বলে চলে গেলেন। সে-দিন আর তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।

ক্রুদ্ধ অবস্থায় তিনি তাঁর অফিসে গিয়ে হুকুম জারি করলেন—(১) কাউকে কম্বল অথবা পরদা ঝোলাবার অনুমতি দেওয়া হবে না, (২) যাঁরা উপরে থাকেন তাঁদের প্রত্যেককে নীচে আসতে হবে যাতে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সার্জেন্ট অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আমাদের এই সংবাদ জানান। কিন্তু হুকুমটি সরকারিভাবে সে-দিন আমাদের জানানো হয়নি।

আমাদের প্রতি সুপারিন্টেন্ডেন্টের মনোভাব সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম।

পরদিন সকালে তিনি যখন এলেন, তখনও তাঁর অসন্তোষ ছিল। আমি স্থির করলাম নীচে যাব না, তা হলে তাঁকে উপরে আসতে হবে। পরদাগুলি তখনও সেখানে ছিল, কেবল সংখ্যায় বেড়েছিল। প্রথমে তিনি পাশের চত্বরে গেলেন। সেখানে নৃপেনবাবু এবং অন্য বন্ধুরা ছিলেন। সংবাদপত্র নিয়ে নৃপেনবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হল। নৃপেনবাবু যখন বিচারাধীন কয়েদী ছিলেন, তখন তাঁকে সংবাদপত্র দেওয়া হয়েছিল। সাজা হওয়ার পরে এবং বিশৃঙ্খলার ফলে তিনি সংবাদপত্র ঠিকই পেয়ে যাচ্ছিলেন—যদিও আইনের দিক

থেকে এটা তাঁর পাওয়ার কথা নয়। ব্যাপারটা মেজরের নজরে এলে তিনি সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন। এই ব্যাপারে নৃপেনবাবু এবং মেজরের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

এর পর দত্তসাহেব আমাদের চত্বরে আসেন এবং প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। তিনি দুঃখের সঙ্গে প্রথমে যে-যুক্তি দেখালেন তা এই যে, তাঁকে কার্যত অপমান করা হয়েছে এবং তাঁর হুকুম অবজ্ঞা করার জন্য পাশের চত্বরে পরদা টাঙানো হয়েছে, ইত্যাদি। আমরা বুঝতে পারলাম যে বিষয় নিয়ে তিক্ততা সৃষ্টি করা বোকামি হবে ; এবং লড়াই করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই লড়াই করা উচিত। তাই আমরা বুঝিয়ে বললাম যে, সমস্ত গোলমালের উৎপত্তি উভয় পক্ষের ভুল বোঝাবুঝি থেকে এবং তাঁকে অপমান করতে পরদা টাঙানো হয়নি। আমাদের অনেকেই দীর্ঘকাল থেকে পরদা টাঙাচ্ছেন এবং এই সব তুচ্ছ জিনিসের উপর তাঁর নজর দেওয়া উচিত নয়। এই সব কথায় তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা হল এবং আমরা খুশি হলাম এবং স্বস্তি পেলাম।

বিকেলের দিকে আমার ডাক পড়ল—বস্ আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। ডাকটা ব্যক্তিগত কারণে অথবা বদলির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কারণে, এই কথা ভেবে প্রথমে আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, অনুরূপভাবে আমি বহরমপুর জেল (যখানে ১৯২৫ সালে রাজনৈতিক বন্দি ছিলাম) থেকে মান্দালা জেলে বদলি হয়েছিলাম। যাই হোক, অফিসে পৌঁছে বুঝতে পারলাম, আশঙ্কার কোনও কারণ ছিল না। দত্তসাহেব আমাকে গল্প করতে ডেকেছিলেন। আমরা এক ঘণ্টার উপর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনায় বিশেষ করে কয়েদিদের শ্রেণীবিভাগ এবং অনশন-ধর্মঘটের প্রসঙ্গ উঠল। অনেকক্ষণ পরে আমি যখন কথা বলে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন সাক্ষাৎকার শেষ হল। বস্ তাঁর বাসায় ফিরে গেলেন এবং আমি আমার সেলে ফিরলাম।

১৩.২.৩০—বৃহস্পতিবার। আজ সকালে আবার গোলমাল শুরু হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে অঙ্কুরেই তার বিনাশ হয় এবং সেটা পেকে উঠতে পারেনি। সকালে আমরা বেড়াতে বেরিয়ে গেলে সার্জেন্ট এসে সব পরদা সরিয়ে ফেলেছিল। বস্-এর আসবার সময় হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সার্জেন্ট আমাদের নীচে যেতে বলল। বলা বাহুল্য সেই মুহূর্তে নীচে গিয়ে সার্জেন্ট অথবা তার বস্কে খুশি করার মতো মেজাজ অথবা মানসিকতা আমাদের ছিল না। কিন্তু অবস্থাগত কারণে মেজর দত্ত আজ সকালে আমাদের চত্বরে আসেননি। কাজেই মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তখন বিকেল প্রায় দুটো। আমরা সবাই যখন ঝিমুচ্ছিলাম তখন মিঃ দত্ত এলেন, একদম একা। তখন এক দীর্ঘ বক্তৃতা, যা তাঁর বৈশিষ্ট্য, শুরু হল। প্রধানত কয়েদিদের জন্য শিক্ষার নীতি নিয়ে আলোচনা হল। তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে আমরা অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েদিদের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে পারি। অতঃপর তিনি মুক্তির পরে কয়েদিদের দেখাশোনা, মৃত্যুর পরে হিন্দু কয়েদিদের সৎকারের ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি বললেন যে, কয়েদিদের কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের ন্যূনতম দুশ্চিন্তাও নেই। ব্রিটিশরা এমন নয়। দেড় ঘণ্টা কথা বলার পরে তিনি গেলেন। ফলে ডেপুটি জেলার এবং সিপাইরা, যাঁরা তাঁর কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন।

১৪.২.৩০—শুক্রবার। আজ সকালে বস্ এদিকে আসেননি। আমাদের দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে বারোটা নাগাদ দত্তসাহেবের এক বার্তা নিয়ে ডেপুটি জেলার এসেছিলেন। বার্তাটি এই যে, শ্রীযুক্তা উর্মিলা দেবী ধীরেনবাবু এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমরা সেখানে জেলে মেজরের সঙ্গে এক আলোচনায় জড়িয়ে পড়লাম। ওঁর সঙ্গে আমরা প্রায় দু' ঘণ্টা ছিলাম। দত্তসাহেবের ঘর থেকে আমরা একদল যুবককে বাস থেকে 'বন্দেমাতরম' বলে চিৎকার করতে শুনলাম। প্রথমে আমরা ভাবলাম নিশ্চয় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগি জেলে এসেছেন, কিন্তু গাড়িটা ফটকে দাঁড়াল না। তার বদলে ওটা আলিপুরের দিকে চলে গেল। আমরা চত্বরে ফিরে আসবার আধ ঘণ্টা পরে বার বার 'বন্দোমাতরম' শুনতে পেলাম। এবার মনে হল শব্দটা আমাদের দিকে আসছে। শেষ পর্যন্ত এই জেলের গেট থেকে এই শ্লোগানের চিৎকার ভেসে এল। তখন এটা স্পষ্ট হল যে, শেষ

পর্যন্ত জ্ঞানাঞ্জনবাবু পৌঁছে গিয়েছেন। চিৎকার করে অভ্যর্থনা করলাম। যুবক এবং বৃদ্ধ সবাই যোগ দিলেন। আমাদের উত্তেজনা দেখে ইউরোপিয় ওয়ার্ড থেকে এক কয়েদি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা সবাই কি বেরিয়ে যাবেন ?" আমাদের জবাব ছিল, "না, আরও লোক জেলে আসবেন।" তিনি "হুর্‌রে" বলে এর জবাব দিলেন। কেবলমাত্র কয়েদিরাই নতুন রাজনৈতিক বন্দির আগমনের আনন্দ কী তা জানে। আমাদের ওয়ার্ডে পৌঁছুলে জ্ঞানাঞ্জনবাবুকে প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে অভিনন্দন জানানো হল। এই উৎসাহ দেখে সাধারণ কয়েদিরা বিস্মিত হল এবং ভাবল "এদের কী হল ?" এই উত্তেজনার কারণ জানতে জেলার বিকৃতমুখে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। বাইরে কী ঘটছে সে-বিষয়ে আমাদের তরফ থেকে দীর্ঘ অনুসন্ধান চলল। তখন রুটিন অনুযায়ী আমরা বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে গেলাম।

আজ জেলের মধ্যে আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ বছর কারাবাসের পরে মুক্তি পেলেন। দ্বিতীয়, এক বিশেষ আদালতে মেছুয়াবাজার বোমা মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। এই মামলার সঙ্গে জড়িত বারো অথবা তেরোজন বিচারাধীন তরুণ কয়েদি এখানেই আছেন। এখানে নিখিলবাবু সম্পর্কে একটা কথা অবশ্যই বলতে হবে। তাঁকে বাংলার একটি জেল থেকে দিল্লির এক জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁকে নিঃসঙ্গ কারাবাস (solitary confinement) রাখা হয় এবং তিনি অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন। তার পরে অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। কিছু দিন আগে আবার তাঁকে কলকাতার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৫.২.৩০—শনিবার। আজ সকালে মেজর দত্ত বেশিক্ষণ আমাদের ওয়ার্ডে থাকেননি। আমি ভাবলাম বাচা গেল, কারণ একবার কথা বলতে শুরু করলে বক্তৃতা তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর অনর্গল কথার স্রোত দেখে মনে হয় তাঁর শিক্ষক অথবা ধর্মপ্রচারক হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে ভ্রম-ক্রমে তিনি কারা বিভাগের এক ডাক্তার। কিন্তু আমরা রেহাই পেলাম না এবং এক নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম। আগের দিন (অর্থাৎ শুক্রবার) প্রেম সিং আমাকে বলেছিলেন যে, অধিকার অনুযায়ী যে-সব জিনিস তাঁর প্রাপ্য, তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস (যেমন চেয়ার, এক্সারসাইজ বুক, কাগজ ইত্যাদি) তাঁর যতটা প্রাপ্য, সেই পরিমাণে পাচ্ছিলেন না এবং পরের দিন (অর্থাৎ শনিবার) তিনি সুপারের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে হেস্তনেস্ত করবেন। তাঁর মনোভাব থেকে আমি গোলমালের আশঙ্কা করলাম। আমি তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ডারকে অফিসে জানাতে বললাম যে, প্রেম সিং এই সব জিনিস পাননি এবং অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তখন আমি ডেপুটি জেলার অনিলবাবুকে বললাম যে, চেয়ার পাননি বলে প্রেম সিং ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং এ-বিষয়ে অবশ্যই সত্বর কিছু করতে হবে।

মেয়রের ভাষণ

১৯৩০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় প্রদত্ত

আমি যখন কারাগারে, তখন আমাকে এই নগরের মেয়র নির্বাচিত করে আমার প্রতি যে-বিরাট সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমি অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সভার প্রতিটি বিভাগ এবং আমাদের ডেপুটি মেয়রও। আমার প্রতি হৃদয়ের যে-অনুভূতি প্রকাশ করেছেন তার জন্য আপনাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমি এই বিরাট সম্মানের যোগ্য এমন কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে ঠাঁই দেওয়ার মতো মূর্খ অথবা দাম্ভিক আমি নই। এ-বিষয়ে আমি সচেতন যে, আমার যদি আদৌ কোনও গুণ থাকে তবে তা এই যে, আমি আমাদের প্রয়াত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের এক বিশ্বস্ত এবং উৎসাহী

অনুগামী হওয়ার চেষ্টা করেছি। এবং আমি কবুল করব যে, আমার যদি কোনও গুণ থাকে তবে তা এই যে, জাতির জন্য যে-মশাল তিনি ঊর্ধ্বে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিলেন, এক ভাবপ্রবণ বাঙালি যা করতে সক্ষম আমি সেইরকম বেপরোয়াভাবে তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি।

অল্ডারম্যান এবং কাউন্সিলারগণ, মনে হয় না আপনারা আমার কাছ থেকে এক দীর্ঘ ভাষণ আশা করেন। মহাত্মা গান্ধী অনুগ্রহ করে একবার যা "নাগরিকরূপে মৃত" (civilly dead) বলে বর্ণনা করেছিলেন আমি তা-ই। গত আট মাস ধরে আমি "নাগরিকরূপে মৃত" ছিলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, এই বছরের জানুয়ারি মাসে কর্পোরেশনের সামনে যে-সব সমস্যা ছিল আজও তা বর্তমান। এবং এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে প্রাচ্যের এই প্রধান নগরীর প্রথম মেয়রের প্রথম বক্তৃতার উল্লেখ অপেক্ষা ভাল কাজ আর কিছুই করতে পারি না। আমি যদি সেই প্রথম বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করি, আশা করি আপনারা তা ধৈর্যসহকারে শুনবেন। আমার বিশ্বাস এই বক্তৃতাকে আমরা সকলে আমাদের পৌরসভার সংহিতা বলে গণ্য করি। সেই বিখ্যাত বক্তৃতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছিলেন : "বিগত দশ অথবা পনের বছর ধরে যে-মহৎ কাজ আমি হাতে নিয়েছি তা হল এক বৃহৎ ভারতীয় জাতি গঠন, যার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও তারা একটি জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ এবং সংযুক্ত...আমি দেখেছি এই কর্পোরেশনে সেই লক্ষ্যে অনেক কাজ করা সম্ভব...আমার সাধ্যে যতটা কুলায় তার মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন যে, কোনও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমগ্র সম্প্রদায়ের মঙ্গলের প্রতিকূল হবে না। সমগ্র সম্প্রদায় বলতে আমি বোঝাতে চাই ভারতীয় জনগণ অথবা এই বিশেষ ক্ষেত্রে কলকাতার নাগরিকরা।

"আমি বিশ্বাস করি এখানে শুধু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দর্শনই নেই, আছে পৌরবিজ্ঞান এবং রাজনীতির প্রকৃত সম্পর্কও।

"দরিদ্রকে 'দরিদ্রনারায়ণ' রূপে গণ্য করা ভারতীয়দের এক মহান আদর্শ। ঈশ্বর তাঁদের কাছে দরিদ্রের রূপ ধারণ করে আসেন এবং ভারতীয় মানসে দরিদ্রের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা। অতএব দরিদ্রের সেবার লক্ষ্যে আমি আপনাদের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করতে চেষ্টা করব এবং আপনারা দেখবেন, আমি যে কর্মসূচি তৈরি করেছি তাতে অধিকাংশ কাজই দরিদ্রদের নিয়ে— দরিদ্রদের বাসস্থান, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য। এই সমস্তই দরিদ্রের কাছে আশীর্বাদ এবং এই কাজে কর্পোরেশন অত্যন্ত সীমিত সাফল্য লাভ করলেও এর যৌক্তিকতা প্রমাণিত হবে।"

আমার বিশ্বাস এই ঘোষণায়, যার মধ্যে তাঁর দর্শনের মূল কথাটিও ব্যক্ত, আমরা পাই আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় সমাজতন্ত্রের ভিত্তি। এই কর্মসূচি পরীক্ষা করলে আমার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হবে যে, আধ্যাত্মিকতার পোশাকে মুড়ে তিনি যা বলেছেন তা মূলত আধুনিক ইউরোপ যাকে সমাজতন্ত্র বলে তা-ই। নতুন কর্পোরেশনের সামনে বাস্তব কর্মসূচি সম্পর্কে দেশবন্ধু কয়েক দফা প্রস্তাব রাখেন : অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিশুদ্ধতর এবং অধিকতর কম মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ, বস্তি এবং ঘনবসতি অঞ্চলে উন্নততর স্বাস্থ্যব্যবস্থা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান, অপেক্ষাকৃত কম খরচে অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতা।

পুনরায়, তাঁর নীতি এবং কর্মসূচিকে আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করতে গেলে আমি বলব যে, আধুনিক ইউরোপ যাকে সমাজতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদ বলে, এই নীতি এবং কর্মসূচিতে আমরা তার সমন্বয় পাই। এখানে আছে ন্যায়বিচার, সাম্য, প্রীতি, যা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি, এবং তার সঙ্গে মিশে আছে ফ্যাসিবাদের দক্ষতা এবং শৃঙ্খলা— বর্তমান ইউরোপে তা যে অবস্থায় আছে।

ভদ্রমহোদয়গণ, কর্পোরেশনের অপেক্ষাকৃত জরুরি কিছু সমস্যা— যথা শিক্ষা, বাসস্থান, রাস্তা, চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য, নিকাশি ব্যবস্থা এবং আলো সম্পর্কে এ-পর্যন্ত আমরা যে কাজ করতে পেরেছি, আমি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। আপনারা ধৈর্য ধরে শুনুন।

১৯২৩-২৪ সালে সামান্য কয়েকটি স্কুল নিয়ে শুরু করে ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর স্কুলের সংখ্যা হয়েছে ২১৮টি। এর মধ্যে ১৩৭টি ছেলেদের এবং ৮১টি মেয়েদের স্কুল। ১৯২৩-২৪ সালে কর্পোরেশন স্কুলের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৪৬৮, ১৯৩০ সালের ১ এপ্রিল এই সংখ্যা ছিল ২৬,৫৬০— যার মধ্যে ছেলে ১৫,৫৬২ জন এবং মেয়ে ১০,৯৯৮ জন। মোট ছাত্রের মধ্যে ৬,৮০৮ জন মুসলমান সম্প্রদায়ের। স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের সংখ্যা ১ লক্ষের কাছাকাছি এবং এর এক-চতুর্থাংশের কিছু বেশি শিশুর পড়ার ব্যবস্থা কর্পোরেশন করেছে।

১৯২৩-২৪ সালে শিক্ষা খাতে ব্যয় ছিল মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। ১৯২৯-৩০ সালে এটা হয় এক লক্ষের* সামান্য বেশি। কর্পোরেশন ৫টি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে ; আরও ২টি তৈরি হচ্ছে।

কলকাতায় স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সী শিশুদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বেচ্ছায় স্কুলে যাচ্ছে। অতএব আমি মনে করি, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় এসেছে। কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই ৯ নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে অবস্থা বিশেষরূপে অনুকূল, কাজ শুরু করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং বিষয়টি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায়।

১৯২৭ সাল থেকে শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ চালু হয়েছে এবং কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

একটি পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য কর্পোরেশন ১৯২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি একটি বিশেষ কমিটি নিয়োগ করেছিল। এই কমিটি ১২টি সভা করেছে এবং তিলজলায় ৪ নম্বর পুলের দক্ষিণে ৬০ ফুট সিউঅ্যার রোড-এর পাশে একটি স্থান নির্বাচন করেছে, প্রতিটি ব্লকে ৪টি সুইট সমন্বিত ৮টি ব্লকের একটি নমুনা অনুমোদন করেছে। জমির মূল্যসমেত প্রতিটি ব্লকের প্রাক্‌কলিত (estimated) মূল্য ধার্য হয়েছে ১৩,০০০ টাকা। কমিটি ৫২,০০০ টাকা খরচে এই প্রকার ৪টি ব্লক নির্মাণের সুপারিশ করেছে।

আরও বিবেচনার জন্য কর্পোরেশন ১৯২৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিষয়টিকে কমিটির কাছে ফেরত পাঠিয়েছিল।

কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত স্থানগুলি সুপারিশ করেছিল :

(ক) তিলজলায় ৬০ ফুট সিউ-অ্যার রোড-এর পাশে কর্পোরেশনের ২$\frac{১}{৪}$ বিঘা মাপের একখণ্ড জমি।

(খ) মোমিনপুর লেন ছাড়িয়ে ডালু সরকার লেনে-এর ৩$\frac{৩}{৪}$ বিঘা মাপের একখণ্ড জমি।

তিলজলার নির্বাচিত স্থানটি সম্পর্কে আগের নকশা সুপারিশের সময় বলা হয়েছিল যে, এই রকম দুইটি ব্লক অবিলম্বে নির্মাণ করতে হবে।

ডালু সরকার লেনের নির্বাচিত স্থানটি সম্পর্কে প্রতিটি ব্লকে ৪টি শোবার ঘর, ৪টি রান্নাঘর, দু দিকে একটি করে ঢাকা বারান্দা এবং আলাদা পায়খানা নিয়ে সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রস্তুত একটি নকশা অনুমোদিত হয়েছিল এবং কমিটি প্রতিটির জন্য ২৫০০০ টাকা অনুমিত খরচে এই রকম ৪টি ব্লক নির্মাণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিল। কমিটি আরও সুপারিশ করেছিল যে, এই পরিকল্পনা সফল প্রমাণিত হলে শ্রমিক এবং দরিদ্রতর শ্রেণীর জন্য বাসগৃহ নির্মাণের জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে।

এই রিপোর্টটি কর্পোরেশন ১৯৩০ সালের ১৫ জুলাই এই নির্দেশের সঙ্গে গ্রহণ করে যে, পরিকল্পনাটি পরের বছর কার্যকর করা হোক এবং পরের বছর বাজেটে যথোপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা রাখা হোক।

বিটুমিনের রাস্তার জন্য কর্পোরেশন বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা খরচ করে। এ ছাড়া রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্পোরেশন প্রতি বছর প্রায় ৭ থেকে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে। মোটর চলাচল বৃদ্ধির জন্য রাস্তা যথাযথ অবস্থায় রাখার সমস্যা ক্রমেই আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

* মনে হয়, এই সংখ্যাটি লিখতে ভুল হয়েছে—সম্পাদক।

নতুন কর্পোরেশনের জন্মের অনেক আগে একটি কর্পোরেশন কমিটি সমস্যাটি খতিয়ে দেখেছিল এবং যে সব রাস্তা কংক্রিটের ভিতের উপর পুনর্নির্মাণ করতে হবে, তার একটি তালিকা তৈরি করেছিল। সেই সময়ের মূল্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনাটির জন্য খরচ ধরা হয়েছিল ২১ লক্ষ টাকা। রাস্তা নির্মাণের কাজ ক্রমশই বিশেষজ্ঞনির্ভর হয়ে উঠছে এবং কর্পোরেশনকে অবিলম্বে এই সমস্যাটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

কর্পোরেশন চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের সুবিধা বাড়িয়ে যাচ্ছে। নতুন কর্পোরেশন যখন কাজ শুরু করে তখন কেবলমাত্র ৭টি কর্পোরেশন ডিসপেনসারি ছিল এবং ১৯২৩-২৪ সালে অনাথাশ্রমে অনুদান ; প্রসূতি এবং শিশুকল্যাণসহ চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্যের জন্য খরচের পরিমাণ ছিল ৩,৬০,০০০ টাকা। ১৯২৮-২৯ সালে খরচ হয়েছিল ৭,২০,০০০ টাকা এবং বর্তমান বছরের বাজেট বরাদ্দ ৮$\frac{3}{4}$ লক্ষ টাকা। বর্তমানে কর্পোরেশনের ১৩টি ডিসপেনসারি আছে, এর মধ্যে একটি ইউনানি ডিসপেনসারি এবং একটিতে কেবলমাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে হাসপাতালের জন্য অনুদান প্রায় ৪ লক্ষ টাকা, যেখানে ১৯২৩-২৪ সালে এই অঙ্ক ছিল মাত্র ১,১৮,০০০ টাকা।

উপছানো-জলাধার (spill reservoir) পরিকল্পনা, যার জন্য অনেক টাকা অপচয় হত, বাতিল করে এই কাজের জন্য নিয়োজিত স্পেশাল অফিসার ডঃ বি এন দে কর্তৃক প্রস্তুত দুটি পরিকল্পনা কর্পোরেশন গ্রহণ করেছে— একটি অভ্যন্তরীণ পয়োনালীর উন্নতির জন্য এবং অপরটি নতুন একটি জলনিকাশি ব্যবস্থার জন্য।

বর্তমান পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ভারসাম্য হারিয়েছে এবং এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং আলোচনায় যত সময় লেগেছে, সে কথা মনে রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিকল্পনাটিতে হাত দেওয়া জরুরি ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

পরবর্তী কয়েক বছর এটিই হবে কর্পোরেশনের প্রধান উদ্বেগের বিষয়।

এটা খুবই ভাল কথা যে, কর্পোরেশন সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংস, হগ স্ট্রিট বিল্ডিং এবং হগ মার্কেটে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটিও প্রস্তুত করেছেন স্পেশাল অফিসার। আমার ধারণা এর ফলে ইলেকট্রিক বিল বাবদ বছরে আমাদের ৭০,০০০ টাকা সাশ্রয় হবে।

অতএব কর্পোরেশনের সুবিধার জন্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পরিকল্পনাটি যাতে হাতে নেওয়া হয়, তা দেখতে হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, ১৯২৪ সাল থেকে নতুন কর্পোরেশন যে এই বিশাল শহরের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির কয়েকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েছে, আশা করি সামান্য এই কয়েকটি মন্তব্য থেকে তা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়েছে। যা সম্পন্ন করা হয়েছে তা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট এমন কথা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভাবি না বা বলি না। পক্ষান্তরে, আমি বিশ্বাস করি যে, রাস্তা, শিক্ষা, বাসস্থান এবং বিশেষ করে যে-সব এলাকা সংযুক্ত করা হয়েছে তার উন্নয়ন সম্পর্কে অনেক কিছু করা বাকি আছে। এবং এই সকল সমস্যার গুরুত্ব এবং গভীরতা আমরা যত বেশি উপলব্ধি করব, ততই গোটা শহরের পক্ষে তা আরও বেশি লাভজনক হবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, এই সভায় মাঝে-মাঝে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে যে, এই বিশাল শহরে নতুন কর্পোরেশনের হাতে কিছু কিছু সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। আমার মনে হয় এই ভীতির সমর্থনযোগ্য কোনও কারণ নেই। আমি বিশ্বাস করি যে, এই প্রশ্নে— এই বিশাল শহরে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হওয়ার প্রশ্নে—এই সভার সকল শ্রেণী একমত। এই সভার ইউরোপীয় সদস্যদের আমি বলতে পারি যে, আমাদের হাতে চৌরঙ্গির স্বার্থের হানি হবে না। চৌরঙ্গি অঞ্চলের এবং আহিরিটোলা অঞ্চলের মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য আছে তা আমরা জানি, তবে আমাদের আদর্শ চৌরঙ্গিকে আহিরিটোলার পর্যায়ে নামিয়ে আনা নয়, আহিরিটোলাকেই চৌরঙ্গির পর্যায়ে উন্নীত করা।

আমাদের মুসলমান বন্ধুরাও কখনও কখনও এই ভীতি পোষণ করেছেন যে, আমাদের সম্প্রদায়ের হাতে তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সভার এ দিকে বসে আছেন

আমার এমন কয়েকজন বন্ধুর কাছে আমার সম্পর্কে তাঁদের সহৃদয় মন্তব্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার বন্ধুদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের নিয়োগ ইত্যাদি দাবি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ ক'রে ১৯২৪ সালের ১৬ জুলাই আমি একটি বিবৃতি দিয়েছিলাম। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে সেই বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং আজ মেয়রের আসনে বসে আমি বলতে প্রস্তুত যে, সেই বিবৃতির প্রতিটি শব্দের প্রতি আমি এখনও অনুগত। আমি সেই বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত নীতির কতটা কার্যকর করতে পারব তা কেবল আমার উপরে নয়, এই সভার উপরেও নির্ভর করে। আমার তরফ থেকে এবং আমার বিশ্বাস, এই সভার কংগ্রেস দলের তরফ থেকেও বলতে পারি যে, এই শহরের নাগরিক জীবনের অঙ্গ প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হতে চাই।

গত জানুয়ারি মাসে কাউন্সিলাররূপে আমার পদত্যাগ সম্পর্কে এক বন্ধু একটি মন্তব্য করেছেন এবংসেই বন্ধুটি অনুগ্রহ করে "রাজনৈতিক অধৈর্য"-কে এর কারণ বলেছিলেন। তিনি অনুগ্রহ করে যে অসুখটির নাম "রাজনৈতিক অধৈর্য" দিয়েছেন সে রোগে আমি কখনও ভুগেছি বলে জানতাম না। রাজনৈতিক প্রশ্নে আমি দৃঢ় মত পোষণ করি এবং আমার বিশ্বাসে আমি আন্তরিক, কিন্তু সেই কারণে আমার এই সভার বন্ধু আমার কাজকে "রাজনৈতিক অধৈর্য" বলতে পারেন না। এই অভিযোগের জবাবে আমি শুধু এই কথা বলব যে, আমার পদত্যাগের সময়টুকুতে আমি যে এই সভা এবং আপনাদের থেকে দূরে ছিলাম এই ঘটনাই গত জানুয়ারি মাসে আমি কেন পদত্যাগ করেছিলাম তার কারণ হিসাবে যথেষ্ট।

আপনাদের মধ্যে ফিরে এসে আমি আনন্দিত। চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার এবং আপনাদের একজন কাউন্সিলাররূপে আমি আপনাদের মধ্যে ছিলাম এবং আজ আপনাদের পক্ষে যা সম্ভব অনুগ্রহ করে সেই সর্বোচ্চ সম্মানে আপনারা আমাকে ভূষিত করেছেন। এটা শুধু একটি আনন্দের উৎসই নয়, আপনাদের মধ্যে থাকা আমার কাছে এক সুযোগও বটে। আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি যে কাজ শুরু করেছিলেন আমি আশা করি আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতায় তা সাফল্যমণ্ডিত হবে।

কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে করদাতাদের প্রতিনিধি হিসাবে নাগরিক প্রশ্ন এবং নাগরিক স্বার্থের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা আমাদের কর্তব্য তা করতে আমরা সমর্থ নাও হতে পারি। সভার এই দিকের আমার কিছু বন্ধু সেই অভিযোগের জবাব দিয়েছেন। আমাদের মহান নেতার ভাষায় আমি আরও একবার শুধু এই কথা বলব যে, "জীবন এক সমগ্রতা"। আপনারা পৌরবিজ্ঞানকে রাজনীতি এবং অর্থনীতি থেকে আলাদা করতে পারেন না। এই সকল সমস্যা অবিচ্ছেদ্যরূপে একত্রগ্রথিত এবং জীবনের একটি ক্ষেত্রের স্বার্থ অন্যান্য ক্ষেত্রের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষ বিপ্লবের যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। হতে পারে এটা অহিংস বিপ্লব, এটা অহিংস বিপ্লবই, কিন্তু তবু এটা বিপ্লব। আমরা বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই, এবং আমার বক্তব্য হল আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, আমার মনে যে স্বপ্ন আছে তা হল বিশ্বজনীন ন্যায়বিচার, সাম্য এবং প্রেমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দলসহ এক স্বাধীন ভারতবর্ষের।

বন্ধুগণ, সমগ্র জাতি আজ এক নতুন ভারতবর্ষ সৃষ্টির কাজে লিপ্ত। কেউ কি গুরুত্বসহকারে এই মত পোষণ করতে পারেন যে, কলকাতার যৌথ জীবনকে সমগ্র জাতির জীবন থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়? আপনারা যদি ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা এবং প্রেমের ভিত্তির উপর জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠিত করতে চান, তবে কলকাতার যৌথ জীবনকে এই নীতির ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করা কি প্রয়োজন নয়? ব্রিটিশদের সঙ্গে আমাদের অপরিহার্য কোনও বিবাদ আছে বলে আমি মনে করি না। পৃথিবীটা আমাদের উভয়কে স্থান দেওয়ার মতো যথেষ্ট বড়। আমরা স্বাধীন মানুষ এবং বন্ধুর মতো বাঁচতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, অন্তরের অন্তস্থলে তাঁরাও আমাদের ইচ্ছার আন্তরিকতা উপলব্ধি করেন। আমরা

সেই দিনটি আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা করছি, যে-দিন ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবে এবং পৃথিবীর সর্বত্র আসবে শান্তি। আমরা শুধু এই বলছি যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র শান্তি আনা সম্ভব নয়।

কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে

শ্যামবাজারে বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেটের এক সভায় প্রদত্ত ভাষণ
১৯ অক্টোবর, ১৯৩০

এই সভায় আমন্ত্রণ জানাবার এবং আমার প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ এই সভার সামনে আপনাদের সমস্যা তুলে ধরতে গিয়ে প্রথমে রায় ললিতকুমার মিত্রের নাম উল্লেখ করে ভাল করেছেন। তাঁর মৃত্যু শুধু বাস সিন্ডিকেটেরই নয়, কর্পোরেশন এবং জনসাধারণের মনেও গভীর আঘাত দিয়েছে। ১৯২৪ সালে আমি বলেছিলাম যে, ললিতবাবুর মতো শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত যুবকের সেবায় দেশ অত্যন্ত লাভবান হবে। কলকাতা কর্পোরেশনে কার্যকালে কাউন্সিলার হিসাবে তাঁর যোগ্যতা উত্তমরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এই শহরের অধিবাসীবৃন্দ তাঁর কাছে ঋণী।

এর পরে সচিবের নামের উল্লেখও সম্পূর্ণরূপে যথাযথ হয়েছে। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হল আমরা শক্তভাবে একটি জিনিসে লেগে থাকতে পারি না। দেশের কোনও একটি সমস্যা নিয়ে আমরা অবিচলিতভাবে লেগে থাকতে পারলে শেষ পর্যন্ত সাফল্য অবশ্যই আসবে।

আপনারা আজ আমার সামনে অনেকগুলি সমস্যা উপস্থিত করেছেন এবং জানি না আমার উত্তর আপনাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা। আমরা এখন পর্যন্ত শহরের পরিবহণ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিবহণমন্ত্রক থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে তা নেই, এবং সেই কারণেই পুলিশের হাতে এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। আশা করি আমরা যখন ক্ষমতা অর্জন করব তখন পরিবহণমন্ত্রকের সঙ্গে এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে পারব।

আপনারা বলছেন কর্পোরেশনের ক্ষমতা আছে। আমিও বলছি, হ্যাঁ, তার ক্ষমতা আছে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না তা আমি জানি না। যে সামান্য পরিমাণ ক্ষমতা আছে তাও ব্যবহার করা হয়নি। যখন নতুন রাস্তার প্রস্তাব করা হয় অথবা নতুন রাস্তা খোলা হয়, তখন কর্পোরেশনের ওয়ার্কস কমিটিকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ সাব-কমিটির জন্য আপনাদের প্রস্তাব সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, বিভিন্ন বিভাগে কাজের জন্য কর্পোরেশনের বর্তমান সাব-কমিটির মতো পরিবহণের জন্যও একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করা যেতে পারে। আমাদের আইন লঙ্ঘিত না হলে বর্তমান ওয়ার্কস কমিটিতে বাস সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিদের নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই রকম প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা না গেলে একটি বিশেষ সাব-কমিটি তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে তাঁদের প্রবেশাধিকার থাকবে।

লাইসেন্সিং বোর্ড সম্পর্কে কর্পোরেশনের কিছুই করণীয় নেই, এটা সম্পূর্ণরূপে সরকারের ব্যাপার। আমরা শুধু প্রস্তাব করতে পারি, কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে কিনা তা সরকারের উপর নির্ভর করে।

আপনারা একচেটিয়া অধিকারের কথা বলেছেন। আমরা কখনও কাউকে একচেটিয়া অধিকার মঞ্জুর করতে চাইনি। যত দিন একচেটিয়া ব্যবসা ছিল, তত দিন ট্রাম কোম্পানি

ভাড়া কমায়নি ; কিন্তু বাস কোম্পানি দেখা দিতেই সেই একচেটিয়া ব্যবসা শেষ হয়েছে।

আপনারা শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো সরাবার প্রস্তাব করেছিলেন। যদি পারি আমরা তা করব।

পানীয় জলের সুবিধা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ১৯২৪ সালে আমি যখন কর্পোরেশনে ছিলাম, তখন আমি রাস্তার ধারে ধারে বিশ্রামশালার প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়েছিল। কয়েক জায়গায় দু-একটি বিশ্রামশালাও তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তার পরে পরিকল্পনাটি বিফল হয়। কেউ আমাদের একটি পরিকল্পনা দিলে তা অত্যন্ত সমাদৃত হবে।

ট্রামওয়েজ কোম্পানির উপর বর্তমানে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। গত জুন মাসে একটা সুযোগ পেয়েছিলাম, কিন্তু তা আমরা হারিয়েছি। এখন আমাদের আরও সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য শীঘ্রই নতুন একটি চুক্তি করা হবে, তখন আমি দেখব যাতে পক্ষপাতিত্ব না হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই। আপনারা ক্ষমতায় এলে অন্যরা আপনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করবে। অতএব আপনাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে যাতে দলীয় রাজনীতি ঢুকে আপনাদের আত্মবিস্মৃত না করে। দ্বিতীয়ত, যদি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ জীবন কামনা করেন, তবে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে কখনও যাতে বিবাদ দেখা না দেয় সে সম্পর্কে আপনাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে শ্রমিকদের সব রকম সুবিধা দিতে হবে, কারণ তাঁদের সন্তুষ্টি মালিকের লাভ।

স্বদেশীর সমর্থনে

১৯৩০ সালের ২৫ নভেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে বিবৃতি

পাবনায় সাম্প্রতিক সফরের সময় সেখানকার হোসিয়ারি শিল্পের অবস্থা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল এবং সেখানে আমি যে-সব তথ্য আবিষ্কার করেছিলাম, যে-কোনও দেশপ্রেমী ভারতীয়কে আতঙ্কিত করার পক্ষে তা যথেষ্ট। বর্তমানে যে-সব কারখানা চালু আছে তার সবগুলিই আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করেছিলাম এবং সেই সব কারখানার ম্যানেজার এবং মালিকদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।

আমি যে বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিলাম তা এই যে, বর্জন সত্ত্বেও ১৯৩০ সালে সমস্ত কারখানার অবস্থা ক্রমবর্ধিতভাবে আরও খারাপ হয়। পাবনার হোসিয়ারি দ্রব্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং তার ফলে প্রত্যেক কারখানার স্বাভাবিক উৎপাদন হ্রাস করা হয়। অনেক মেশিন বেকার হয়ে পড়েছিল, কাজের সময় সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল, ন'টি কারখানার মধ্যে দুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েকটির অবস্থা ছিল শোচনীয়।

আমি যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তা থেকে দেখেছিলাম যে, এই অবস্থার জন্য দুটি কারণ দায়ী। প্রথমত, বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য সমগ্র বাংলায় এবং বিশেষ করে উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গে পাবনার হোসিয়ারি দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জাপানি প্রতিযোগিতা গুরুতর ভীতির কারণ হয়ে পড়েছিল এবং সস্তা জাপানি হোসিয়ারি দ্রব্যে ভারতীয় বাজার ভেসে গিয়েছিল। অধিকন্তু, বিদেশী হোসিয়ারি কারখানা এবং পাবনার বাইরে ভারতীয় কারখানাগুলিও পাবনার কারখানাগুলির ছাপ কাজে লাগাতে শুরু করেছিল এবং নিজেদের তৈরি পণ্যে ''Pabna Finished'', ''Pabna Quality'' ইত্যাদির ছাপ মারছিল।

আমার কাছে সমস্ত কারখানার কর্তৃপক্ষকেই দেশপ্রেমী মনে হয়েছিল এবং তাঁরা বিদেশী হোসিয়ারি সুতো পুরোপুরি বর্জন করে নিজেদের পণ্যকে বিশুদ্ধ স্বদেশী পণ্য করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে স্বদেশী সুতো পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের বিপদ বাড়াতে বাজারে যেমন মেলে তেমন স্বদেশী সুতো এবং রঙে প্রস্তুত পণ্য ভারতীয় ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের পছন্দ হয়নি এবং অবিরাম চাহিদা ছিল বিদেশী সুতোয় প্রস্তুত হোসিয়ারির। নিজেদের রুচি পরিবর্তন করে স্বদেশী হোসিয়ারিকে উৎসাহ দেওয়া ভারতীয় জনগণের পক্ষে জরুরি প্রয়োজন। আমি দেখলাম, জনগণের বর্তমান রুচি অব্যাহত থাকলে পাবনার হোসিয়ারি কারখানাগুলির সামনে দুটি ছাড়া পথ নেই। বিদেশী সুতো ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিলে ক্রমে ক্রমে কারখানা বন্ধ করে দিতে হবে অথবা হোসিয়ারি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বিদেশী সুতো ব্যবহার করতে হবে।

এটা সত্য যে, বর্তমানে এ দেশে যে ভারতীয় সুতো পাওয়া যায় তাতে প্রস্তুত হোসিয়ারি দ্রব্য বিদেশী সুতোয় প্রস্তুত হোসিয়ারি দ্রব্যের সৌষ্ঠবের তুলনায় কিছুটা নিকৃষ্ট, কিন্তু বিশুদ্ধ স্বদেশী দ্রব্য মানের দিক থেকে নিকৃষ্ট নয়। অতএব ভারতীয় জনসাধারণ যদি বিদেশী সুতোয় প্রস্তুত হোসিয়ারি দ্রব্যের চেয়ে সৌষ্ঠবের দিক থেকে সামান্য নিকৃষ্ট বিশুদ্ধ স্বদেশী সুতোয় প্রস্তুত হোসিয়ারি দ্রব্য পছন্দ করেন, তা হলে সমস্ত কারখানাই অবিলম্বে বিদেশী সুতোর ব্যবহার একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতীয় উপভোক্তাদের সামনে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত করলে তাঁরা অন্য যে কোনও পণ্য অপেক্ষা বিশুদ্ধ স্বদেশী হোসিয়ারি দ্রব্য পছন্দ করবেন, এমন কি তার সৌষ্ঠব বিদেশী সুতোয় প্রস্তুত হোসিয়ারি দ্রব্যের তুলনায় কিছুটা নিকৃষ্ট হলেও।

এই প্রসঙ্গে বর্তমানে হোসিয়ারি সুতোর যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি আমি ভারতীয় বয়ন কারখানাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আরও বেশি সংখ্যক কারখানায় ১৮ থেকে ২২ কাউন্টের হোসিয়ারি সুতো তৈরি শুরু করতে আর বিলম্ব করা চলবে না, এবং আমি নিশ্চিত যে, এটা করলে তাঁরা তৈরি বাজার পেয়ে যাবেন।

বর্তমানে পাবনায় ন'টি হোসিয়ারি কারখানা আছে, যার মধ্যে দুটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং শিল্পটি বাংলার গঠনমূলক প্রতিভার সুনাম বহন করে।

জনগণ দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে অপেক্ষাকৃত কম সৌষ্ঠবের 'বঙ্গলক্ষ্মী' কাপড় কিনে আসছেন এবং আমার সন্দেহ নেই যে, অবস্থাটা একবার ব্যাখ্যা করলে বর্তমান ক্ষেত্রেও তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সৌষ্ঠবের বিশুদ্ধ স্বদেশী 'পাবনা হোসিয়ারি দ্রব্য' সানন্দে কিনবেন। আমি এ বিষয়েও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, পাবনার অধিকাংশ কারখানাগুলিই অর্থ এবং ব্যাঙ্কের সুবিধার অভাবে ভুগছে। আরও একটু ভাল ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা পেলে তাঁরা সহজেই শিল্পের প্রসার ঘটাতে পারেন এবং এই উপায়ে উৎপাদন বাড়াতে এবং উৎপাদনের খরচ কমাতে পারেন।

কংগ্রেসের কর্মসূচি এবং যুবসমাজ

মেয়র এবং প্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতারূপে ভাষণ, ১১ ডিসেম্বর ১৯৩০

আমি আন্তরিকভাবে গত সোমবারের ঘটনাবলীর নিন্দা করছি এবং করছি এই কারণে যে, এগুলি এই দেশের তরুণ প্রজন্মের শতকরা একশো ভাগকে প্রভাবিত করতে কংগ্রেসের কর্মসূচির এবং কংগ্রেসের নেতাদেরও সাময়িক ব্যর্থতার স্বীকৃতি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের আবেগ শান্ত হলে যে ঘটনাবলী আমাদের সকলকে রূঢ় আঘাত দিয়েছে, প্রথম সুযোগেই তার গভীরতর কারণগুলি অনুসন্ধান করব। এই সব ঘটনার জন্য দায়ী যুবকদের শুধু "ভ্রান্ত পথে পরিচালিত" বললেই হবে না। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা চায় এবং অত্যন্ত শীঘ্র স্বাধীনতা চায় এটা স্পষ্ট। এটাও স্পষ্ট যে, এমন লোক আছেন, (তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন), যাঁরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের কর্মসূচি অনুসরণ করেই স্বাধীনতা চান না, প্রয়োজন হলে যে কোনও মূল্যে এবং যে কোনও উপায়ে স্বাধীনতা চান।

কংগ্রেস দলের ভূমিকা সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের নীতি এবং কর্মসূচি তারা বার বার পরিষ্কার করে বলেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী জানে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ; কিন্তু তবে কেন আমরা মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ কর্মী পর্যন্ত সমগ্র দেশের কংগ্রেস নেতাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এত দিন পর্যন্ত সমগ্র তরুণতর প্রজন্মের মন এবং বিচারবুদ্ধিকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছি ? আমরা ব্যর্থ হয়েছি তার কারণ কংগ্রেসের কর্মসূচি এত দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের সাফল্যদ্বারা প্রমাণ করতে না পারি যে, কংগ্রেসের কর্মসূচিই একমাত্র কর্মসূচি যা দেশের গ্রহণ এবং অনুসরণ করা উচিত, ততক্ষণ পর্যন্ত জনগণের শতকরা একশো জনকে আমাদের নীতিতে কী করে দীক্ষিত করা সম্ভব আমি জানি না।

আরও একটি কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই। আমি চাই গত দু' বছরে সরকারের গৃহীত পন্থা আমাদের দেশবাসীর মনে স্বাস্থ্যের কোনও প্রভাব বিস্তার করেছে কি না তা আপনারা বিবেচনা করে দেখুন। সরকার বিভিন্ন যে সব অর্ডিন্যান্স জারি করেছে, আমি তার উল্লেখ করছি। আমি যখন কারাগারে ছিলাম তখন সরকারের কিছু দায়িত্বশীল কর্মচারীর সঙ্গে আমার খোলাখুলি কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, এবং তাঁদের কাছে পরিষ্কার করে বলেছিলাম যে, যদি একের পর এক এই সব অর্ডিন্যান্স জারি হয়, যদি জনসভা এবং মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়, যদি প্রেস অর্ডিন্যান্সের মতো অর্ডিন্যান্স আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এর দ্বারা প্রকাশিত কাজকর্মের পথ রুদ্ধ করে দেওয় হয়, তা হলে কংগ্রেসের কর্মসূচিই যে একমাত্র কার্যকর কর্মসূচি, কংগ্রেসের নেতারা তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন ; এই সব অর্ডিন্যান্সের একমাত্র ফল হবে আন্দোলনকে গোপন পথে ঠেলে দেওয়া— স্বাধীনতার স্পৃহাকে ধ্বংস করা নয়, কারণ তা অসম্ভব। আমি দুঃখিত যে, আমার চরম আশঙ্কাই আজ কিছুটা যথার্থ বলে মনে হচ্ছে। আমি প্রত্যেককেই— আমার দেশবাসী হোক অথবা ইংরেজ— আশ্বাস দিতে পারি যে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষ অহিংসার পথকেই অনুসরণযোগ্য সর্বোত্তম এবং সহজতম পন্থারূপে বেছে নিয়েছে। আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, সাময়িক ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের দেশবাসী এই পথ আঁকড়ে থাকবেন এবং এই পথ অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবেন। কিন্তু যত দিন সেই লক্ষ্য অর্জিত না হয়, আমি আশা করি, শুধু প্রস্তাব পাস করে, নিন্দা করে অথবা যুবকদের "ভ্রান্ত পথে পরিচালিত" আখ্যা দিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে একই সময়ে আমরা এই সব দুঃখজনক ঘটনার জন্য দায়ী গভীরতর মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি অনুসন্ধান করব।

অনেক বন্ধুত্বের প্রথম সূত্র

কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভাষণ, শুক্রবার, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩০

ইতিহাসের মহত্তম ধর্মপ্রচারক-নৃপতি অশোকের পাশ্চাত্য বিশ্বে ভারতের ধর্মের অনুপ্রেরণাময় বাণী প্রেরণের পরে বাইশটি শতক অতিক্রান্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে ভাবনার স্রোত খাত পরিবর্তন করেছে। অতঃপর যখন প্রাচ্যের একটি ধর্মের প্রচারকরা প্রতীচী থেকে চিন্তার বাণীর সঙ্গে বৌদ্ধিক মুক্তির বার্তাও নিয়ে এলেন, তখন আমাদের এই প্রাচীন দেশে এক নব জাগরণের যুগ দেখা দিল, এক অনুসন্ধিৎসার উদ্দীপনা আমাদের বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত হল এবং আমাদের মনকে সঞ্জীবিত করল। আজ সেই জাগরণের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

সেই জাগরণে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁরা আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের যোগ্য। চিন্তার জগতে আমরা বিপ্লবের সন্তান। শিক্ষার যে বর্তিকা তাঁরা প্রজ্বলিত করেছিলেন আজ তা পূর্ণতর দীপ্তিতে ভাস্বর ; এখন আমরা বর্ধিত স্বাচ্ছন্দ্য এবং সাফল্যের সঙ্গে, কেবলমাত্র প্রকৃতির রহস্যই নয়, আমাদের নিজেদের মনের গভীর প্রদেশও দেখতে, অনুভব করতে এবং জানতে পারি, এবং সর্বোপরি আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পূর্ণতররূপে উপলব্ধি করতে পারি।

এই কলেজের শিক্ষা আমাদের মনে যে নিশ্চিত ছাপ রেখেছে এবং বন্ধুত্বের যে অদৃশ্য বন্ধন আমাদের সকলকে সহানুভূতি এবং প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছে, বিবিধ কর্মে নিয়োজিত আমরা সচেতন অবস্থায় অথবা অবচেতন মনে আমাদের প্রতিটি কর্মে সকলেই তা অনুভব করি। আমাদের জীবনকে অদ্যাবধি যা সমুজ্জ্বল করে রেখেছে এমন অনেক বন্ধুত্বের প্রথম সূত্র এখানেই গ্রথিত হয়েছিল।

আমাদের কলেজ আনন্দে তার শততম বর্ষ পূর্ণ করেছে। এমন একটি উপলক্ষে তাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আমাদের নিজেদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি ; কারণ আমরা ভুলতে পারি না যে, আমরা এই কলেজ এবং এই কলেজ আমরা। আমরা প্রার্থনা করি এই কলেজের জীবনের দ্বিতীয় শতবার্ষিকী যেন প্রথম শতবার্ষিকী অপেক্ষাও উজ্জ্বল হয়।

মওলানা মহম্মদ আলির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে কর্পোরেশনের সভায় প্রেরিত বার্তা
বুধবার, ৭ জানুয়ারি ১৯৩১

পূর্বনির্ধারিত এক কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার আমি শহরের বাইরে থাকব এবং সেই কারণে কর্পোরেশনের সভায় উপস্থিত থাকতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। এই জন্য মওলানা মহম্মদ আলির স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে এই কয়েকটি ছত্র পাঠাচ্ছি। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বোঝাপড়া আনবার প্রচেষ্টার মধ্যে ইংল্যান্ডে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সত্যই দুঃখজনক এবং তাঁর মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হল তা সত্যই অপরিসীম। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর মতো যে বিবৃতি দিয়েছিলেন আজ তা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন— হয় তিনি সঙ্গে করে ভারতবর্ষে স্বরাজ নিয়ে আসবেন, নয় ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করবেন। মওলানা মহম্মদ আলির মধ্যে আমরা এমন এক মহদন্তকরণ, দুর্লভসাহস দেশভক্তকে হারিয়েছি যিনি দুই দশকের বেশি সময় ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ছিলেন এবং তার জন্য অসীম দুঃখ

ভোগ করেছেন। 'কমরেড' সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ এবং সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চে তাঁর বিস্ময়কর প্রভাব, পরে মুসলিম লিগের এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, যুদ্ধের সময় তুরস্কের স্বার্থ-সমর্থনে তাঁর প্রচার, তাঁর অন্তরণ এবং পরবর্তীকালে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত এবং এ সম্পর্কে আমার বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। মওলানা মহম্মদ আলির কার্যকলাপ কেবলমাত্র তাঁর মাতৃভূমির উন্নতির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল আরও এক বিস্তৃততর দিগন্তে। তাঁর জীবনের স্বপ্ন ছিল এক বিশ্ব-এশীয় যুক্তরাষ্ট্র। এটা সত্যিই এক দুঃখজনক ঘটনা যে, মওলানা মহম্মদ আলির মতো এক প্রবল ব্যক্তিত্বের, যিনি ভবিষ্যতে প্রশস্ততর সময়ে মহত্তর ভূমিকা পালন করতেন, এমন সময়ে জীবনাবসান হল যাকে অন্যান্য দেশের জননেতাদের ক্ষেত্রে জীবনের প্রারম্ভ বলে মনে করা হত। এটা ভারতবর্ষের লোকহিতকর জীবনের দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে একটি, এবং অপরিণত বয়সে মওলানা মহম্মদ আলির মৃত্যু এর আরও একটি দৃষ্টান্ত।

পরলোকগত মওলানার সঙ্গে যে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য হয়েছিল, এই ঘটনা আমি সগর্বে স্মরণ করি। সেই জন্য তাঁর মৃত্যু আমার কাছে এক ব্যক্তিগত ক্ষতি। তবু সত্যের খাতিরে আমি বলব যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে একমত ছিলাম না। অবশ্য আজ এটা তুচ্ছ ব্যাপার, কারণ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, জনগণের মঙ্গল সাধনের বাসনাই তাঁর একমাত্র অনুপ্রেরণা, এমন কি যে ক্ষেত্রে জনগণ তাঁর সঙ্গে একমত হয়নি সে ক্ষেত্রেও।

মওলানা মহম্মদ আলি অপেক্ষাকৃত কম বয়সে পরলোক গমন করলেও তিনি তাঁর পিছনে রেখে গেছেন জনসেবার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, যা তাঁর দেশবাসীর অন্তরে চিরকাল তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখবে এবং তাঁর জীবন এবং দৃষ্টান্ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

মিঃ রজ্জাক যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে মিসেস মহম্মদ আলি, মিঃ শওকত আলি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই মহান আত্মা শান্তিলাভ করুক।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

আংশিক মার্জনা নিষ্ফল অপেক্ষাও ন্যূন

মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদান-বিষয়ে ভাইসরয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং মেয়র হিসাবে বিবৃতি

২৫ জানুয়ারি, ১৯৩১

যে উদার অভিপ্রায় ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের মুক্তি দিতে হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর জেনারেলকে প্রেরণা দিয়েছে, সে সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হব। কিন্তু আমি আশা করি তিনি যে কাজ শুরু করেছেন, যুক্তিসম্মতরূপে তা সমাপ্ত করার সাহস তাঁর থাকবে।

আমি ধরে নিচ্ছি মুক্তি পাওয়ার পরে ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম সুযোগেই মিলিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। ওয়ার্কিং কমিটি যদি প্রস্তাব বিবেচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই কারণে আলোচনা করতে চায়, তা হলে তখন হিজ এক্সেলেন্সির সাধারণ মার্জনা প্রদর্শনের প্রয়োজন হবে।

অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটি যদি প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তা হলে সরকার মার্জনা

প্রদর্শন সম্পর্কে আর অগ্রসর হবে এমন আশা করব না। ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ সদস্যের ছোট একটি সংগঠন এবং এর চেয়ে বড় সংগঠন ৩৫০ সদস্যের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নজরে না এনে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রশ্নটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে আবার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে হতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নন এমন অনেক উল্লেখযোগ্য কংগ্রেসকর্মী এখন কারাগারে। আমার আশঙ্কা তাঁদের সকলকে মুক্তি না দিলে কংগ্রেসের পক্ষে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না।

অধিকন্তু, আলোচনা যখন চলবে তখন দেশে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকা উচিত এবং এই কারণে আলোচনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা উচিত। কারণ, দেশ জুড়ে নিপীড়ন চলতে থাকলে সমস্ত আলোচনা অথবা আপসের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

আমি ইচ্ছা করেই প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের সারবত্তা নিয়ে আমার মতামত এবং প্রকৃত মার্জনা সম্পর্কে আমার ধারণার বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশে বিরত থেকেছি। এই দুটি বিষয়ে ইতিমধ্যেই আমি বিবৃতি দিয়েছি, যা গত কালের কলকাতার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেই বিবৃতিতে আমি যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। আমি কেবল এইটুকু যোগ করব যে, হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর জেনারেল যদি আপস-প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দেন, তবে যে-কাজ তিনি শুরু করেছেন সাহসের সঙ্গে তা সমাপ্ত করতে হবে এবং আমি যেমন বলেছি তেমন ব্যাপক মার্জনা ঘোষণা করতে হবে।

রাজবন্দীদের অপরাধ মার্জনার প্রশ্ন

১৯৩১ সালের ২৫ জানুয়ারি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তিলাভের পর মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে প্রস্তাব করেছেন তাতে এমন কিছু নেই যাতে ভারতবাসী উৎসাহ বোধ করবেন। প্রস্তাবটি যে আকারে উপস্থাপিত, তাতে আমাদের স্বাধীনতা দেবার কথা নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অন্যান্য পরাধীন দেশের মতো সমভাবে যে চূড়ান্ত স্বাধীনতা ভারতবর্ষ কামনা করে, এমন কি তার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকারের কথাও এই প্রস্তাবে নেই। বাংলাদেশের মনোভাব যদি আমি ঠিকমত বুঝে থাকি তা হলে বলব এ রকম অসম্পূর্ণ এবং অসন্তোষজনক প্রস্তাব বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং আমার বিশ্বাস আমার কাছে বাংলাদেশের মনোভাব হিসাবে যা প্রতিভাত, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মনোভাবও সেই রকম।

নিজের দিক থেকে বলতে পারি ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সব সময়েই দ্ব্যর্থহীন। সর্বদা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছি যে পূর্ণ এবং সার্বিক স্বাধীনতা কেবলমাত্র ভারতীয়দের মঙ্গলের জন্য নয়, ইংরেজদের নিজেদের স্বার্থে এবং পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্যও দরকার। যাই ঘটুক না কেন, ভারতীয় এবং ইংরেজদের মধ্যে কোনও যথার্থ বিবাদ থাকার কথা নয়। ব্রিটেনে ইংরাজরা যে সব অধিকার ভোগ করে থাকে যে মুহূর্তে নিজের দেশে ভারতীয়রা তা লাভ করবে, তখন ভারত ও ইংল্যান্ড উভয়ে বন্ধু হতে পারে এবং হবেও। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে বা কার্যত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীনতালাভ সম্ভব নয়। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতার আদর্শের পক্ষে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এবং এই বিশ্বাসে যে আমি

বাংলাদেশের মনোভাব ব্যক্ত করছি। বলা বাহুল্য, কলকাতা কংগ্রেসে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছিল। কিন্তু এর এক বছর পরে লাহোর কংগ্রেসে সেই একই আদর্শ গৃহীত হয় ; এবং কলকাতায় যাঁরা এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁরাই সেটি গ্রহণ করেন। বুঝতে পারছি না এই মুহূর্তে কীভাবে এই প্রস্তাবটিকে এক সম্মানজনক নিষ্পত্তির প্রারম্ভ হিসাবে গ্রহণ করতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে বলা হচ্ছে।

আশা করি আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমি কোনও সম্মানজনক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে নই ; পক্ষান্তরে মনে করি, এ-রকম নিষ্পত্তি যাতে হয় সেজন্য সাধ্যমতো সব কিছু খুঁজে দেখা উচিত। কিন্তু নিষ্পত্তির জন্য সব রকম আলোচনার পূর্বে দরকার হৃদয়ের সত্যকার পরিবর্তন। আলোচনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজবন্দীদের মার্জনার কথা ঘোষণা ছাড়া অন্য আর কিছুতে এমন পরিবর্তনের চিহ্ন ধরা পড়বে না। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে এবং এই জাতীয় অন্য রেগুলেশনে আটক বন্দী এবং সমস্ত রাজবন্দীদের (তারা হিংসামূলক বা অহিংস অপরাধ, যার জন্য দণ্ডিত হোক না কেন) জন্য অপরাধ মার্জনার কথা বলতে হবে। হিংসামূলক কাজের জন্য দণ্ডিত বিপ্লবীদের মার্জনা প্রসঙ্গে বলতে পারি, আমরা যতই উগ্রতা এবং হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করি না কেন, সেই সঙ্গে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে যারা দুর্ভাগ্যক্রমে এই পন্থা অনুসরণ করেছিল, তারা তা করেছিল এই বিশ্বাসে যে নিজেদের ধ্যানধারণা মতো পথে তারা দেশসেবা করছে। ফলত ১৯২১ সালের আইরিশ নজির এবং অন্যান্য ঘটনার মধ্যে Commandant Seon Mekeon-এর কথা মনে রেখে এদের ক্ষেত্রেও মার্জনা করা উচিত। আরও একটি কথা বলতে চাই। মার্জনা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে চালু মামলাগুলি প্রত্যাহার করা উচিত।

মার্জনা ঘোষণার সময় শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে যারা এখন কারাবন্দী, তাদের কথা যে মনে পড়বে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সেজন্য তাদের বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ; কারণ ভারতের মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকদের একটি নিজস্ব ভূমিকা আছে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাটিও প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। বন্দীদের অপরাধ মার্জনার প্রশ্নটি যদি যথার্থ অর্থে বিবেচনা করা না হয়, তা হলে মনে হয় কোনরূপ আপস ফলপ্রসূ হবে না।

স্বাধীনতা লাভের পথ

বোম্বাই যাত্রার পূর্বে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৫ মার্চ ১৯৩১

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীনতালাভের কথা বলব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ বা দ্বিধা নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এমন কয়েকটি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি যা, আমার বিবেচনায়, আমাদের অভীষ্ট স্বাধীনতালাভে আদৌ সহায়তা করবে না। সমস্যা হল, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারি তার জন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। পূর্বেই বলেছি, কী কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারিনি।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে এবং তাঁর কাছ থেকে জানতে আমি বোম্বাই যাচ্ছি। এর পরে আমার কি করা উচিত তা স্থির করতে পারব এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সত্যকার মঙ্গলসাধনের জন্য কি পন্থা গ্রহণ করা উচিত তা দেশবাসীকে জানাতে পারব।

সকল শ্রেণীর বন্দীদের অপরাধ মার্জনার জন্য দাবি

মহাত্মাজীর সঙ্গে দিল্লী পৌঁছানোর পর বিবৃতি, ২০ মার্চ ১৯৩১

বোম্বাই-এ এবং দিল্লী আসার পথে একটানা কয়েক ঘন্টা মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কলকাতা না পৌঁছানো পর্যন্ত চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আমার মনোভাব এই মুহূর্তে জানানো সম্ভব নয়। প্রধান অভিযোগের যেটি হুল ফোটার মতো বাংলার মন বিদ্ধ করছে তা দেশবাসীর গোচরে আনতে চাই। কংগ্রেস দলকে যে অপরাধ-মার্জনা করা হয়েছে তার মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক রাজবন্দীদের, সংখ্যায় প্রায় ৮০০ এবং যাঁরা কোনও ব্যক্তিস্বার্থ বা তুচ্ছ কারণে নয়, দেশের মুক্তির জন্যই যন্ত্রণা ভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন, ধরা হয়নি। এ কথা কেউ উপেক্ষা করতে পারবেন না যে এঁদের কর্মপন্থার প্রতি সায় না থাকলেও, কষ্টভোগ এবং ত্যাগ স্বীকারের জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এঁদের প্রতি ভীষণভাবে সহানুভূতিশীল। ফলে সকল প্রকার রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষে প্রযোজ্য একটি সাধারণ মার্জনানীতি গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত চুক্তির শর্তাবলীর অনুকূলে বাংলার সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না। অবিলম্বে না হোক, অন্ততপক্ষে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্বে এই মার্জনা-নীতি কার্যকর হওয়া উচিত। বাংলাই একমাত্র প্রদেশ নয় যা এহেন অভিযোগের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছে। আরও অনেক প্রদেশে, যেমন পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশ, মার্জনানীতি আংশিকভাবে চালু হয়েছে। লোকের মনে অসন্তোষ এবং বিরুদ্ধতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই কারণে যে, অনেক প্রদেশে স্থানীয় সরকার গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্তাবলীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুসারে বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছেন না। ফলে আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিভিন্ন রাজদ্রোহমূলক মামলায় জড়িত বেশ কিছু সংখ্যক বন্দী আজও জেলে আটক রয়েছেন। এই চুক্তির ফলে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে ধরপাকড় করা হয়েছে। বাংলাদেশে সতীন সেনের মতো বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি। মধ্যপ্রদেশে নাগপুরের মিঃ আভারি ও বেতুল ও মান্দলা বন-সত্যাগ্রহী এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে Mr. Rajah এবং Mr. Jani-র মতো সিডিশান বন্দীরা এখনও কারাগারে। পাঞ্জাবের তালিকাটি আরও দীর্ঘ। এবং যুক্তপ্রদেশে কাকোরি ষড়যন্ত্রের বন্দীদের কথা আমরা ভুলতে পারি না।

বাংলাদেশে এখনও মুক্তিলাভ করেনি এমন বন্দীর সংখ্যা হল ৮০০ এবং বিনাবিচারে আটক ডেটিনিউ হলেন প্রায় ৪৫০। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ময়মনসিংহ মামলা, ঢাকা তার-কাটা (Wire Cutting) মামলা, মুন্সীগঞ্জ ডাকঘর লুঠ মামলা, রাজশাহী মেল ডাকাতি মামলা, বরিশাল ডাকাতি মামলা এবং এ ধরনের ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা হল একশো'রও বেশি। এ ছাড়া আছেন প্রায় একশো আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য দণ্ডিত এবং সিডিশন বন্দী ; তাঁরাও এখনও মুক্তি পাননি। দণ্ডিত বিপ্লবীদের সংখ্যা হল প্রায় একশো ; এঁদের মধ্যে আছেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ডাঃ নারায়ণ রায়। ময়মনসিংহ Ware House মামলা এবং ভবানীপুর Rioting মামলার মতো আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা হিংসাত্মক কাজের (technical violence) জন্য দণ্ডভোগ করছেন এমন মানুষের সংখ্যা হল প্রায় ৫০। এঁদের মধ্যে একজন হলেন বাবা গুরুদিৎ সিং। লিলুয়া ধর্মঘট এবং এ জাতীয় অন্য ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে দণ্ডিতের সংখ্যা হল প্রায় ২৫। এঁদের মধ্যে আছেন লিলুয়ার শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডল এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মদনমোহন বর্মণ। পর্যায়ক্রমে সবশেষে আছেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁরা এখনও মুক্তিলাভ করেননি, তাঁদের মোট সংখ্যা ৮০০। ফলে বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান মনোভাব যে কেউ সহজে বুঝতে পারবেন।

চুক্তিতে যে শর্তই থাকুক না কেন, আশা করি শ্রমিকশ্রেণীর বন্দীসহ সকল রাজবন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সাধারণ মার্জনা-নীতির কথা সরকার ঘোষণা করবেন, যাতে রাউন্ড

টেবিল কনফারেন্সের পূর্বে দেশে একটি যথাযথ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য এবং কর্মসূচী

অল ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারত সভার করাচি অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ২৭ মার্চ ১৯৩১

বন্ধু এবং সহকর্মীগণ,

এক নিদারুণ মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনার ছায়াবৃত পরিস্থিতিতে আজ আমরা সমবেত হয়েছি।

আমরা এতই ভারাক্রান্ত যে 'কথা বলার মতো অবস্থা নেই। আমাদের দেশের এক সঙ্কট-মুহূর্তে আপনাদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করেছেন। এ জন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এখানে আমাদের লক্ষ্য হল এমন একটি আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় গঠন—যা আমাদের জীবন ও চরিত্রের বিকাশসাধনে সাহায্য করবে এবং সমগ্র মানবসমাজের উচ্চতম আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করবে সে কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখা। যে সব পদ্ধতিতে অল্প সময়ে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতেও আমরা আগ্রহী। আমার সিদ্ধান্ত যে, যে-নীতিগুলি আমাদের সমাজ-জীবনের ভিত্তি হবে তা হল ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা এবং প্রেম। সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব রকম দাসত্ব—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক—থেকে মুক্ত হতে হবে এবং আমাদের সর্বতোভাবে এবং পূর্ণভাবে স্বাধীন হতে হবে।

যা বলেছি সংক্ষেপে তা হল আমি চাই ভারতবর্ষে একটি সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র। সম্পূর্ণ, সর্বব্যাপক এবং অবিমিশ্র স্বাধীনতা লাভের কথা আমি শোনাতে চাই। সমাজের মূলগত পরিবর্তনকামী এবং বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন মানুষ যতক্ষণ না উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন, আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে পারব না। একের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়ে সরাসরি অন্যের হৃদয়ে যায় এমন একটি নতুন বার্তা শুনিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের সমাজের বিপ্লবী অংশকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না।

কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মসূচীর মৌলিক ত্রুটি হল, এ বিষয়ে নেতাদের ধারণা খুব অস্পষ্ট এবং তাদের মনে বেশ দ্বিধা রয়েছে। তাদের কর্মসূচীর ভিত্তি কোনও মৌলিক পরিবর্তন-সাধনের চিন্তা নয়, কেবল আপস করা—ভূস্বামী ও প্রজা, পুঁজিপতি ও শ্রমজীবী, তথাকথিত উচ্চশ্রেণী এবং তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়, পুরুষ ও নারীর মধ্যে আপস।

কংগ্রেসের কর্মপন্থা অনুসরণ করে ভারতে স্বাধীনতা আসবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। যে কর্মপন্থায় তা আসবে বলে আমার বিশ্বাস, তা হল :—

১. সাম্যবাদমূলক কর্মপন্থায় কৃষক এবং শ্রমিক সংগঠন।

২. যুবশক্তিকে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় Volunteer corps হিসাবে সংগঠন।

৩. জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং সব রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ।

৪. নতুন কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা কাজে রূপায়ণে ব্রতী হওয়ার জন্য নানা প্রকার নারীসমিতি গঠন।

৫. ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কটের জন্য তীব্র প্রচার।

৬. নতুন কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী প্রচারের জন্য নতুনভাবে সাহিত্যসৃষ্টি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিষয়ে আলোচনার পূর্বে লাহোরের ফাঁসি সম্পর্কে কিছু বলা

দরকার। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দিয়েছে, ভগৎ সিং ছিলেন তার প্রতীক। এই মনোভাব অজেয় এবং যে আগুন এ জ্বালিয়েছে তা নিভে যাবে না। স্বাধীনতা লাভের আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ভারতকে আরও অনেক সন্তান হারাতে হবে। সম্প্রতিকালের এই সব ফাঁসি, আমার মতে, নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে সরকারের হৃদয়ের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি এবং এক সম্মানজনক নিষ্পত্তির সময় এখনও আসেনি।

গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে বিধিবদ্ধ সাময়িক সংগ্রাম-বিরতি সম্পর্কে বলতে পারি, এটা ভীষণ অসন্তোষজনক এবং তীব্র হতাশাব্যঞ্জক। আমাকে সবচেয়ে যা বেদনাহত করেছে তা হল এই যে, এই চুক্তিপত্র পড়ে চুক্তি সম্পাদনের সময় আমাদের ক্ষমতার পরিমাণ সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা আমাদের ছিল। এই চুক্তির কয়েকটি অন্তর্নিহিত ত্রুটি আছে ; কিন্তু যেহেতু এখন এটি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে প্রশ্ন হল, এই অবস্থায় কি করা উচিত। চুক্তি সম্পাদনের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের দেশপ্রেম সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যও আমি কোনও প্রশ্ন তুলছি না। ফলত আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে সত্যিসত্যিই এমন কিছু কাজ করা যা দেশ এবং দেশবাসীর দাবিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে। এজন্য আমি একটি কর্মসূচী নির্ধারণ করেছি যা দেশবাসীর মধ্যে যাঁরা মৌলিক পরিবর্তনকামী, তাঁরা তা গ্রহণ করতে এবং কাজে রূপায়িত করতে পারবেন। এতে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অনাবশ্যক সংঘর্ষ এমন এক সময়ে এড়ানো যেতে পারে, যখন এমন সংঘর্ষ দেশবাসীকে দুর্বল এবং সরকারকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সর্বোপরি অপরকে সমালোচনা করার সময় আমাদের সংযত থাকা এবং আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া উচিত। অপরের প্রতি সৌজন্য দেখালে এবং নিজে সংযত থাকলে আমরা কিছু হারাব না, বরং লাভ করব অনেক বেশি।

ভারতবর্ষ হল পৃথিবী-রূপ অট্টালিকার মূল প্রস্তর-উপাদান এবং স্বাধীন ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ঘোষণা করবে। আসুন, আমরা এখন যা করা উচিত সেই কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং যাতে সমগ্র মানবজাতি রক্ষা পায় সেজন্য ভারতকে স্বাধীন করি।

ভারতের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য

করাচিতে অল ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ
৫ এপ্রিল ১৯৩১

প্রিয় বন্ধুগণ,

করাচিতে অল ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারতসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমাকে আপনারা আমন্ত্রণ করেছেন। নির্বাচনের দ্বারা আমার প্রতি কেবলমাত্র যে সম্মান আপনারা দেখিয়েছেন সেজন্য নয়, আমার প্রতি যে প্রীতি নিঃসন্দেহে আপনাদের নির্বাচনে অনুপ্রাণিত করেছিল সেজন্যও আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনারা এই অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। আমাদের সামনে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে, এবং যে-পথ ধরে আমাদের চলতে হবে সে বিষয়ে আশা করি কিছু আলোকপাত করতে সমর্থ হব।

আদি কাল থেকে মানুষ আরও এক উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার অনুসন্ধানে রত। প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে সমভাবে এই অনুসন্ধান চলেছে ; এবং কেবলমাত্র মহাজ্ঞানী এবং স্বপ্নদ্রষ্টারাই নন, রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনেতারাও এরই সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রে একটা কল্পমূর্তি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন দেশে প্রতিভাত হয়েছে, কিন্তু এর পিছনকার আগ্রহস্পন্দন

একই ধরনের। প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীরা এক আদর্শ প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছেন। কখনও কখনও মানুষ চেষ্টা করেছে একেবারে প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যেতে, তাদের ধারণা, যেখান থেকে তারা এসেছে। অন্য সময় তারা চেষ্টা করেছে যুগবাহিত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোকে ধূলিসাৎ করতে, যাতে অতীতের ধ্বংসস্তূপের উপর বৃহৎ এবং মহৎ কিছু গড়ে তোলা যায়।

বিশ্বব্যাপী মানবসমাজের এই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে মনস্তাত্ত্বিক চেতনা হল বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিকের প্রতি তীব্র অসন্তোষ এবং আমূল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা। এই চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়েই অসীম হতাশার মধ্যে মানুষ এই পৃথিবী ছাড়িয়ে এবং মানুষের এই অস্তিত্ব ছাড়িয়ে আর এক স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে মানুষ আদর্শ পরিবেশের মধ্যে এক আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে। অন্যরা ভিন্ন এক কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন এবং মানুষের মধ্যেই এই স্বর্গরাজ্য বিদ্যমান এই বিশ্বাসে তাঁরা তপস্যা পূজা, কিংবা সঙ্গীত ও উপাসনার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব শান্তি ও সুখলাভের জন্য চেষ্টা করেছেন।

এই দুই চিন্তাধারার প্রবক্তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁদের মত গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই আমাদের দরকার নেই। আমরা সেই আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো বা রাষ্ট্রকাঠামোর কথাই বেশি চিন্তা করব যা আমাদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে সুখবিধান করবে, মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং চরিত্রের উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে এবং সমগ্র মানবসমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে। এ ছাড়া, যে সব পন্থায় এই লক্ষ্যে অল্প সময়ে পৌঁছানো যাবে সেগুলি অনুসন্ধান করতে আমরা আগ্রহী।

আরও উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধানে যুগ যুগ ধরে মানুষ আলো-আঁধারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য সবই চেষ্টা করেছে আদর্শ নামক সেই ছলনাময়ী আলেয়ার উপর কিছু আলোকপাত করতে। প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশে যুগের পর যুগ ধরে এই সব প্রচেষ্টার অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনা খুবই আকর্ষণীয় বিষয়, কিন্তু এ কাজে সময় লাগবে অনেক এবং আমাদের আশু সমস্যা থেকে তা আমাদের অন্য পথে চালিত করতে পারে। এ কথা বললে যথেষ্ট হবে যে মানুষ এখন অগ্রগতির মতবাদটি (Theory of Progress) স্বীকার করে নিয়েছে এবং এর বিপরীত মতবাদ, যথা মানুষের পতন এবং তার পরবর্তী ক্রমাবনতি, প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অগ্রগতি-মতবাদটি নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

যদি আমরা যে সব সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ মানুষকে সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করি, তা হলে আমরা কয়েকটি সাধারণ আদর্শ লক্ষ করব। নিজেদের হৃদয় অনুসন্ধান করে এবং কোন নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের জীবন বাঁচার যোগ্য হয়ে উঠবে, এ কথা নিজেদের জিজ্ঞাসা করলে অনুরূপ ফললাভ করা যেতে পারে। এ দুয়ের যে কোনও একটি পন্থা অনুসরণ করলে, আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে, যে সব নীতি হবে আমাদের সমাজ-জীবনের ভিত্তি তা হল ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম। আমাদের সকল কাজ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যায়বোধের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, এ কথা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করার তেমন প্রয়োজন বোধ করি নেই। ন্যায়পরায়ণ এবং নিরপেক্ষ হতে হলে মানুষকে পরস্পর সমতুল্যভাবে দেখা উচিত। মানুষকে পরস্পর সমতুল্য করতে হলে আমাদের তাদের অবশ্যই স্বাধীন করতে হবে। আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বন্ধন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে এবং বিভিন্ন প্রকার অসাম্যের সৃষ্টি করে। সেজন্য সাম্য স্থাপন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হলে সব রকম—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক—বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে, এবং আমাদের সর্বতোভাবে এবং পূর্ণভাবে স্বাধীন হতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ অনিয়মানুবর্তিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা বলতে এ কথা বোঝায় না যে, কোন আইনকানুন থাকবে না। স্বাধীনতা বলতে কেবলমাত্র বাইরের শক্তির দ্বারা আরোপিত শান্তি

ও শৃঙ্খলার বদলে আমাদের নিজেদের তৈরি আইন এবং আমাদের নিজস্ব নিয়মশৃঙ্খলার প্রবর্তন বোঝায়। নিজেদের উপর নিজেদেরই আরোপিত শৃঙ্খলা দরকার কেবলমাত্র যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তখন নয়, তার চেয়েও বেশি দরকার যখন আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করছি সে সময়। সেজন্য নিয়ম-শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত বা সামাজিক যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, জীবনের ভিত্তি হিসাবে দরকার। সবশেষে ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা ইত্যাদি মৌলিক নীতিগুলি প্রেম নামক আর একটি উন্নত আদর্শের দ্যোতক বা পরোক্ষভাবে তা প্রকাশ করে থাকে। মানবজাতির প্রতি ভালবাসার দ্বারা যদি না অনুপ্রাণিত হই, তা হলে আমরা সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করতে পারব না, সকল মানুষকে সমতুল্য হিসাবে দেখতে পারবে না, স্বাধীনতা লাভের জন্য সকলকে সমভাবে কষ্টভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে বলতে পারব না কিংবা সঠিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে পারব না। সেজন্য আমার মতে এই পাঁচটি নীতি আমাদের সমাজ-জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাই যে, সাম্যবাদ বলতে আমি যা বুঝি এবং যে সাম্যবাদ আমি ভারতে প্রতিষ্ঠা করতে চাই, এই নীতিগুলি হবে সেই সাম্যবাদের অপরিহার্য অংশ।

আমার বিশ্বাস অনাগত ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে একটি আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিকাঠামো উদ্ভাবন করতে সমর্থ হবে যা অনেকাংশে পৃথিবীর সামনে একটি আদর্শ লক্ষ্যবস্তু রূপে প্রতিভাত হবে, যেমনভাবে বর্তমানকালে বলশেভিজম মানুষকে অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি না যে বিমূর্ত নীতিগুলি একই উপায়ে, রূপে এবং পরিমাণে বিভিন্ন জাতি বা দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। রাশিয়ায় যখন মার্কসবাদ অনুসরণ করা হয় তখন রাশিয়ার প্রচলিত অবস্থার জন্যই বলশেভিজমের উদ্ভব হয়। অনুরূপভাবে ভারতে যখন সাম্যবাদ অনুসরণ করা হবে তখন ভারতের প্রচলিত অবস্থা এক নূতন ধরনের সাম্যবাদ গড়ে তুলবে যাকে আমরা ভারতীয় সাম্যবাদ বলে স্বাগত জানব। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জাতিগত মনোভাব, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এ সবই কলমের এক খোঁচায় বাতিল করা যায় না। যে কোন আদর্শ যা আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে চাই এগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে বা তার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য।

অন্য দেশ থেকে নির্দেশ বা প্রেরণা অনুসন্ধান করলেও এ কথা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে অন্য দেশের মানুষকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়। আমাদের জাতীয় প্রয়োজনে এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে যা উপযোগী হতে পারে সে দিকে লক্ষ রেখে অন্যত্র যা শেখার আছে তাকেই আমাদের আত্মস্থ করা উচিত। 'একজনের কাছে যা খাদ্য অন্যের কাছে তা বিষ'—এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে একটি বড় সত্য নিহিত আছে। বলশেভিক মতবাদ এবং কর্মপন্থাকে যারা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে প্রলুব্ধ হয়েছে, তাদের আমি সতর্ক করে দিতে চাই। বলশেভিক মতবাদ সম্পর্কে বলতে চাই যে, এই তত্ত্ব বর্তমানে একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে চলেছে। কেবলমাত্র মার্কসের আদি তত্ত্ব থেকে নয়, ক্ষমতা দখলের পূর্বে লেনিন ও অন্য বলশেভিকরা যে নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তার থেকেও এই তত্ত্বের ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। রাশিয়ায় প্রচলিত বিশেষ এক অবস্থার জন্যেই এই ব্যতিক্রম ঘটেছে ; এই ব্যবস্থা মূল মার্কসবাদ বা বলশেভিক আদর্শের রদবদল ঘটাতে বাধ্য করেছে। বলশেভিকরা রাশিয়ায় যে সব কর্মপন্থা এবং কৌশল গ্রহণ করেছে সে সম্বন্ধে বলতে পারি যে সে সব অপরিহার্যভাবে ভারতীয় অবস্থার উপযোগী হবে না। এর প্রমাণস্বরূপ বলতে চাই বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও কমিউনিজম ভারতে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এর মূল কারণ তাদের সাধারণভাবে অনুসৃত নীতি এবং কৌশল এমনই—যা মানুষকে সম্ভাব্য মিত্রভাবে গ্রহণ করার বদলে তাদের আরও বিরূপ করে তুলেছে।

যা বলেছি, সংক্ষেপে তা হল আমি চাই ভারতবর্ষে এক সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র। এই সাম্যবাদী রাষ্ট্র ঠিক কি আকার গ্রহণ করবে তা এই মুহূর্তে বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। আমরা কেবল এই সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মূল আদর্শ এবং বৈশিষ্ট্যের একটি নক্‌শা-চিত্র দিতে

পারি।

এক সম্পূর্ণ, সর্বব্যাপী এবং অবিমিশ্র স্বাধীনতার কথাই আমি আপনাদের শোনাতে চাই। আমরা চাই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা, যার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এক স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র গঠন। সকলের কাছে এটি পরিষ্কার হওয়া দরকার যে স্বাধীনতার অর্থ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এবং এ বিষয়ে মনে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা অন্য ভাব থাকা চলবে না। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। প্রত্যেক মানুষের কাজের এবং প্রাণধারণের উপযোগী পারিশ্রমিক লাভের অধিকার থাকবে। আমাদের সমাজে কোনও অলস নিষ্কর্মা মানুষ থাকবে না। সকলেরই থাকবে সমান অধিকার। সর্বোপরি থাকবে ন্যায়সঙ্গত এবং সমভাবে সম্পদ বিতরণের ব্যবস্থা। এজন্য দরকার হলে রাষ্ট্রকে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সম্পদ বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত, আমরা চাই সমাজে পূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা। সমাজে কোনও জাতিভেদ, কোন অনুন্নত জাতি থাকবে না। সমাজে প্রত্যেকের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা থাকবে। অধিকন্তু সামাজিক মর্যাদা বা আইনের চোখে স্ত্রী-পুরুষে কোনও অসাম্য থাকবে না, এবং সকল বিষয়ে নারী হবে পুরুষের সমান অংশীদার।

এজন্য সমাজে প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শ্রেণী বা ব্যক্তি যারা কোনও না কোনওভাবে শোষিত বা অত্যাচারিত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা এক নতুন বার্তা শোনাব। আমরা নতুন কথা শোনাব রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমজীবী, ভূমিহীন ও সম্পত্তিহীন শ্রেণী, সমাজের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণী এবং নারীজাতিকে। এই শোষিত এবং অত্যাচারিত শ্রেণীর মানুষরাই সমাজের মূল অংশের এবং, বলতে দ্বিধা নেই, বিদ্রোহী অংশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। যদি আমরা তাদের কাছে গিয়ে এই নতুন বার্তা—সর্বব্যাপক পূর্ণ স্বাধীনতার কথা—শোনাই, তাতে যে তাদের অবিলম্বে অনুপ্রাণিত করা যাবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। সমাজের এই মূল এবং বিদ্রোহী অংশকে উজ্জীবিত না করা পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত এই নতুন বার্তা (যা সহজেই অন্যের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে) দ্বারা মানুষকে কেবলমাত্র অনুপ্রাণিত করতে না পারলে সমাজের বিদ্রোহী অংশকে উজ্জীবিত করা যাবে না।

কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীর মূল দুর্বলতা হল নেতৃবৃন্দের মনের ধারণা অনেকটা অস্বচ্ছ এবং তাদের মনে দ্বিধার ভাব রয়েছে। উপরন্তু কোনও মৌলিক পরিবর্তন নয়, কেবল একটা আপস করা হল এই কর্মসূচির ভিত্তি। ভূস্বামী এবং প্রজার সঙ্গে আপস, পুঁজিপতি এবং শ্রমজীবীর সঙ্গে আপস, তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর আপস, পুরুষ ও নারীর সঙ্গে আপস—এসব যারা সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চান তাদের পক্ষে আদর্শ অবস্থা হতে পারে। এহেন আপস করার দ্বারা সমাজের বিদ্রোহী অংশকে উদ্দীপ্ত করা যাবে কিনা—যে উদ্দীপনার ফলেই একমাত্র প্রত্যেক বিতর্কমূলক বিষয়ে বর্তমানে আপসকামী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব—সে বিষয়ে আমার মনে সংশয় আছে। স্বাধীনতার জন্য এমন মূল্যের পরিমাণ হবে অতি স্বল্প। কিন্তু এই স্বল্পমূল্যেও স্বাধীনতা আসবে কিনা সে বিষয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে।

যে বিশাল সমস্যা আমাদের সমাধান করতে হবে, তা নিয়ে যেমন তেমন ভাবে কিছু করা চলে না ; এজন্য আমরা চাই একটি মূলগত জঙ্গী কর্মসূচী। এই প্রারম্ভিক বক্তৃতায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না ; কর্মসূচীর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করেই তৃপ্ত হব। বক্তৃতার প্রারম্ভে যে পাঁচটি নীতির কথা উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং স্বাধীনতার বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ রেখে নিম্নবর্ণিত পন্থায় আমাদের কার্যক্রম স্থির করব—

(১) সাম্যবাদমূলক কর্মপন্থা হিসাবে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন।

(২) যুবশক্তিকে কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় Volunteer Corps হিসাবে সংগঠন।

(৩) জাতিভেদ প্রথা বিলোপ এবং সব রকম সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ।

(৪) নতুন কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা কাজে রূপায়ণে ব্রতী হওয়ার জন্য নানাপ্রকার

নারীসমিতি সংগঠন।

(৫) ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বর্জনের জন্য তীব্র প্রচার।

(৬) নতুন কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা এবং একটি নতুন দল সংগঠনের জন্য দেশব্যাপী প্রচার।

(৭) নতুন কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী প্রচারের জন্য নতুন ভাবে সাহিত্যসৃষ্টি।

এই নতুন কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী যে সব শ্রমিক ও সহকর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, তাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাম-শাখা (Left-Wing) হিসাবে তারা নিজেদের সংগঠিত করবেন কিনা। এমন করার পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। প্রথমত, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি ঐতিহ্য এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। তা ছাড়া, প্রজন্ম পরম্পরায় বিপুল ত্যাগের উপর এর প্রতিষ্ঠা। যদি Left-Wing-কে ঠিকমতো সংগঠিত করা যায়, সন্দেহ নেই শীঘ্রই সেই সময় আসবে যখন নিছক ঘটনাক্রমের যুক্তিতে কংগ্রেসের দায়িত্বগ্রহণের জন্য তাদের আহ্বান করা হবে। আপন কর্মসূচীর ভিত্তিতে একবার এই দল প্রতিষ্ঠিত হলে বর্তমানের সংগঠন এবং কর্মসূচীর এটাই হবে একমাত্র বিকল্প।

বন্ধুগণ, বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে সরকার এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চয় আমার মতামত জানতে চাইবেন। সে কথা বলার পূর্বে আর একটি বিষয় যা সারা ভারতকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে সে সম্পর্কে আমার মনোভাব লাঘব করতে চাই। সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের সাম্প্রতিক ফাঁসির কথাই আমি বলছি। ঘটনাটি ঐতিহাসিক এবং ভবিষ্যতে এ থেকে নানা শিক্ষা গ্রহণের আছে। এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনার জন্য আপনাদের আনুকূল্য সনির্বন্ধভাবে প্রার্থনা করি।

ভগৎ সিং মৃত্যুবরণ করেছেন। ভগৎ সিং দীর্ঘজীবী হ'ন। লাহোরে যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হচ্ছিল, ভারতবাসী তা মাসের পর মাস রুদ্ধ আশঙ্কার মধ্যে দেখেছে এবং তার পরিণতির অপেক্ষায় থেকেছে। অবশেষে তা শেষ হয়েছে। এমন একটা দৃশ্যে যবনিকা পতন হয়েছে যার গভীর করুণরস বর্ণনা করা যায় না, স্বার্থশূন্যতার দৃশ্য হিসাবে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নাটকটি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং চরিত্র-চিত্রণ এত জীবন্ত যে আমরা বিস্ময়ে এবং শেষে কি ঘটবে তার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতিতে ছিলাম। ভগৎ সিং এবং যতীন দাসের আত্ম-উৎসর্গে নাটকের পরিসমাপ্তি। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে সংগঠিত এই দুই বিরল আত্মবলিদান আমরা পরম আবেগে এবং গভীর শ্রদ্ধায় লক্ষ্য করেছি। যতীন দাসের শোকযাত্রা যেমন এক দীর্ঘ জয়যাত্রা, ভগৎ সিংহের ফাঁসি তেমনই এক পবিত্র জীবন-উৎসর্গ যা সারা দেশকে অনুপ্রাণিত করবে। লাহোর ষড়যন্ত্র যে একেবারে ভারতের গভীর মর্মস্থলকে আলোড়িত করেছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু সরকার কি তা উপলব্ধি করতে পেরেছে? আবার বলি, 'ভগৎ সিং মৃত্যুবরণ করেছেন! ভগৎ সিং দীর্ঘজীবী হ'ন!' ভগৎ সিং কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি ন'ন। যে বিদ্রোহ-চেতনা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দেশকে গ্রাস করেছে তিনি তারই প্রতীকস্বরূপ। এই চেতনাকে বিনষ্ট করা যায় না, যে আগুনের শিখা এ জ্বালিয়েছে তা নিভে যাবে না। সেজন্য ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং শুকদেব আর জীবিত নেই বলে আমরা শোক করব না। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে ভারতকে হয়তো আরও অনেক সন্তান হারাতে হবে। কিন্তু আমরা শোক প্রকাশ করছি এই কারণে যে, তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এমন এক সময়ে যখন দেশের অগ্রগণ্য জাতীয় সংগঠন—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনার কথা ঘোষণা করেছেন। হরকিষণলাল, দীনেশ গুপ্ত এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মতো ভারতের অন্য সন্তানদের ভাগ্যে কি ঘটবে তা সহজে জানবার উপায় নেই। সেজন্য সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন তোলা যায়, এই চুক্তির মূল্য কি যদি এই সব বিরোধিতাসূচক কাজ চলতে থাকে এবং যদি আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের প্রাণরক্ষা করতে না পারি?

যুক্তির খাতিরে বলা যেতে পারে, প্রাণদণ্ড কার্যকর হবে না এমন কোনও কথা চুক্তির শর্তে

ছিল না। এ যুক্তি স্বীকার করছি। কিন্তু এ কথা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি না, চুক্তির উদ্দেশ্য কি ? সকলেই স্বীকার করবেন চুক্তির উদ্দেশ্য হল রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আলোচনার পূর্বে শান্তি এবং সদিচ্ছার এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করা, যাতে শান্ত এবং নিরুদ্বেগ চিত্তে, মনে কোনরূপ তিক্ততা বা বিরূপভাব না রেখে আলোচনায় বসা যায়। যদি বন্দীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ এবং সেইমতো কাজ হয় এবং যদি বহুসংখ্যক রাজবন্দী এখনও কারাগারে আবদ্ধ থাকেন, তা হলে কি সেই বাতাবরণ সৃষ্টি করা যায় ? সরকার যদি বর্তমানে চুক্তির শর্তাবলী আক্ষরিক অর্থে পালনের উপরেই বেশি জোর দিয়ে থাকে, নিজেদের লাভের দিকেই যদি তাদের বেশি আগ্রহ থাকে তা হলে আলাপ-আলোচনার সময় যখন আসবে তখন তাঁরা যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলবে সে বিষয়ে কি আশা করা যায় ? কোন নিষ্পত্তি বা নিষ্পত্তির জন্য আলোচনার পূর্বে মহাত্মা গান্ধী যে সব সময় হৃদয়-পরিবর্তনের উপর জোর দিয়ে থাকেন তা বৃথা নয়। যে সরকার পূর্বের মতোই আমলাতান্ত্রিক এবং বলা যেতে পারে, প্রতিহিংসাপরায়ণ রয়েছে সে সরকার স্বেচ্ছায় জনগণের প্রতিনিধির হাতে ভারতের ভার তুলে দেবে না। হয়তো জোর দিয়ে বলা হবে, ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আমরা আলোচনায় বসব ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা ভারত সরকারের সঙ্গে নয়, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বা একেবারে ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে। কিন্তু পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান বা মৃত্যুদণ্ড রদ করার বিষয়ে যদি ব্রিটিশ সরকারকে স্থানীয় মানুষের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করতে হয়, তা হলে এমন আশা করা যাবে না যে ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো আরও বৃহৎ প্রশ্নে সেই একই সরকার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রশাসকদের ইচ্ছার দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হবে না ?

আমার মতে সরকারের যে, কোনও-রকম হৃদয়-পরিবর্তন ঘটেনি সাম্প্রতিক এই ফাঁসিগুলি তারই নিশ্চিত ইঙ্গিত বহন করে। সম্মানজনক কোন নিষ্পত্তির সময় এখনও আসেনি। স্বরাজলাভকে স্বাগত জানানোর পূর্বে আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগের মধ্য দিয়ে আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। আইরিশ ইতিহাসের একটি সাম্প্রতিক ঘটনা আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করবে। কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে অল্ডারম্যান MacSweeney Lord Mayor of Cork অনশনব্রত গ্রহণ করেন। যখন তাঁর মৃত্যু প্রায় আসন্ন, ব্রিটিশ ও আইরিশ জনগণের পক্ষ থেকে সমভাবে মহামান্য রাজার কাছে এই মর্মে সনির্বন্ধ আবেদন করা হয় যেন তিনি রাজকীয় বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে MacSweeney-র প্রাণরক্ষা করেন। রাজা গভীরভাবে অভিভূত হন কিন্তু তিনি তাঁর সেক্রেটারির মাধ্যমে জানালেন যে যেহেতু তাঁর মন্ত্রীরা প্রাণদণ্ড রদের বিরোধী, তিনি এ বিষয়ে কিছু করতে অক্ষম। রাজাকে আত্মসমর্পণ করতে হল। ফলে আয়ার্ল্যান্ডে এই হল যে ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম ক্রমবর্ধমান তিক্ততার সঙ্গে চলতে থাকে। কিছুকাল পরে দুই পক্ষেরই মনে হল এ বিষয়ে সন্ধি এবং একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। এর পর রাজবন্দীদের ক্ষমাপ্রদর্শন প্রশ্নটি আবার উঠল এবং Sien Fein নেতৃবর্গ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীসহ সমস্ত বন্দীদের মুক্তির দাবি জানালেন। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত Seon Mckeon ছাড়া অন্য সকলকে মুক্তি দিতে সম্মত হলেন। Sien Fein নেতৃবৃন্দ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে Seon Mckon-কে মুক্তি না দিলে চুক্তি ভঙ্গ করবেন বলে হুমকি দেন। এই চরমপত্রের উত্তরে সেই একই মন্ত্রিসভা যারা দেশব্যাপী আন্দোলন সত্ত্বেও Terence McSweeny-কে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে Seon Mckeon-কে মুক্তি দিলেন। McSweeny-কে প্রাণ দিতে হয়েছিল, কারণ নিষ্পত্তির সময় তখনও আসেনি, Seon Mckeon বেঁচে গেলেন, কারণ তখন স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠা ছিল আসন্ন এবং ব্রিটিশ জনগণের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছিল। এই একই নীতি কী আমরা ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি না ?

ভগৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন বীরপুরুষ, তাঁরা প্রাণভিক্ষা করেননি। ভারত যাতে স্বাধীন হয় এ জন্য তাঁরা সর্বস্ব পণ করেছিলেন। কিন্তু সারা দেশ চেয়েছিল তাঁদের প্রাণদণ্ড থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হোক। যদি ইতিমধ্যেই চুক্তি ঘোষণা করা হত এবং যদি শান্তি দৃষ্টিগোচর হত, তা হলে এই সব বীর ও নিঃস্বার্থ মানুষের জীবনধারা পরিবর্তিত হত এবং

জাতীয় পুনর্গঠন কাজে তাঁদের আমরা নিয়োজিত করতে পারতাম। দল ও মত নির্বিশেষে সারা দেশের লোক দ্ব্যর্থহীনভাবে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেছিল এবং প্রাণদণ্ড রদের দাবি জানিয়েছিল।

দেশবাসীর পক্ষে সম্ভবপর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত ছিল। যখন চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা চলছিল, তখন দেশের জাতীয় সংগঠনের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস বিপ্লবীদের এবং ভারতীয় লেবার পার্টির বিষয়টি উপস্থাপিত করতে পারতেন। এ জন্য বিপ্লবীদের বা লেবার পার্টির মতবাদ বা কর্মপন্থার সঙ্গে কংগ্রেসের একমত হওয়ার কোনও দরকার ছিল না। তারা কেবল এ কথা বলতে পারতেন : যেহেতু এই দুটি দল রয়েছে এবং যেহেতু নিজেদের মতানুসারে তারাও ভারতের মুক্তির জন্য কাজ করছে, এই চুক্তির সঙ্গে তাদের কোনমতে যুক্ত না করা পর্যন্ত স্থায়ী শান্তি সম্ভবত স্থাপিত হবে না।

এই সন্ধিক্ষণে সরকারের পক্ষে একটু উদার মনোভাবের পরিচয় দিলে এই দুই দল এবং বৃহত্তর অর্থে সারা দেশের উপর তা মঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করত। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী দলের এমন উদার মনোভাব ব্যক্ত করার পরেও কোনও গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তি সাড়া না দিলে ওই দল বা ব্যক্তি সারা পৃথিবীর কাছে নিন্দিত হত।

যদি এভাবে আপস করে তারা দেশের সকল বিপ্লবী দলকে শান্ত করতে পারতেন, সরকারের নিজস্ব শক্তি এবং সম্পদের এ দুয়ের কোনটিকেই হারাবার কিছু ছিল না ; বরং এতে তাদের নৈতিক জয় হত। আপসের চেষ্টা ব্যর্থ হলে সরকার পুনরায় নির্যাতনের পথ অবলম্বন করতে পারতেন এবং তখন আরও জোরালো যুক্তি দেখিয়ে তা করতেন।

সরকার যদি ভুল করে থাকেন, কংগ্রেসও ভুল করেছে। বিপ্লবী এবং শ্রমিক দলের কর্মপন্থার সঙ্গে একমত না হয়েও Sien Fein দল যেমন সারা আয়ার্ল্যান্ডের হয়ে কথা বলেছিল, চুক্তি-আলোচনার সময় কংগ্রেসও তেমনি সারা দেশের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারত, সকলের দাবির সঙ্গেই কংগ্রেস বেশ ভালভাবে নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারত। কিন্তু কংগ্রেস তা করতে ব্যর্থ হয় ; এবং ব্যর্থ হওয়ার ফলে দেশবাসী এবং জগতের চোখে সে নিজের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে। ভগৎ সিং এবং অন্যান্যদের মৃত্যুদণ্ড রদের আবেদন সরকার কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার পর কংগ্রেস অনুরূপ মনোভাব গ্রহণ করতে পারত।

কংগ্রেস যদি দলের পক্ষ থেকে মৃত্যুদণ্ড রদের কথা বলত, তা হলে সে কিছুই হারাত না, বরং দেশবাসীর বিচারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত এবং সম্ভবত ভগৎ সিংয়ের প্রাণ সে রক্ষা করতে পারত। এমন কি যদি সরকার তার দাবি অগ্রাহ্য করত, কংগ্রেস এই ভেবে সান্ত্বনা পেত যে সে তার কর্তব্য করেছে এবং 'ভগৎ সিং এবং তার সহকর্মীদের প্রাণরক্ষার জন্য সে সাধ্যমত চেষ্টা করেনি' এই মনে করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ বা ক্ষোভের কিছু থাকত না।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি নামে অভিহিত বিরোধনিষ্পত্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারি যে, তা অত্যন্ত অসন্তোষজনক এবং গভীর হতাশাব্যঞ্জক। যে কথা ভেবে আমার বেশি বেদনা বোধ হয় তা হল এই চুক্তির বিষয়বস্তু থেকে আমাদের যে পরিমাণ শক্তি অনুমান করা যায়, চুক্তিসম্পাদনকালে আমরা তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী ছিলাম। এই চুক্তির শর্তাবলীর কয়েকটি অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্যের সংক্ষেপে উল্লেখ করছি :

১. Bengal Ordinance (Bengal Criminal Amendment Act), এবং Burma Ordinance ইত্যাদি অর্ডিনান্স— যার দ্বারা নিছক সন্দেহের বশে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা যায়— তা বাতিল করা হয়নি।

২. জরিমানা বাবদ অর্থ এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত-বিষয়ক শর্তগুলি সন্তোষজনক নয়।

৩. পুলিশী নির্যাতনের অনুসন্ধানের জন্য দাবি, বিশেষ করে তা যখন কংগ্রেসের তরফে

করা হয়েছে, প্রত্যাহার করা উচিত হয়নি। অধিকন্তু, যে সমস্ত গাড়োয়ালি নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছিল এবং যে সমস্ত পুলিশ রাজনৈতিক কারণে বরখাস্ত হয়েছিল, কংগ্রেসের উচিত ছিল তাদের পাশে দাঁড়ানো। অনেক রকম অন্যায় অত্যাচার করা সত্ত্বেও নিজেদের অনুগত মানুষকে সরকার কখনও বিপদের মুখে ফেলেননি ; কংগ্রেস কিন্তু নিজের লোকের পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

৪. কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট, বিশেষ করে তা যখন আইন অমান্য আন্দোলনের অঙ্গীভূত নয়, পরিত্যাগ করা উচিত হয়নি। গত বছর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেকার সাধারণ সময়ে আমরা ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তা করতে পারি না। আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্বে যে অবস্থায় ছিলাম, তার চেয়ে এই আন্দোলনের পরবর্তীকালে এখন আমরা আরও খারাপ অবস্থায় আছি।

৫. লবণ উৎপাদনের বিধিগুলি পর্যাপ্ত নয়, বিশেষ করে লবণ যখন কেবল একটি সীমাবদ্ধ স্থানে উৎপন্ন করা যেতে পারে।

৬. পিকেটিং সম্পর্কে বিধিনিষেধ আরোপ করার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাতে গত বছর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বেকার অবস্থার তুলনায় আমরা আরও বেশি অসুবিধায় পড়েছি। এই সব বিধিনিষেধ যদি ঠিকমতো মেনে চলা হয়, তা হলে আদৌ পিকেটিং করা, একেবারে অসম্ভব না হলেও, কঠিন হয়ে পড়বে।

৭. সর্বোপরি, বন্দীদের ক্ষমাপ্রদর্শন সংক্রান্ত বিধিগুলি খুবই অসন্তোষজনক। প্রথমত, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য আটক সকল বন্দীকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি। উপরন্তু চুক্তির শর্তানুসারে আমরা বিপ্লবী দলের এবং লেবার পার্টির বন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন দাবি করতে পারি না। ফাঁসির আদেশ রদ করা যাবে না— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মতো বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা চলতে থাকবে। পাঞ্জাবে সামরিক আইনে আটক বন্দীদের মতো যে সব রাজবন্দী ১০/১২ বছর জেলে আটক রয়েছেন তারা জেলেই আটক থাকবেন।

সব শেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বিনা বিচারে যে সব ডেটিনিউ বন্দী আছেন তাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। তা হলে বন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের মূল্য কি ? আরও একটি কথা বলতে চাই। বন্দীদের অহিংস এবং হিংসাপ্রবণ বলে যে পার্থক্য এখন কংগ্রেস করে থাকে, তা এক নতুন লোক-দেখানো ব্যাপার। এটা ১৯২৯ সালের Delhi Manifesto কিংবা মহাত্মা গন্ধীর অতি-বিখ্যাত এগারো দফার কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

চুক্তির শর্তাবলীর অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য দেখাতে বিশদভাবে আর কিছু বলার দরকার নেই। চুক্তিটি পর্যালোচনা করলে এ কথা বুঝতে কারও অসুবিধা হবে না যে, পরাজয়ের মনোভাব নিয়েই কংগ্রেস এতে সম্মত হয়েছিল এবং কয়েক জায়গায় এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যা আমাদের আত্মমর্যাদা এবং সম্মানের অনুকূল নয়। এই চুক্তি সম্পাদনকালে যদি সত্যিই আমরা দুর্বল অবস্থায় থাকতাম, তা হলে আমি এত বেশি প্রতিবাদ করতাম না ; কিন্তু সত্যিই কি আমরা সে সময় এত দুর্বল ছিলাম। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

কিন্তু চুক্তিটি এখন সম্পাদিত হয়ে গেছে ; কাজেই কোন আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে আমাদের খুব সতর্কভাবে ভেবে দেখতে হবে। নেতিবাচক সমালোচনায় নিজেদের শক্তি ক্ষয় না করে নির্দিষ্ট এবং লাভজনক কিছু কাজ আমাদের করা উচিত। এই চুক্তির শর্তাবলীর জন্য যারা দায়ী তাঁদের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে মুহূর্তের জন্যও আমার মনে কোন প্রশ্ন জাগেনি। বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা মনে জাগে। ফলত এখন আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা হল বাস্তবে এমন কিছু কাজ করা, যাতে জাতি এবং জাতির দাবি আরও শক্তিশালী হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রারম্ভেই আমি একটি কর্মসূচীর রূপরেখা দিয়েছি যা আমাদের মধ্যে যাঁরা আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁরা তা গ্রহণ করতে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। ফলে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে অনাবশ্যক সংঘর্ষ এমন এক সময়ে এড়ানো যাবে যখন এরূপ সংঘর্ষ

জনগণকে দুর্বল এবং সরকারকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

সর্বোপরি যদি আমাদের অন্যকে সমালোচনা করতে হয়, সে সময়ে যেন আমরা সংযত থাকতে এবং আত্মসংযম রক্ষা করতে পারি। অন্যের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করলে বা নিজে সংযত থাকলে আমরা কিছুই হারাব না এবং আমাদের লাভ হবে অনেক বেশি। নিজেদের এই কর্মসূচিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে আমাদের উচিত সাধ্যমত সকল উপায়ে তা কাজে রূপায়িত করা। আমাদের এই কর্মসূচী যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে কোন না কোন সময়ে দেশবাসী তা গ্রহণ করতে বাধ্য কারণ পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত সত্য জয় লাভ করে।

বন্ধুগণ, আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় নিয়েছি কিন্তু আমার যা বলার তা বলেছি। আসুন, এই ব্রত পালনে আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে, অটল সাহসে এবং বিনম্র চিত্তে অগ্রসর হই। সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষের এক স্বপ্নছবি আমার চিত্ত আচ্ছন্ন করে আছে। এটাই আমার জীবনস্বপ্ন এবং আমার সকল কাজের লক্ষ্য। পৃথিবীর সংস্কৃতি এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক কিছু দেবার আছে। এই উপহার গ্রহণের জন্য পৃথিবী সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। পৃথিবীকে ভারতের শেষ উপহার হবে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন, যা থেকে সারা মানব-সমাজ নানা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। পৃথিবীরূপ অট্টালিকার মূল প্রস্তর-উপাদান হল ভারতবর্ষ এবং স্বাধীন ভারত পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘোষণা করবে। আসুন আমরা এখন যা করা উচিত সেই কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং যাতে সমগ্র মানবজাতি রক্ষা পায় সেজন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন করি।

বাংলাদেশের কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য

বি পি সি সি-র নির্বাচন সম্পর্কে নয়াদিল্লিতে প্রদত্ত প্রেস বিবৃতি, ১১ এপ্রিল ১৯৩১

করাচী কংগ্রেসের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির পর বাংলাদেশে বিরোধ যেন চিরতরে মিটে যায় এটাই আমি আন্তরিকভাবে আশা করি। সারা দেশ বুঝতে পেরেছে যে স্বাধীনতালাভের সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি এবং সেজন্য আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন যদি কিছু মতপার্থক্য আমাদের মধ্যে থাকে তা দূর করা এবং আমলাতন্ত্রের কাছে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট উপস্থাপিত করা। একই চেতনা আমাদের প্রাদেশিক এবং আঞ্চলিক সংগঠনে যদি পরিব্যাপ্ত না হয় তা হলে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য ফলপ্রসূ হবে না।

সুখের কথা শীঘ্রই কংগ্রেসের নির্বাচন হবে এবং প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠনের একটি সুযোগ বাংলাদেশ পাবে। প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটিকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে আমি সব সময় দেখে থাকি এবং সাধ্যমতো সকল উপায়ে চেষ্টা করেছি এর মর্যাদা তুলে ধরতে এবং এর সংহতি ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে সব সময় সুখকর বা সহজ হয়নি ; আমি বিশ্বাস করি প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটির মর্যাদা, সংহতি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা না হলে কোনও প্রদেশে রাজনৈতিক জীবন এবং ক্রিয়াকর্ম সম্ভব হবে না। যে কোনও সময়ে যিনিই এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকুন না কেন, তাঁকে নির্ভয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমার তরফে বলার দরকার নেই যে, আমাদের ক্ষমতার মধ্যে যা সম্ভব বি পি সি সি-র কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive) সম্পূর্ণ সুষ্ঠু, অবাধ এবং নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন যাতে হয় তার দিকে লক্ষ রাখবেন। কংগ্রেস সদস্যদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য প্রকৃত কংগ্রেস কর্মীদের সব রকম সুবিধা দেওয়া হবে। এবং আশা করা যায় ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটিও

কংগ্রেস সদস্যদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য নিজ নিজ এলাকায় কংগ্রেস কর্মীদের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দেবেন। বি পি সি সি-র পুনর্গঠন এবং বি পি সি সি-তে কো-অপ্ট সদস্য নিয়োগের বিষয়ে ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস কমিটি এবং বি পি সি সি-তে তাদের প্রতিনিধিদের মতামত এবং ইচ্ছা ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হবে।

গভীর পরিতাপের বিষয় হল এই যে করাচীতে ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই মর্মে আবেদন করা হয় যে বাংলা দেশে আসন্ন নির্বাচনকার্য তত্ত্বাবধান করার জন্য যেন একজন রেফারি নিযুক্ত করা হয়। ওয়ার্কিং কমিটির কাছে এই রকম আবেদন করা হয়েছিল কেবলমাত্র বাংলা দেশের পক্ষ থেকে, যেন প্রদেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশই তার নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে না।

এরকম অনুরোধ করে বাংলা দেশের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, বিশেষ করে গতবারে যখন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে বি পি সি সি যা করেছে কার্যত তার সব কিছু সমর্থন করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি এই ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বি পি সি সি-র কাজে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এবং তিনি আশা করেন যে ওয়ার্কিং কমিটি ঐ একই কাজ করবেন।

বাংলাদেশে বি পি সি সি হল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠান স্থির করবে জনস্বার্থে কীভাবে আমাদের কাজে লাগানো হবে, এমন একটি ধারণা আশা করি যেন আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করে। আমার বিশ্বাস এই রকম চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে, আমাদের মধ্যে যদি কোন বিরোধ থাকে তা দূর করতে সমর্থ হব এবং আমলাতন্ত্রের কাছে একটি ঐক্যবদ্ধ দল হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে পারব।

ঐক্যস্থাপনের জন্য আবেদন

১৩ এপ্রিল ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি

বাংলাদেশের ঘরোয়া বিবাদ মেটাতে সাধ্যমত সব রকম চেষ্টা করব, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কলকাতায় ফিরেছি। বাংলাদেশ যাতে জাতীয় আন্দোলনে পূর্ণমাত্রায় অংশ নিতে পারে এবং বস্তুত সে যে কাজ করেছে তার জন্য পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হয় এ জন্যেই এটা করা দরকার। ঘরোয়া বিবাদের জন্য বাংলাদেশ যে তার সম্মান হারিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এখন একান্ত প্রয়োজন আর দেরি না করে এমন অবস্থার অবসান ঘটানো। এই উদ্দেশ্যে আমি চাই কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির মনে যে সব অভিযোগ আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খুঁজে দেখতে এবং সাধ্যমত তার প্রতিকার করতে।

দুদিন আগে একটি বিবৃতিতে ইতিপূর্বে বলেছি যে আমাদের পারস্পারিক বিরোধ মেটানোর একমাত্র উপায় হল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটিকে প্রদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকার করে নেওয়া। প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর কর্তব্য হল বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির কাজে নিজেকে অকপটে সঁপে দেওয়া এবং ঐ প্রতিষ্ঠানই স্থির করবে কেনমভাবে এবং কোন পদে আমাদের ঠিকমত কাজে লাগানো যাবে। প্রদেশে বা জেলাস্তরে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত নয় কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্মান, প্রভাব এবং সংহতির হানি ঘটিয়ে থাকে।

আমার ব্যক্তিগত মত হল এই যে রাজনৈতিক কর্মীদের উচিত, বিশেষ কোন অবস্থায় ছাড়া, যেসব পদের সঙ্গে অর্থ বা সম্মান জড়িত তা পরিহার করে চলা। নিজের জন্য কোন পদ আমি পূর্বে চাইনি এবং আশা করি ভবিষ্যতে তা চাইব না। দুর্ভাগ্যক্রতে গত বছর

মেয়রপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ঘটনাচক্রে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির ধারণা হয়েছিল মেয়রপদ একজন ব্যক্তির কুক্ষিগত হওয়া উচিত নয় এবং স্থির হয় যে ডাঃ বি সি রায়কে মেয়রপদে দাঁড় করানো হবে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে অনেক তর্কাতর্কির পর কংগ্রেস মিউনসিপ্যাল পার্টি এই মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে একে আপস প্রস্তাব গ্রহণ করে যে এপ্রিল মাসে মিঃ জে এম সেনগুপ্ত মেয়র পদে নির্বাচিত হবেন এবং পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হলে ডাঃ বি সি রায় পরের বছর মেয়র হবেন। এই ব্যবস্থা বি পি সি সি অনুমোদন করেছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে পুননির্বাচনের সময় যখন আসে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির এক অংশ মিউনিসিপ্যাল পার্টির পূর্ব-গৃহীত আপস প্রস্তাবটি বানচাল করার চেষ্টা করে এবং মিঃ সেনগুপ্তকে মেয়রপদে পুনরায় প্রার্থী দাঁড় করায়। নিজের দায়িত্ব এড়ানোর ইচ্ছা না থাকলে প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির পক্ষে এই শেষ বিদ্রোহ নত মস্তকে স্বীকার করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাংলার কংগ্রেস সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং ঐক্য রক্ষার তাগিদে মিঃ সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে আমাকে মেয়র ও অলডারম্যান পদে প্রার্থী দাঁড় করানোর প্রয়োজন দেখা দেয়।

এখন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং আমার এখন মেয়র হবার দরকার নেই। সেজন্য দলের মিটিং-এ আমি সানন্দে প্রস্তাব করি যে পরের বছর মেয়র পদে আমাদের প্রার্থী হবেন ডাঃ বি সি রায়। সব দিক থেকে তিনি এই পদের যোগ্য। তিনি যে এই উচ্চপদের মর্যাদা রক্ষা করবেন এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এই ব্যবস্থায় বাংলায় এবং বাংলার বাইরে কংগ্রেসের কাজে আমি আরও বেশি সময় এবং শক্তি পাব। আগামী দিনে কংগ্রেসের পতাকা উড্ডীন রাখতে হলে, মনে হয় সব শক্তি দিয়ে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

আমার আরও মনে হয় এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বাতাবরণ স্বচ্ছ করতে এবং তার ফলে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপন করতে সাহায্য করবে। আমি চাই প্রতিটি কংগ্রেসকর্মী নিজের কাজের মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রকাশ করবে যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণের সেবা করা, একমাত্র তার উপর চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পদের জন্য লালায়িত হওয়া বা তা লাভ করা নয়। খাদিকর্মীদের মধ্যে কোন প্রশ্ন, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা থাকবে না। যদি কোন প্রতিযোগিতা থাকে তা হল সেবা ও দুঃখভোগের জন্য প্রতিযোগিতা। নিজের দিক থেকে বলতে পারি দেশবাসীর হৃদয়ে যে আসন পাতা রয়েছে সেই আসনে স্থান পেতে ইচ্ছা করি।

সিলেট কংগ্রেসের বিতর্কের নিষ্পত্তি

বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৭ এপ্রিল ১৯৩১

বিশেষ আনন্দ সহকারে আমি ঘোষণা করছি যে সিলেটে যে অভ্যন্তরীণ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধানে আমরা খানিক দূর অগ্রসর হতে পেরেছি। সিলেটে দুই পক্ষেরই প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের পর, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে শুধু যে সিলেটের জেলা কংগ্রেস কমিটির স্বাস্থ্যসম্মত পুনর্গঠন সাধিত হবে তাই নয়, বিতর্কেরও মীমাংসা হবে।

(১) জেলা কংগ্রেস কমিটির আসন্ন পুননির্বাচনের কথা মনে রেখে, যে-সব অভিযোগগুলি দায়ের করা হয়েছে, সেগুলি বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকবে। ইতিমধ্যে পুরনো কংগ্রেস

কমিটি, শ্রীযুত হরেন্দ্রলাল চৌধুরী যার সেক্রেটারি, বিধিসম্মত কংগ্রেস কমিটি হিসাবে কাজ করবে।

(২) ভবিষ্যতে যাতে এ নিয়ে কোনও অভিযোগ উঠতে না পারে, যে জন্যে সিলেট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সদস্য-বই ছাড়াও, সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সদস্য-বইও সিলেটের শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে দেওয়া হবে।

(৩) সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা সিনেটে ১০ই মে ১৯৩১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। যাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হন, সে জন্যে সভায় সভাপতিত্ব করবেন বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করবেন যথা সময়ে এই সভা আহ্বান করতে এবং তার জন্যে উপযুক্ত সময় ও স্থান ঠিক করতে।

(৪) সিলেট জেলা কংগ্রেস কমিটির পুনর্গঠনের পর নবগঠিত কমিটি বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে পাঠানোর জন্যে সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

(৫) যাঁরা ৩রা মে, ১৯৩১ পর্যন্ত সদস্য তালিকাভুক্ত হবেন, ১০ই মে-র বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।

(৬) ৩রা মে পর্যন্ত যাঁরা সদস্য তালিকাভুক্ত হবেন সেই সদস্য নামের তালিকা অন্তত পক্ষে ৫ মে-র মধ্যে জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে পৌঁছবে, তার সঙ্গে থাকবে 'কাউন্টার ফয়েলগুলি' ও চাঁদা, যদি কিছু থাকে। বি পি সি সি-র প্রেসিডেন্ট একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন ভোটার তালিকা পরীক্ষা করবার জন্যে এবং ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোনও আপত্তি উঠলে তার বিবেচনার জন্যে। কোনও একটি শাখা কংগ্রেস কমিটি জেলা কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে 'অ্যাফিলিয়েটেড' কিনা, সেই বিষয়েও তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে কোনও একটি শাখা কংগ্রেস কমিটি অ্যাফিলিয়েটেড নয়, তা হলে সেই শাখা কমিটির অন্তর্ভুক্ত কোনও সদস্য তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চাইলে, জেলা কংগ্রেস কমিটির অফিসে তাঁর পুরো চাঁদার টাকা জমা দিতে হবে।

আমি আশা করি সিলেটের দুই পক্ষই অতীতের সব কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেলে তাদের সমস্ত মতবিরোধের নিষ্পত্তি করবেন। এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত, সিলেটের সামনে এখন নানা গুরুতর সমস্যা। অতএব, এঁদের মধ্যে একটা মিটমাট এখনই প্রয়োজন।

ফরিদপুরের কথা বলতে গেলে, সম্প্রতি কিছু কিছু অভিযোগ আমার গোচরে আনা হয়েছে। অভিযোগকারীদের আমি নিজে ইতিপূর্বেই জানিয়েছি বিরোধের মীমাংসার জন্যে আমার যা সাধ্য আমি করব। শুধু আমি আশা করব তাঁরা আমাকে সময় দেবেন, এবং ইতিমধ্যে দেখবেন যাতে ফরিদপুরের কংগ্রেসীদের মধ্যে তিক্ততার অবসান হয়।

প্রখ্যাত ভারতীয় স্থপতি এস সি চ্যাটার্জির কাজ

বিদায়ী মেয়র হিসাবে ভাষণ, ১৯ এপ্রিল ১৯৩১

আমার সম্পূর্ণ আশা ভবিষ্যতে কলকাতা পুরসভা আরও বেশি বেশি করে মিঃ চ্যাটার্জির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে এবং সেইভাবে ভারতীয় স্থাপত্যের আনুকূল্য করবে।

মিঃ শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমি ভাবতাম, চিত্রাঙ্কন বিদ্যার নতুন একটি ধারা যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে, স্থাপত্যেরও তেমনি একটি নিজস্ব স্বতন্ত্রধারা কি ভারত সৃষ্টি করতে পারবে ? তার পরেই সংবাদপত্রে আমি মিঃ চ্যাটার্জির কয়েকটি নিবন্ধ দেখলাম। আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং যত তার সঙ্গে কথা বলেছি তত প্রশংসনীয় মনে

হয়েছে তাঁকে।

ঠিক উপযুক্ত সময়টিতে মিঃ চ্যাটার্জি আমাদের সামনে এলেন, এমন এক নতুন ধারার স্থাপত্যের পথিকৃৎ হিসাবে যার চরিত্র সম্পূর্ণ ভারতীয়। পাশ্চাত্য এবং অন্যান্য বিদেশী প্রভাবও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগায়, কিন্তু সেসব প্রভাব আত্মস্থ করে, এবং বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরেও তিনি ভারতকে এবং পৃথিবীকে নতুন কিছু দিতে সক্ষম।

সমস্ত ভারতীয়ই জেনে খুব আনন্দিত বোধ করবেন যে সম্প্রতি মিঃ চ্যাটার্জি আমেরিকা গিয়েছিলেন। তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়েছিলেন যে সে দেশে ভারতীয় স্থাপত্যকে জনপ্রিয় করবেন। সেখানে সফলের মনে তিনি খুব ভাল ধারণার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি জনসমক্ষে আসার পর থেকে, কলকাতা পুরসভার গৃহনির্মাণ বিভাগ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তাঁর প্রভাবাধীন হচ্ছে, এবং পুরসভার যে সরকারি মুখপাত্র, 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট', তাঁর লেখা প্রচারের ব্যবস্থা করছে।

আমি বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জির কর্মজীবন আমি প্রচুর আগ্রহ সহকারে অনুধাবন করে যাচ্ছি, এবং ভবিষ্যতেও করব। সর্বান্তঃকরণে আমি কামনা করি তিনি কৃতকার্য হন। কেননা আমি জানি তিনি কৃতকার্য হলে ভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটবে, বিশ্বসভ্যতাও হবে সমৃদ্ধতর।

আমার জীবনের স্বপ্ন

ফরিদপুরে অম্বিকা মেমোরিয়াল হলে প্রদত্ত ভাষণ
২০ এপ্রিল ১৯৩১

আরাম ও বিলাসের পথ পরিত্যাগ করে আমি যে দিন অজানার দিকে ঝাঁপ দিলাম, যে অজানা সব যুগে সব দেশে তরুণদেরকে আকৃষ্ট করেছে, সে আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন। তা নিয়ে আমি আফশোষ করিনি কোন দিন। আমি সেদিন সেই সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলাম, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। তার কারণ এক গৌরবোজ্জ্বল স্বপ্ন আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, বিদেশি শাসনের শৃঙ্খলযুক্ত ভারতমাতা বিশ্ব সমাজে এক মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিতা। আমার স্বপ্ন যেদিন সত্য হবে, তেমন দিন যদি আমার জীবনে না আসে, আমি আমার দেশবাসীকে সে দায়িত্বের উত্তরাধিকার সমর্পণ করে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নেব।

সর্বত্র স্বপ্নদর্শীরা জাতির ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন। মাৎসিনি তাঁর স্বাধীন ইটালির স্বপ্নের কথা বলেছিলেন, সবাই বলেছিল তিনি ভাল লোক নন। দ্রুত, উপর্যুপরি নির্যাতন এসে পড়তে লাগল তাঁর ওপর। তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে লাগল সেই সমস্ত শক্তি, যারা পছন্দ করত না তরুণদের। তারা তো জানত না তরুণেরা মনে মনে কী ভাবে। তারা কেমন যেন বুঝতে পারত, ওই তরুণেরা যে স্বপ্ন দেখে, আপাতদৃষ্টিতে যে-সব স্বপ্ন মনে হয় অর্থহীন, তারই মধ্যে এমন সব বীজ নিহিত, যে বীজ কালক্রমে বৃহৎ আকার ধারণ করবে, তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন করে তুলবে। সেই জন্যেই আমি ক্ষমতা ও উচ্চপদের মোহ ত্যাগ করে আমার স্বপ্নের পথই অনুসরণ করব স্থির করেছিলাম।

ফরিদপুর কংগ্রেসের বিতর্কের মীমাংসা

২৩ এপ্রিল ১৯৩১-এ ফরিদপুর জেলায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে অমীমাংসিত বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি সম্পর্কে বিবৃতি

দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসীদের মধ্যে ঐক্য যেহেতু প্রয়োজন, অতএব ফরিদপুরের কংগ্রেসকর্মীদের এখন উচিত তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা এবং জেলায় একটি সুসংহত কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলা। সেই কথা মনে রেখে আমি অমীমাংসিত বিরোধগুলির মীমাংসার জন্যে উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। উভয় পক্ষই নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুমোদন এবং সমর্থন করেছেন। সমস্যার এটাই সন্তোষজনক সমাধান এবং উভয়পক্ষই এই আপোষ মীমাংসায় সম্মত।

(১) জেলা কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে যে সমস্ত আবেদন ও অভিযোগ বিরোধীরা দাখিল করেছেন, সে-সব প্রত্যাহৃত হবে।

(২) গত জানুয়ারিতে নির্বাচিত উক্ত জেলা কমিটি বৈধ ফরিদপুর জেলা কংগ্রেস কমিটি হিসেবে কাজ করে যাবে।

(৩) আগামী জুন মাসে জেলা কংগ্রেস কমিটির আবার নির্বাচন হবে।

(৪) সাধারণ নির্বাচনের আগে, ২৫শে মে ১৯৩১ পর্যন্ত নতুন সদস্যদের তালিকাভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে। আগামী ২৫শে মে পর্যন্ত যাঁরা সদস্য হবেন তাঁরা জেলা কংগ্রেস কমিটির আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

(৫) ভাঙা মহকুমা কংগ্রেস কমিটির বিলোপ এবং তাকে সদর মহকুমা কংগ্রেস কমিটির অঙ্গীভূত করার ফলে যে সব অভিযোগ উঠেছে, জেলা কংগ্রেস কমিটি সেগুলি বিবেচনা করবে এবং পরবর্তী জেলা নির্বাচনের আগে ভাঙাকে একটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস মহকুমা করবে।

আশা করা যায় উল্লিখিত ব্যবস্থা সমূহের দ্বারা অমীমাংসিত সব অভিযোগ এবং ক্ষোভ দূর হবে এবং একই সঙ্গে জেলা কংগ্রেস কমিটির মর্যাদা এবং শৃঙ্খলা রক্ষিত হবে। আমাদের আরও আশা, এই ব্যবস্থা উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন সূচিত করছে, জেলা কংগ্রেস কমিটির ঐক্য এবং শক্তি এতে প্রতিফলিত হচ্ছে, এবং এর ফলে জনসাধারণের চোখে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

আমার যত দূর সাধ্য আমি নিজে দেখব যাতে জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনের জন্যে রিটার্নিং অফিসারদের নিয়োগ সম্পর্কে অভিযোগের কোন কারণ না থাকে। যথাসাধ্য এও দেখব যাতে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ যদি কিছু ওঠে, অভিযোগকারীরা যেন পূর্ণ সুবিচার পান।

ময়মনসিংহের ঘটনা, এবং তার পর

২৫ এপ্রিল ১৯৩১-এ কলকাতায় সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি

ময়মনসিংহে যেসব ঘটনা ঘটে গেল, আজ সকালে খবরের কাগজে তার বিবরণ পড়ে আমি বেদনা বোধ করেছি। ঠিক কী কী ঘটেছে তার পিছনে গূঢ় কারণই বা কী ছিল, সে বিষয়ে যথার্থ কোনও ধারণা করা খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে তার ভিত্তিতে সম্ভব নয়। তবে সেসব বিবরণ থেকে এবং খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেল, তা থেকে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে :

নেত্রকোণায় দুটি সম্মেলন হবার কথা ছিল, শ্রীযুত জে এম সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সম্মেলন, এবং শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের পৌরোহিত্যে জেলা ছাত্র

সম্মেলন। ভুল বোঝাবুঝির উৎপত্তি হল যখন ময়মনসিংহে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করে নেত্রকোণায় জেলা ছাত্র সম্মেলনের কাজে বাধা সৃষ্টি করা হতে লাগল। ছাত্রদের প্রায় সকলেই তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। আসল সম্মেলনটি পণ্ড করবার কাজে শ্রীযুত সেনগুপ্ত যে অনবধানতাবশত হাত মেলালেন, তাতে যে সব ছাত্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা শ্রীযুত সেনগুপ্তর ময়মনসিংহে পৌঁছবার আগে, এবং তার পরেও, তাঁকে একটা মিটমাট করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেন। তাঁরা এমন কথাও বললেন, নেত্রকোণার আসল সম্মেলনে তিনিই সভাপতি হন, যাতে একটা মিটমাট হয়। সেই ভিত্তিতে একটা মিটমাট শ্রীযুত সেনগুপ্ত কেন করলেন না, এত দূর থেকে বোঝা মুস্কিল।

শ্রীযুত সেনগুপ্ত তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন ময়মনসিংহের সম্মেলন না হক, মিটমাটের স্বার্থে তাতে তিনি রাজি ছিলেন, কিন্তু ময়মনসিংহের অভ্যর্থনা সমিতি তাতে বাধা দিল। হয়তো, তিনি যদি দৃঢ় থাকতেন, অভ্যর্থনা সমিতিকে স্বমতে আনবার জন্যে নিজের প্রভাব খাটাতেন, মিটমাট করে দিতে সক্ষম হতেন। তা হলে নেত্রকোনায় দুটি সম্মেলনেই পৌরোহিত্য তিনি করতে পারতেন। এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী হতেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ময়মনসিংহে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর প্রভাবকে তিনি পরাস্ত করতে পারলেন না।

ছাত্রদের মধ্যে বিসংবাদের পরিণতিতে শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি যে অসম্মান ও অসৌজন্য করা হল তাতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত, যেদিন কয়েকজন তরুণ ডাঃ বি সি রায়কে গত বছরের মেয়র নির্বাচনের উপলক্ষে অসম্মান করেছিলেন, তার পর থেকেই যে বিশৃঙ্খলা আমাদের তরুণদের গ্রাস করেছে তাতে আমি বেদনা বোধ করি। এই অবস্থায় দায়িত্বশীল নেতাদের কী করণীয় তা অতি পরিষ্কার। যে সমস্ত সভায় দলীয় মনোভাব এত প্রবল হয়ে ওঠে যে রাজনৈতিক জীবনে পালনীয় সাধারণ ভদ্রতাও লোকে ভুলে যায়, সেখানে পৌরোহিত্য করতে তাঁদের অস্বীকার করা কর্তব্য।

খবরের কাগজে শ্রীযুত সেনগুপ্তের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে বি পি সি সি সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য আছে যাকে একটি নিন্দাসূচক ইঙ্গিতই বলা যায়, বি পি সি সি-র কার্যকরী সমিতি সম্পর্কে। বি পি সি সি গঠিত হয়েছে বঙ্গদেশের সব জেলার, এবং বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। বি পি সি সি-র কিছু সদস্য হয়তো এক দিকে ঝোঁকেন, তা হলে অন্য সদস্যরা আবার বিপরীত দিকে ঝোঁকেন। ময়মনসিংহের ছাত্রদের মধ্যে যে বিরোধ সেটা সম্পূর্ণ স্থানীয় ব্যাপার। ময়মনসিংহে ১৯২৯ সালে যে রাজ্য ছাত্র সম্মেলন হয়েছিল, তাতে ছাত্রদের মধ্যে বিরোধের কথা লোকে হয়তো ভুলে যায়নি। ময়মনসিংহের স্থানীয় বিরোধের ব্যাপারে বি পি সি সি-র কর্মকর্তাদের কোনও হাত ছিল, এমন ইঙ্গিত করা অন্যায় এবং যিনি সে ইঙ্গিত করেছেন তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত। এ রকম ইঙ্গিতের দ্বারা পারস্পরিক সদিচ্ছাও বৃদ্ধি পায় না।

সর্বসাধারণ জানে সারা বাঙলায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্যে রীতিমত একটা চেষ্টা চলছে। সিলেট এবং ফরিদপুরের বিরোধের মীমাংসায় আমরা যে সাফল্য পেয়েছি তাতে যাঁরা শান্তি ভালবাসেন তাদের উৎসাহ ও মনোবল বেড়ে গেছে। ময়মনসিংহের ঘটনায় আশা করি তাঁরা নিরুৎসাহ হবেন না, কারণ সেটা নিতান্তই একটা অস্থায়ী ব্যাপার। ময়মনসিংহের সব কংগ্রেসকর্মীকে আমি অনুরোধ করি, ছাত্রদের মধ্যে বিরোধের দ্বারা তাঁরা যেন কোনওক্রমেই প্রভাবিত না হন। সকলে একপ্রাণ হয়ে যেন ছাত্রদের মধ্যে মিটমাট যাতে হয় তার চেষ্টা করেন।

কুষ্ঠিয়া মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন

কুষ্ঠিয়ায় ভোটাদাতাদের প্রতি আবেদন
১০ মে ১৯৩১

কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেছে কুষ্ঠিয়ার পৌর প্রশাসন নিজের হাতে নেবে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করার মত কোনও প্রতিষ্ঠান যদি থেকে থাকে, তা হল কংগ্রেস, কেন না জনগণের যা আদর্শ কংগ্রেসের আদর্শও তাই। সর্বসাধারণ চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে তার অভীষ্ট পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বাস্তবে সে অভীষ্ট অর্জন করতে সে বদ্ধপরিকর। পূর্ণ স্বাধীনতা জয় করার অর্থ দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের দারিদ্র্য, দুঃখযন্ত্রণা এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি। সেই জন্যে, কংগ্রেসের শক্তি যত বাড়বে জনসাধারণের দুঃখের ভার তত লাঘব হবে, দাসত্বের হীনতা মোচন তত সহজ হবে। সেই উদ্দেশ্যেই প্রয়াত দেশবন্ধু পুরসভা ভবনের শীর্ষে জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন।

কুষ্ঠিয়ার নাগরিকেরা নানাভাবে কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের ভালবাসার প্রমাণ ইতিপূর্বেই দিয়েছেন। বিগত আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কুষ্ঠিয়ার ব্যবসায়ীরা উদার হস্তে কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডারে দান করেছিলেন। কুষ্ঠিয়ার বাজারে বিদেশী বস্ত্র বিক্রি কুষ্ঠিয়ার ব্যবসায়ীরা অসম্ভব করে তুলেছেন, জনগণের মনোভাব তার বিরুদ্ধে জাগ্রত করে ; মহিলারা সানন্দে অলঙ্কার বর্জন করেছেন, তরুণেরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন। কুষ্ঠিয়া অতীতে যা করেছে, এখন আবার তাই করবে, এই আমাদের প্রত্যাশা। আমরা আশা করি কংগ্রেসের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষিত হবে।

কুষ্ঠিয়ার নাগরিকদের কাছে আমার ঐকান্তিক আবেদন, নিজের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে গিয়ে সব দলাদলি বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসকে তাঁরা যেন জয়ী করেন, যাতে কুষ্ঠিয়ার পুরভবনে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলিত হতে পারে।

পূর্ণ স্বাধীনতা ও তার তাৎপর্য

নোয়াখালিতে প্রদত্ত ভাষণ
১৫ মে ১৯৩১

জীবনের সব ক্ষেত্রে সব অর্থে আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্ণ স্বাধীনতা যেন একটি প্রদীপ। প্রদীপটি জ্বাললে বাড়ির প্রত্যেকটি কোণা, আনাচ-কানাচে আলোকিত হয়ে ওঠে। পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তি হবে মানুষের সাম্যের, সমাজতান্ত্রিক আর্দশের ওপর। রাশিয়ায় এক রকম মতবাদ প্রচলিত, আজকের ইটালিতে আরেক রকম। ভারতকে সাম্য এবং গণতন্ত্রের অর্থ বুঝতে হবে নিজের মত করে। ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দেয়, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য কী করে আনতে হয়। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারত দাঁড়াবে সেই বুনিয়াদের ওপর। উপনিষদের কাল থেকে আরম্ভ করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ পর্যন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের আদর্শ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হবে আমাদের মধ্যে। আমাদের সম্মিলিত সভ্যতা আমরা স্থাপন করব বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে নানা ধারার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর। ভারতের আদর্শ যুদ্ধ নয়, প্রেম, সেই প্রেম হবে সে সভ্যতার ভিত্তি। এই যে মস্ত বড় সমস্যা, তরুণদেরই করতে হবে এর সমাধান, সে আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে হবে তরুণদেরই। বিভিন্ন যুব ও অন্যান্য সংগঠন তো এক-একটি শাখানদী, যে বিরাট নদীকে তারা পুষ্ট করছে, সেটি হল কংগ্রেস, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির মত বিদ্রোহীর ভাব দেখাবে না ছোট ছোট

প্রতিষ্ঠানগুলি। তারা শুধু কংগ্রেসকে অধিকতর শক্তিশালী করবে। ইংরেজরা ভারতের বিরুদ্ধে তাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে, মিস মেয়োকে ব্যবহার করে, কিন্তু তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করেছেন ভারতের নারীগণ, বৎসরব্যাপী অকুতোভয় সংগ্রামের দ্বারা। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রয়োজন মাতা এবং ভগিনীগণের আত্মত্যাগ। তাঁদের বাদ দিলে 'ভারতীয় জাতি' কথাটিই অর্থহীন।

আমরা ভুলে গেছি দেশবন্ধু আমাদের কী বলেছিলেন। আমাদের জাতীয় চেতনা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, আমরা পথ হারিয়ে দলাদলির মনোভাবের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। তার একটি প্রধান কারণ ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশের ধারণা বিস্মৃত হয়েছি আমরা। ভৌগোলিক ঐক্যই কী যথেষ্ট ? না। যে ধ্যানধারণা অতীতে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে এত সাহায্য করেছিল, তাকে নবজন্ম দিতে হবে। আমি সকলের কাছে আবেদন করেছিলাম, তাঁরা যেন ঐক্যবদ্ধ হন, পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সবদিক থেকে অর্জন করুন, প্রস্তুত থাকুন চরম ত্যাগের জন্যে। মহাত্মা গান্ধী যে ন্যূনতম ত্যাগের শিক্ষা দিয়েছেন, তা সর্বসাধারণের জন্যে। কিন্তু তরুণ সমাজের সে ত্যাগ হবে বৃহত্তম। তরুণদের এক কার্যকর কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাদের দেহ শক্তিশালী হয়, চিত্ত সবল হয়, ত্যাগের প্রবৃত্তি জাগে, আত্মার প্রসার ঘটে। আমরা চাই হাজার হাজার যতীন দাস, আমরা চাই তরুণদের নিঃস্বার্থ আত্মনির্ভরতা। তরুণেরাই সৃষ্টি করবে ভবিষ্যতের ভারত, যে ভারতে স্থান থাকবে নারী-পুরুষ, শ্রমিক, কৃষক এবং অন্য সকলেরই।

তরুণসমাজ ও ভারতের ভষ্যিৎ

নোয়াখালি যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
১৭ মে ১৯৩১

বাংলা দেশের তরুণদের মধ্য থেকে আমরা এমন হাজার হাজার যতীন দাস চাই যাঁরা হবেন তাঁর মত স্বার্থবোধশূন্য। আমরা চাই নতুন এক তরুণদল যাঁরা ভরপুর থাকবেন জাতীয় চেতনায়। কারণ তরুণেরাই সৃষ্টি করবেন ভবিষ্যতের ভারত, যে ভারতবর্ষে নারী-পুরুষ, শ্রমিক-কৃষক সকলেরই ওপর বর্ষিত হবে স্বাধীনতার আশীর্বাদ। আমি আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা হৃদয়ঙ্গম করুন কী গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আপনাদের পালন করতে হবে অদূর ভবিষ্যতেই, তার পর এগিয়ে চলুন। একমাত্র শৃঙ্খলিতা মাতৃভূমির মুক্তি সাধনা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা যেন আপনাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করে। ম্যাটসিনির কথা, সেই সময়কার ইটালির কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে পারি। শতধা বিভক্ত ছিল সে জাতি, আরও অনেক বাধা ছিল তাঁর সামনে, তাতেও, তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর ম্যাটসিনির চিত্তকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি, বিচলিত করতে পারেনি তাঁকে ইতালির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য থেকে, স্বাধীনতা তর্ক-বিতর্ক, বিবাদ-বিসম্বাদের দ্বারা লাভ করা যায় না, তার জন্যে প্রয়োজন প্রকৃত সাধনা, কর্মযোগ, তার জন্যে প্রয়োজন মাতৃভূমির বেদীতলে সব স্বার্থলোলুপতা, সব ক্ষমতার আকাঙ্খার বলিদান। আজকাল তরুণদের মধ্যে একটা অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। এটা বাঞ্ছনীয়, কেননা এটা জীবনের চিহ্ন, সত্যের অনুসন্ধানের লক্ষণ। একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে যুব-আন্দোলনে।

মিস মেয়োর হাত দিয়ে ইংরেজরা তাদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। কিন্তু ভারতের নারী সমাজ এক বৎসরব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা প্রমাণ করেছে, তাঁর প্রচার মিথ্যা। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে তাঁর মায়েদের ত্যাগ, বোনেদের ত্যাগ প্রয়োজন। তাঁদের বাদ দিয়ে "ভারতীয় জাতি" কথাটাই ভুল।

বঙ্গদেশের এখনকার রাজনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আমরা বিস্মৃত হয়েছি দেশবন্ধু কীসের ওপর অত জোর দিয়েছিলেন। জাতীয়তাবোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ডুবে যাচ্ছি দলাদলির মধ্যে। এটা সম্ভব হচ্ছে সম্ভবত এই কারণে যে ঐক্যবদ্ধ বঙ্গদেশের ধারণা আমাদের মনে থাকে না। শুধু ভৌগোলিক ঐক্যই যথেষ্ট নয়। অতীতে যে ধ্যান-ধারণা ভারতীয় জাতি গঠনে এত সহায়তা করেছিল তাকে আবার পুনরুদ্ধার করতে হবে।

দুর্দশার কবলে উত্তরবঙ্গ

২২ মে ১৯৩১-এর আবেদন

সর্বসাধারণ ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন, সমগ্র উত্তরবঙ্গে দুঃখ-দুর্দশা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। যে-সব জায়গায় তার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে একটি হল গাইবান্ধা। অন্নহীনতা, অভাব এবং দুর্ভোগের মর্মান্তিক বিবরণ প্রতিদিন অজস্র এসে পৌঁছচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এক গাইবান্ধা মহকুমাতেই তিন লক্ষের বেশি লোক দুর্দশাগ্রস্ত। উদ্ধারকার্য, দুর্দশার লাভব যতদূর সম্ভব এখনই শুরু করা প্রয়োজন। গাইবান্ধা কংগ্রেস কমিটি সে কাজ হাতে নিয়েছে শুনেছি। সর্বসাধারণের প্রতি আমার আবেদন, উদারহস্তে সাহায্য করুন। সমস্ত দান, মৌলবী মহিউদ্দীন খান, প্রেসিডেন্ট, গাইবান্ধা কংগ্রেস কমিটির কাছে পাঠাবেন।

ভারতের বন্ধনমোচনের অর্থ মানবজাতির প্রাণ রক্ষা

মথুরায় ইউ.পি. নওজোয়ান ভারত-সভার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ
২৬ মে ১৯৩১

বন্ধুগণ, আপনাদের মত যাঁরা দেশভক্ত কর্মী এবং স্বাধীনতাপ্রেমী তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের যে সুযোগ আপনারা আমায় দিয়েছেন, তার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। যে সম্মান আপনারা আমাকে প্রদর্শন করলেন, আমি তার যোগ্য নই। আমার নিজের কোনও গুণের জন্যে নয়, আমার মত এক সহকর্মীর প্রতি ভালবাসাবশতই আপনারা সে সম্মান দিয়েছেন আমাকে। এ ধরনের একটি সম্মেলনে যখনই আমরা যোগ দিতে আসি, তখন প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে উদিত হয়, সেটি হল : দেশে সর্বোচ্চ জাতীয় সংগঠন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস থাকতে স্বতন্ত্র একটি নওজোয়ান ভারত-সভা আন্দোলনের কী প্রয়োজন ? এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে অনেক সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে, এবং অন্যান্য জনসংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থানটাও নির্ধারিত হবে।

নওজোয়ান ভারত-সভা আন্দোলন একটি স্থানীয় অথবা প্রাদেশিক সংগঠন নয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর নাম আলাদা আলাদা হতে পারে, এর কার্যপদ্ধতি ও কর্মসূচিতে অল্পস্বল্প পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু মূলত সমগ্র দেশে এর চরিত্র একই। আর, এই আন্দোলনের অস্তিত্ব থেকেই প্রমাণ হয়, এর উদ্ভবের কারণ ছিল।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এই আন্দোলনের প্রেরণা এসেছে, একটা অস্থিরতা, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা অসহিষ্ণুতা থেকে, মৌলিক পরিবর্তনের এক গভীর আকাঙ্খা থেকে। সেই মূলগত অনুভূতির মধ্যে যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমনি সৃষ্টিধর্মী উপাদানও আছে। তরুণদের দৃষ্টি যে মনে হয়েছে প্রাচীন, অনুপযোগী, অকর্মণ্য এবং মন্দ তার ধ্বংসের ইচ্ছা, আর যা ভাল,

কার্যোপযোগী ও সুন্দর তার সৃষ্টির ইচ্ছা এত প্রবল যে বর্তমান কোনও আন্দোলন, প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠন সেই প্রবল ইচ্ছাকে উপযুক্তভাবে রূপ দিতে পারে না। সেই কারণে তরুণেরা মনে করলেন একটা আন্দোলন শুরু করা দরকার, একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার, যার দ্বারা তাদের ধ্বংসাত্মক এবং সৃষ্টিধর্মী প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাগুলির যথাযথ প্রকাশ ঘটবে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে কাজ করতে হয় কতকগুলো অসুবিধার মধ্যে। একটা দায়িত্ববোধের বোঝা তার ওপর চাপান আছে, যুব সংগঠনগুলির হয় তো প্রথম দিকে তা থাকে না। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে যত দূর সম্ভব সব দেশবাসীকে নিয়ে কাজ করতে হয়। সেই কারণে তাকে এগোতে হয় একটু ধীরগতিতে। তা ছাড়া, কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজনীতির সঙ্গে সব সম্পর্ক নেই তেমন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না।

সব শেষে, সমগ্র দেশকে নিয়ে কাজ করতে হয় বলে, দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী এবং মতবাদের মধ্যে তাকে সামঞ্জস্যবিধান করতে হয়, এবং নিজের গতিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে হয়।

দেশের যুব-সংগঠনগুলো চরিত্রে এবং মানসিকতায় নির্ভেজাল প্রগতিপন্থী। তাঁদের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি। এখনই সমগ্রজাতিকে নিয়ে তাদের চলবার দরকার নেই, কেননা তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করাই তাদের প্রধান কর্তব্য। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মত তাদের ঘাড়ে দায়িত্ববোধের বোঝাও চাপান নেই। সেই জন্যে তারা যত খুশী দ্রুত গতিতে চলতে পারে, যত খুশী প্রগতিপন্থী হতে পারে। কোন ব্যক্তি, কোন গোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হল, তা নিয়ে তাদের কোনও ভয় নেই।

ইতিহাসে এমন ঘটনা অনেকবার ঘটেছে, কোন মূল সংস্থার একটি চরমপন্থী শাখা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অবাধ আত্মপ্রকাশের জন্যে নিজেদের একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে।

এই দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা পারস্পরিক সংঘাত এড়াতে পারবে কিনা, উভয়েরই, এবং সাধারণভাবে সমাজের মঙ্গলের জন্যে মিলিতভাবে কাজ করতে পারবে কিনা, সম্পূর্ণ নির্ভর করে সংস্থা দুটির সদস্যদের ওপর। ভারতে আমরা এখন দেখছি, কোথাও কোথাও কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুবসংগঠনের কোন বিরোধ নেই আবার কোনও কোনও অঞ্চলে বিরোধ বাধছে।

যুব সংগঠনের সঙ্গে কংগ্রেসের অকারণ বিরোধ যাতে না বাধে, সে জন্যে দুটি জিনিস প্রয়োজন। যুব সংগঠনের মনে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা থাকা চাই, এবং কংগ্রেসের যে সংগঠন, যুবজনের আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে তারও সহানুভূতি থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে, যেখানে কংগ্রেসের সংগঠনটি যুবজনের হাতে, কিংবা যাঁরা তরুণদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এমন লোকেদের হাতে, সেখানে সংঘাত প্রায়ই এড়ান যায়।

আমার দৃঢ় অভিমত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নওজোয়ান ভারত-সভার মধ্যে প্রকৃত কোনও বিরোধ নেই। যদি বিরোধ অথবা ভুল বোঝাবুঝি কোথাও দেখা দিয়ে থাকে, তা আমাদেরই তৈরি, উভয়পক্ষের সদিচ্ছা থাকলে সহজেই তার অবসান করা যায়। কংগ্রেস এবং নওজোয়ান ভারতের মধ্যে বিরোধ ও ভুল বোঝাবুঝি যদি অপসৃত না হয়, আমার মত যাঁরা পুরোদস্তুর কংগ্রেসী এবং যুব-আন্দোলনেরও সমর্থক, তাঁদের অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক।

যদি নওজোয়ান ভারত-সভাকে মনে করা হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পুষ্টিসাধনকারী একটি আন্দোলন, আমার মতে সেইটিই হবে সঠিক ধারণা। সদস্য সংখ্যা নিয়ে যুব-আন্দোলনের কোনও পরোয়া থাকবে না। তার একমাত্র চেষ্টা হবে, সমাজে যারা প্রগতিবাদী তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা। শুধুমাত্র রাজনীতিই নয়, মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি অংশ নিয়েই তাকে মাথা ঘামাতে হবে, রাজনৈতিক জাতি-গঠনই নয়, সম্পূর্ণ নতুন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থারও পত্তনের চেষ্টা করতে হবে, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাবলীর ওপর ওপর সমাধান করলেই হবে না, জীবনের যেসব গভীরতর সমস্যা, সেগুলোকেও হাতে নিতে

হবে, তারও সমাধানের চেষ্টা করতে হবে, যদি দু' পক্ষেরই সদিচ্ছা থাকে, কোনও রকম সংঘাত ছাড়াই এ-সব কাজ করা খুবই সম্ভব।

নওজোয়ানদের নিজেদেরও বুঝতে হবে, কংগ্রেস সমগ্র জাতির প্রতিভূ। কাজেই এমন কিছু করা উচিত নয়, যার দ্বারা কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সে মর্যাদা বিপন্ন হয়। তাদের উচিত কংগ্রেসকে সাহায্য করার মনোভাব নিয়ে কাজ করা। ইচ্ছে করলে তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই 'লিডার' হিসেবে কাজ করতে পারেন, কংগ্রেসের যাঁরা দক্ষিণপন্থী অথবা রক্ষণশীল, তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্যে।

আর, কংগ্রেসীদের কথা বলতে গেলে, নওজোয়ানদের প্রতি সন্দিগ্ধ, শত্রুসুলভ মনোভাব পোষণ করা তাঁদের উচিত নয়। তাঁদের মনে রাখা উচিত, যাই হক, নওজোয়ানেরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী, তাঁদের কী আশা-আকাঙ্খা তা বোঝা উচিত, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা উচিত তাকে। এইভাবে উভয়পক্ষই যদি বন্ধুত্বের ভাব নিয়ে কাজ করে, আমার কোনও সন্দেহ নেই, সংঘাত, সংঘর্ষ, ভুল বোঝাবুঝি সহজেই এড়ান যাবে।

করাচিতে অল-ইন্ডিয়া নওজোয়ান ভারত-সভার গত অধিবেশনে আমি নওজোয়ানদের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে কংগ্রেসের বাইরে থেকে কংগ্রেসের বিরোধিতা না করে তাঁদের উচিত কংগ্রেসের বাম-পন্থী শাখা হিসেবে নিজেদের সংগঠিত করা। তাতে, কংগ্রেসের ক্ষতি করার বদলে তাঁরা তার শক্তি বৃদ্ধি করবেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। কংগ্রেস প্রগতিবাদী সংগঠন, জনমতের প্রভাব পড়ে তার ওপর। তার যেমন গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, তেমনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও আছে, এবং সে গড়ে উঠেছে অতীতের বহু প্রজন্মের মানুষের বিরাট বিরাট ত্যাগের ওপর। তার অতীতের এবং বর্তমানের নেতারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এবং, সবশেষে আমি প্রশ্ন করি, "পৃথিবীতে কোথায় পাবেন মহাত্মা গান্ধীর মত আরেকজন নেতা ?"

কংগ্রেস যদি ভারতকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা আরম্ভ না করত,—যদি কংগ্রেস প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন হত, জনমতে যদি সাড়া দিতে সক্ষম না হত, কংগ্রেস নেতারা যদি স্বার্থপর হতেন, দেশপ্রেম না থাকত তাঁদের মধ্যে, তা হলে আমি আমার নওজোয়ান কমরেডদের পরামর্শ দিতে পারতাম, আপনারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যান, অন্য পথে কাজ করুন। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস যতটা না অন্যদের ততটা নওজোয়ানদের, কেননা তারাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী। অতএব, সারা ভারতে নওজোয়ানেরা যদি মনপ্রাণ দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেন, কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কাজ করেন, অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের হাতেই এসে পড়বে কংগ্রেসের সংগঠন।

আমি আগেই বলেছি, নওজোয়ান ভারত-সভা আন্দোলন স্থানীয় কিংবা প্রাদেশিক একটা ব্যাপার নয়। এখন আরও এগিয়ে বলি, এ এক বিশ্বজনীন ঘটনাকে মূর্ত করেছে। স্বাধীন দেশেও যুব-আন্দোলন আছে। তার কারণ, সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদের সমগ্র জীবন নতুন করে ভেঙে গড়া,—জাতির জীবন এবং ব্যক্তির জীবন, দুই-ই। সে উদ্দেশ্য যতদিন না পূর্ণ হচ্ছে যুব-আন্দোলনের মৃত্যু নেই।

আদিমতম যুগ থেকে, মানবজাতি সন্ধান করেছে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার। একইভাবে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে চলেছে সেই অনুসন্ধান এবং শুধু যোগী-ঋষি এবং স্বপ্নদর্শীরাই নয়, রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রনীতিবিদরাও তার সন্ধান করেছেন। আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে, কিন্তু সে-সবের পিছনে কাজ করেছে একই আবেগ। প্রাচ্যে মানুষ স্বপ্ন দেখেছে এক ধর্মরাজ্যের, পাশ্চাত্যে এক আদর্শ প্রজাতন্ত্রের। কখনও কখনও মানুষ চেষ্টা করেছে সেই "প্রাকৃতিক অবস্থায়" (state of nature) ফিরে যেতে যার থেকে, তার ধারণা, তার উদ্ভব হয়েছিল, আবার কখনও তারা যুগযুগান্তের সব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন ভেঙে ফেলে অতীতের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে তুলতে চেয়েছে এমন কিছু যা মহান।

উন্নততর ব্যবস্থার সন্ধানে যুগে যুগে মানবজাতি আলো-আঁধারির গোধূলিতে হাতড়ে

বেড়িয়েছে। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সবই চেষ্টা করেছে এই আদর্শের আলেয়ার ওপর, যাকে ধরা যায় না তার ওপর, কিছু আলোকপাত করতে। যুগ থেকে যুগান্তরে প্রত্যেক সভ্য দেশে এই যে-সব প্রচেষ্টা চলেছে, তার ইতিহাস অনুধাবনের চেষ্টা কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারত, কিন্তু তাতে বড় বেশি সময় যাবে এবং আমাদের ঠিক সামনে এখন যে সমস্যা তার দিক থেকে আমাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার। এখন এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মানুষ এখন প্রগতির তত্ত্বই গ্রহণ করেছে, এবং তার বিরুদ্ধ যে তত্ত্ব, মানুষের পতনের এবং অবনতির তত্ত্ব, তাকে খারিজ করেছে। এই প্রগতির তত্ত্ব থেকেই আমরা আমাদের আলোচনা আরম্ভ করতে পারি।

যে সমস্ত সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শ যুগে যুগে মানুষের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে অনুপ্রাণিত করেছে, তার একটা তুলনা বিশ্লেষণ যদি করি, কতকগুলো মূলনীতিতে আমরা পৌঁছতে পারি। আবার, আমরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছব যদি নিজেদের অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালিত করি, নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, কোন নীতি, কোন আদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের জীবন মূল্যবান হবে। এই দুই পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমাদের সমষ্টিগত জীবন যে নীতিগুলির ওপর স্থাপিত হওয়া উচিত, তা হল, ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা এবং ভালবাসা। এ বিষয়ে কোনও তর্ক বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন যে আমাদের সব কাজকর্ম, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক, পরিচালিত হওয়া উচিত ন্যায়বিচারের ধারণার দ্বারা। কারও প্রতি অবিচার, পক্ষপাতিত্ব যদি না করতে হয়, সব মানুষকে সমান জ্ঞান করতে হবে। সকলকে সমান করতে গেলে সকলকে স্বাধীন করতে হবে। দাসত্ব, তা সে সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক যাই হোক, মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, নানা প্রকারের অসাম্যের সৃষ্টি করে। অতএব সাম্য সুনিশ্চিত করতে, সমস্ত রকম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব দূর করতে হবে, আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে, সর্বাংশে স্বাধীন হতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ বিশৃঙ্খলা অথবা স্বেচ্ছাচার নয়। স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, কোন আইন থাকবে না। স্বাধীনতার অর্থ শুধু, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আইন ও শৃঙ্খলার বদলে আসবে আমাদের নিজেদের আইন, নিজেদের শৃঙ্খলা। আমাদের নিজেদের ওপর আরোপিত নিজেদের শৃঙ্খলার প্রয়োজন শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেই হবে না, যখন আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি, তখন তার প্রয়োজন আরও বেশি। অতএব, শৃঙ্খলা, সমাজেরই হক আর ব্যক্তিরই হক, তার ওপরই জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। সব শেষে, এই সব মূলনীতি, যথা ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা এবং শৃঙ্খলা, থাকতেই পারে না, যদি না থাকে উচ্চতর আরেকটি নীতি অর্থাৎ ভালবাসা। ভালবাসার, মানবিকতায় অনুভূতির অনুপ্রেরণা যদি না থাকে, আমরা সকলের প্রতি ন্যায়বিচারও করতে পারব না, সব মানুষের প্রতি সম আচরণও করতে পারব না, স্বাধীনতার জন্যে দুঃখবরণ, কিংবা ত্যাগস্বীকার করবার প্রয়োজনও বোধ করব না, আর উপযুক্ত শৃঙ্খলাও আনতে পারব না। অতএব, আমার মতে, এই পাঁচটি নীতিই আমাদের সমষ্টিগত জীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। আরও একটু এগিয়ে বরং বলি, ওই নীতিগুলির মধ্যে নিহিত আছে সমাজতন্ত্রবাদের সার—আমি সমাজতন্ত্র যেমন বুঝেছি, যে সমাজতন্ত্র আমি ভারতে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই।

আমার বিশ্বাস, আমাদের সামনের ভবিষ্যতে ভারত এমন একটি আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারবে, যা নানা দিক থেকে পৃথিবীর সামনে একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াবে, ঠিক যেমন আজ বলশেভিকবাদের কাছে মানুষের অনেক কিছু শিখবার আছে। কিন্তু আমি মনে করি না বিমূর্ত তত্ত্ব একই ভাবে, একই রূপে এবং একই পরিমাণে বিভিন্ন দেশ এবং জাতির ওপর প্রয়োগ করা যায়। রাশিয়াতে, রাশিয়ার যা অবস্থা ছিল তাতে, মার্কসীয় নীতির প্রয়োগের ফলে বলশেভিকবাদের জন্ম হয়। তেমনি, ভারতে এবং ভারতে বিদ্যমান অবস্থাতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ করলে নতুন এক ধরনের সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়, ভারতীয় সমাজতন্ত্র নামে তাকে স্বাগত জানান যেতে পারে। পরিবেশ, জাতীয় চরিত্র, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কলমের এক খোঁচায় সে সব নাকচ করে দেওয়া যায় না। অতএব যে কোনও নীতিকেই কার্যে পরিণত করার চেষ্টা হক, সে-সবের প্রভাব তার ওপর পড়তে বাধ্য।

আলোক এবং অনুপ্রেরণা বিদেশ থেকে আহরণ করব, কিন্তু সেই সঙ্গে ভুললে চলবে না, অন্য

কারও অন্ধ অনুকরণ আমাদের কথা উচিত নয়, অন্যদের কাছে যা শিখেছি তা হজম করবার আগে জানতে হবে আমাদের কী প্রয়োজন, কী আমাদের জাতীয় চরিত্র। ইংরেজিতে যে প্রবাদটি আছে, ''One man's meat is another's poison'', যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে তার মধ্যে। সে জন্যে, যাঁরা অন্ধভাবে বলশেভিকদের নীতি এবং কার্যপদ্ধতির অনুকরণ করতে প্রলুব্ধ হন, তাঁদের আমি সাবধান করে দিতে চাই।

বলশেভিকবাদের নীতিগুলি সম্পর্কে আমি বলতে পারি, বলশেভিকতত্ত্ব এখন একটা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শুধু মার্কসের মূল তত্ত্ব থেকেই নয়, লেনিন এবং অন্য অন্য বলশেভিক নেতারা ক্ষমতায় আসবার আগে যে-সব নীতি ঠিক করেছিলেন, তা থেকেও তাঁরা সরে এসেছেন। এই সরে আসার কারণ রাশিয়ায় বিদ্যমান অবস্থা। তার দরুন মূল তত্ত্ব, অথবা তত্ত্বসমূহের অদল-বদল করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। রাশিয়াতে বলশেভিকরা যেসব পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন, তার সম্পর্কে বলতে পারি, সেসব যে ভারতের পক্ষে যুৎসই হবেই এমন কোনও কথা নেই।

তার প্রমাণস্বরূপ বলতে পারি, কমিউনিজমের বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ভারতে কমিউনিজম বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি, প্রধানত এই কারণে যে, তার প্রধান সমর্থকেরা যেসব পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন, তাতে মানুষকে আকর্ষণ করে বন্ধু এবং সহযোগী বানানোর চেয়ে বরং তাকে শত্রুভাবাপন্নই করে তোলে।

এতক্ষণ যা বললাম, তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে, ভারতে আমি চাই এক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই পর্যায়ে বলা সম্ভব নয় সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঠিক কী রূপ নেবে। আমরা শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলির রূপরেখা দিতে পারি।

আমি শুধু সম্পূর্ণ, নির্ভেজাল স্বাধীনতার কথাই শোনাতে পারি। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাই তার অর্থ ব্রিটিশ শাসন-মুক্ত এক স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র। সকলের কাছে এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে স্বাধীনতার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। এই একটা বিষয়ে কোনও অস্পষ্টতা অথবা মানসিক দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত আমরা চাই সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বন্ধনমোচন। প্রত্যেক মানুষের থাকা চাই কাজের অধিকার, জীবনধারণের পক্ষে যা যথেষ্ট এমন রোজগার পাবার অধিকার। পরান্নভোজী কেউ, কোনও অনুপার্জিত আয় আমাদের সমাজে থাকবে না। প্রত্যেকের থাকা চাই সমান সুযোগ-সুবিধা। সর্বোপরি, ন্যায়সঙ্গত এবং সমভিত্তিক ধনবণ্টন অবশ্যই প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যে উৎপাদনের উপায়সমূহ এবং ধনবণ্টন রাষ্ট্রকে নিজের হাতে নিতে হতে পারে।

তৃতীয়ত, আমরা চাই সম্পূর্ণ সামাজিক সাম্য, জাতিভেদ থাকবে না, নিচু জাতি বলে কিছু থাকবে না। সমাজে প্রত্যেক মানুষের চাই সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। তা ছাড়া স্ত্রী-পুরুষে কোন অসাম্য থাকবে না সামাজিক মর্যাদায় অথবা আইনের চোখে, এবং সর্ববিষয়ে, সব দিক থেকে নারী হবে পুরুষের সমান সমান অংশীদার, অতএব সমাজের যে-সব গোষ্ঠী অথবা শ্রেণী অথবা ব্যক্তি কোনও রকমভাবে শোষিত কিংবা উৎপীড়িত, তাদের প্রত্যেকের জন্যে নতুন বার্তা বহন করে এনেছি আমরা। আমরা বার্তা এনেছি রাজনৈতিক কর্মীর জন্যে, ভূমিহীন এবং সম্পত্তিহীন সর্বহারার জন্যে, সমাজে যাদের নিম্নশ্রেণীর বলা হয় তাদের জন্যে, এবং নারীদের জন্যে। এই যারা শোষিত ও নিপীড়িত, তারাই আমাদের সমাজের প্রগতিশীল, কিংবা বলতে পারি বৈপ্লবিক উপাদানসমূহের প্রতিভূ। আমরা শুধু যদি একটি নতুন বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়ে তাদের অভিবাদন জানাতে পারি—সার্বিক স্বাধীনতার বার্তা—আমার কোনও সন্দেহ নেই দেখতে দেখতে তারা উদ্বোধিত হয়ে উঠবে। যত দিন না এইসব প্রগতিবাদী এবং বৈপ্লবিক উপাদানকে জাগিয়ে তুলছি, স্বাধীনতা আমরা পেতে পারি না এবং আমাদের মধ্যে এই যারা বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে পারব না; যদি না নতুন এক বার্তা শুনিয়ে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারি, যে বার্তা মানুষের জীবনকে এক নতুন অর্থ ও উদ্দেশ্য দান করে।

গত ত্রিশ বৎসর ধরে ভারতে পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও 'ইজম'-এর বান ডেকেছে। এইসব তত্ত্বের মধ্যে কয়েকটি যথার্থই পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য দেশের যা-সব অবস্থা ও হালচাল শুধুমাত্র তারই সৃষ্টি, যে

অবস্থা আমাদের দেশে বিদ্যমান নয়। অন্য সব তত্ত্ব, যেমন সমাজতন্ত্র, ওপর ওপর দেখলে পাশ্চাত্য—এই অর্থে যে পাশ্চাত্যের লোকেরাই তা প্রচার করছেন—যদিও বাস্তবে সমাজতন্ত্র, কোন না কোন আকারে, কোন না কোন নামে একইভাবে অনুপ্রাণিত করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষকে। পাশ্চাত্য চিন্তা আমাদের দেশে হঠাৎ ঢুকে পড়ার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তার জগতে এক চাঞ্চল্যের এবং কিছুকালের জন্যে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, লোকে প্রথমে ঠিক করতে পারছিল না, কাকে রাখবে, কাকে ফেলবে। কিন্তু ক্রমশ আমরা সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছি এবং এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিদেশ থেকে আগত কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করা নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সমন্বয়ই স্বাস্থ্যকর ও বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে, আরেকটি বিষয়ও আমরা ক্রমশ গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। প্রথম দিকে আমাদের বিশ্বাস ছিল, আমাদের পছন্দসই কোনও তত্ত্ব মেনে নিলে তবেই আমাদের মুক্তি আসবে। যেমন, অনেকে আছেন যাঁরা সমাজতন্ত্রকে ধ্রুব জ্ঞান করেন এবং সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন বলশেভিক রাশিয়াতে যা আছে ঠিক তারই অনুকরণ করতে পারলেই, ভারত রক্ষা পাবে, জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। কিন্তু এই বিশ্বাস এখন দারুণ নাড়া খাচ্ছে। প্রথমত, আমরা বুঝতে পারছি, কোনও দেশের মানসিকতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং পরিবেশের কথা মনে না রেখে একটি বিমূর্ত তত্ত্ব সেখানে প্রয়োগ করা যায় না। বিশেষ একটি তত্ত্ব এইসব কারণে বিশেষ একটি দেশের পক্ষে অনুপযোগী হতে পারে, যদিও অন্য একটি দেশের অবস্থা অনুযায়ী সে তত্ত্ব সেই দেশের পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয়ত, আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি, আমরা যে সব মডেল সাধারণত নিজেদের সামনে তুলে ধরি অনুকরণ করবার জন্যে, সে-সব মডেলও পরীক্ষামূলক, অসম্পূর্ণ, কেউ জানে না সে-সবের শেষ পরিণতি কী হবে।

এইসব কারণে, এবং অন্যান্য কারণে, আমরা ক্রমে আমাদের অগ্রগতির পক্ষে মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করছি। আমরা বুঝতে আরম্ভ করেছি, আমাদের মধ্যে থেকে উন্নততর চরিত্রের মানুষ যদি আমরা সৃষ্টি করতে না পারি, কোনও তত্ত্বই আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। ইতিহাসেরও তাই অভিজ্ঞতা এবং সেই কারণেই সারা ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখছি তত্ত্বের অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে উন্নততর মানুষের সন্ধানও চলেছে। কখনও গ্রীক ডাইয়োজিনিস সন্ধান করছেন 'ভালো মানুষ'-এর, কখনও ভারতীয়েরা খুঁজছেন "গুরু", কিংবা অবতার, আবার কখনও জার্মান নিটশে খুঁজছেন 'অতিমানব'। অতএব, আমরাও যেন শেষবারের মত বুঝে নেই, কোনও তত্ত্ব অথবা "ইজম", তা সে আমাদের স্বদেশজাতই হোক আর বাইরে থেকে আমদানী করাই হোক, ভারতকে রক্ষা করতে পারবে না, যদি না আমরা এক উন্নততর, মহত্তর মানুষের জন্ম দিতে পারি।

সামাজিক, আর্থিক অথবা রাজনৈতিক কোনও প্রতিষ্ঠান, উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করে মনুষ্যত্বের এবং চরিত্রের বিকাশে সহায়তার বেশি কিছু করতে পারে না, মনের ভিতরকার তাগিদ সৃষ্টি করতে পারে না। এই যে মানসিক আবেগ, তার দ্বারাই আমরা মানুষ হয়ে উঠি। মানুষ এই মনের আবেগের মূর্ত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আবেগ সহজাত হতে পারে, কিংবা উন্নততর কোনও আত্মা আমাদের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে পারে—কিংবা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে ; বেঁচে থাকবার এবং বৃদ্ধি পাবার ইচ্ছার ফলে, তার জন্ম হতে পারে।

জীবনীশক্তিতে ভরপুর যে-সব সর্বভারতীয় সংগঠন—নওজোয়ান ভারত-সভা, অথবা যুব আন্দোলন, সারা দেশে সেগুলোর কেন্দ্র থাকা উচিত। আমাদের মধ্যে যারা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাদেরকে আকৃষ্ট হতে হবে ওই সব কেন্দ্রের দ্বারা। আমাদের যারা ভবিষ্যৎ কর্মী সেইসব তরুণ-তরুণীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে প্রশিক্ষণ সর্বাঙ্গীন হওয়া চাই, যুবজনের দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা যেন তাতে থাকে। সেই লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের জাল যদি ছড়িয়ে দিতে না পারি, যুব-আন্দোলন কখনওই বেড়ে উঠবে না।

এইসব কর্মী যখন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত হবেন, কাজের উপযোগী হবেন, তাঁদেরকে বেরিয়ে গিয়ে জাতিকে সংগঠিত করতে হবে।

দেশকে সংগঠিত করবার জন্যে আমি এর পরে একটি কর্মসূচির প্রস্তাব করছি :

(১) কৃষক ও শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচিতে সংঘবদ্ধ করা।
(২) তরুণ-তরুণীদের সংগঠিত করা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে, কঠোর শৃঙ্খলার অধীনে।
(৩) সর্বপ্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করবার জন্যে ব্যাপক আন্দোলন।
(৪) মহিলাদের সমিতিগুলিকে সংগঠিত করা, আমাদের নারীদের মধ্যে—সার্বিক স্বাধীনতা এবং সাম্যের ধারণা প্রচার করবার জন্যে।
(৫) দেশে নতুন চিন্তার প্রকাশের জন্যে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি।
(৬) এ যুগের নতুন চিন্তাধারা যাতে জনপ্রিয় হয়, সে জন্যে দেশব্যাপী প্রচার।

উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পর, নতুন চিন্তাধারা পুরোপুরি আত্মস্থ করার পর, আমাদের তরুণ কর্মীদের হাতে নিতে হবে আমাদের সমাজে যারা প্রগতিবাদী তাদের জাগিয়ে তুলবার কাজ, এতাবৎকাল যাঁরা পিছিয়ে ছিল, তাদেরকে সজীব এবং কর্মতৎপর করে তুলবার কাজ। আমার কোন সন্দেহ নেই, এই নতুন সুসমাচার, সাম্য ও সার্বিক স্বাধীনতার এই বার্তা প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করবে, সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এবং আমাদের মত এত বিশাল দেশে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আগ্রহ জেগে ওঠা মাত্র, তারা দাসত্বের শৃঙ্খল দেখতে দেখতে ভেঙে ফেলবে।

বন্ধুগণ, আপনাদের অনেকখানি সময় আমি নিয়ে নিয়েছি, অনেক কথা বলেছি। আপনাদের মধ্যে আসবার এবং চিন্তা-বিনিময়ের যে সুযোগ আপনারা আমাকে দিয়েছেন, তার জন্যে আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমার ঐকান্তিক আশা, আমরা যখন বিদায় নেব, নতুন এক অনুপ্রেরণা এবং মনোবল নিয়ে আমরা ফিরে যাব। তখন আমরা সম্পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে এবং অবিচলিত সাহস নিয়ে আমাদের কাজে লাগতে পারবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন, সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বন্ধনমুক্ত ভারতের স্বপ্ন আমাদের তরুণদের চিত্ত জয় করুক, তাদেরকে মোহাবিষ্ট করুক। ভারতের সামনে এখন এক মস্ত বড় কর্তব্য, তাকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, এবং সেইভাবে মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। সারা পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র হল ভারত। অতএব ভারতের স্বাধীনতা বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। সেই কারণেই ভারতকে রক্ষা করতে হবে।

উপরন্তু, ভারতকে রক্ষা করতে হবে, কেননা বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় ভারতের অবদান না থাকলে বিশ্ব দরিদ্রতর হবে। কোনও কোনও মহল আমাকে সমালোচনা করতে পারে, ভুল বুঝতে পারে জেনেও আমি বলছি যে ভারতের নতুন কিছু, নিজস্ব কিছু বিশ্বকে দেবার আছে, এবং বিশ্ব সে অবদানের জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

বিশ্বকে দেবার মতো শেষ যে উপহার ভারত সম্ভবত দেবে তা হল নতুন এক আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাষ্ট্র, যার থেকে কিছু শিক্ষণীয় থাকবে সমগ্র মানবজাতির অতএব, বন্ধুগণ, আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই, ভারতকে স্বাধীন করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি—এই বিশ্বাসে দূর থেকে, যে ভারত যদি স্বাধীন হয়, বিশ্ব রক্ষা পাবে।

বন্দেমাতরম !

সারা বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আবেদন

বি. পি. সি. সি.-তে মতবিরোধ সম্পর্কে বিবৃতি
২ জুন ১৯৩১

বি. পি. সি. সি.-র কার্যকরী সমিতি এবং তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যে কুৎসা এবং অপবাদ ইদানীং প্রচার করা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সারা বাংলার কংগ্রসকর্মীরা যে-রকম চমৎকার ভাবে বি. পি. সি. সি.-র সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, সে জন্যে আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এখন পর্যন্ত যে-সমস্ত রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখেছি বঙ্গদেশের ৬২টি জেলার মধ্যে ২৬টিতে মাসে মাসে

নির্বাচন চলছে। মাত্র ৬টি জেলায় জেলার কংগ্রেস কমিটি রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি। আমরা আরও খবর পেয়েছি, ওই ছটি জেলায় জনসাধারণের মধ্যে জেলা কংগ্রেসের একজিকিউটিভ-এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেখানে, জেলা কংগ্রেস একজিকিউটিভ-এর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, নির্বাচনের সময়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে হচ্ছে। কয়েকটি জেলায় (যথা যশোহর) জেলা কংগ্রেস কমিটির কাজের বিরুদ্ধে মহকুমা এবং শাখা কংগ্রেস কমিটিগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আরও দেখা যাচ্ছে, ওই ছটি জেলার কয়েকটিতে, যেমন ঢাকায়, জেলা কংগ্রেস একজিকিউটিভ-এর সমর্থকরা নির্বাচনে যোগ দিচ্ছিলেন এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলও করেছিলেন, কিন্তু মিঃ সেনগুপ্তের বিদ্রোহের পর তাঁরা হঠাৎ তাঁদের মনোভাব বদলে ফেলেন। উপরোক্ত ছটি জেলায় যাতে নির্বাচন হয়, সেজন্যে বি. পি. সি. সি. ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া এটাও লক্ষ করবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মিঃ সেনগুপ্ত তাঁর বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলিত না করেছেন, বঙ্গদেশের ৩২টি জেলাই বি. পি. সি. সি.-র নির্দেশ পালনই করছিল।

সারা বাংলার কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি এবং সর্বসাধারণের প্রতিও আমার আবেদন, সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে আমাদের নিয়ে যে কুৎসা রটনা চলছে, তা সত্ত্বেও আপনারা মানসিক স্থৈর্য হারাবেন না। আমি সবাইকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করছি যে বি.পি.সি.সি. অবিচলভাবে নিজের কাজ করে যাবে, এবং প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও অনিয়ম যদি বি. পি. সি. সি.-র গোচরে আনা হয়, তার ব্যবস্থা করবে এবং দেখবে যাতে কোনও মহল থেকে অভিযোগের কোনও কারণ না থাকে। আর যে কুৎসা রটনা চলছে, সে বিষয়ে সকলকে আমি বলি, এমনভাবে সেটাকে অগ্রাহ্য করুন, যাতে সে রটনা যাঁরা করছেন তাঁরা ক্লান্ত হয়ে নিরস্ত হতে বাধ্য হন। জনসাধারণ আমাদের বিচার করবেন আমাদের অতীতের কাজকর্ম এবং ত্যাগ দিয়ে। আমাদের বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার, এবং আমরা জানি স্বার্থান্বেষীরা যতই প্রচার চালান, দেশবাসীর অন্তঃকরণে সদিচ্ছা আছে, দেশ আমাদের সঙ্গেই আছে।

দায়িত্বজ্ঞানহীন সব অভিযোগ

দেশবাসীর প্রতি আবেদন
১১ জুন ১৯৩১

ওয়ার্কিং কমিটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বঙ্গদেশে যে-মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে তা একজন সালিশের কাছে পাঠানো হবে, এবং তিনি যে রায় দেবেন সেটাই চূড়ান্ত হবে। কমিটি আরও সিদ্ধান্ত করেছে যে বি. পি. সি. সি.-র নির্বাচন চালিয়ে যাওয়া হবে, যদি না সালিশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে অন্যরকম নির্দেশ দেন। অধিকাংশ জেলায় এত দিনে সম্ভবত নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে আর গোটা ছয়েক জেলায় নির্বাচন এখনও বাকি আছে।

নির্বাচন সম্পন্ন করার কাজে সহযোগিতা করবার জন্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন করছি। নির্বাচন সম্পর্কে যাঁদের কোনও অভিযোগ আছে, সালিশ শ্রীযুত আনের সামনে তাঁদের অভিযোগ উপস্থিত করবার সম্পূর্ণ সুযোগ তাঁরা পাবেন। সাধারণ অবস্থায় বি.পি.সি.সি. ওই সব অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করত এবং চেষ্টা করত সুবিচার করবার। এখন ওয়ার্কিং কমিটি যেহেতু হস্তক্ষেপ করেছে, আমরা সানন্দে সে দায়িত্ব সালিশের হাতে তুলে দিয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির ইচ্ছা, সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে আক্রমণ বন্ধ হোক। আমি গর্ব করে বলতে পারি, গত একপক্ষকাল অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও আমাদের দল প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছে। তবু আমি বিশেষভাবে চাই, আমরা যেন আরও সংযত হই। আমাদের

পক্ষে যুক্তি এত প্রবল যে অপর পক্ষকে আক্রমণ করার, তাদের নামে কুৎসা রটনা করার প্রয়োজন নেই আমাদের। বরং, সে-সব করলে আমাদের 'কেস' জোরালো হওয়ার বদলে অকারণে তার ক্ষতিই হবে।

আসুন আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি, যাতে বাংলাদেশে সালিশের কাজ করবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। তা যদি করতে পারি, সালিশের কাজ সহজ হবে, এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যতেও তেমন আর অসুবিধে হবে না। এখনকার এই তিক্ততা বেশি দিন চলতে পারে না; চলা উচিত নয়। নিজেদের দেশকে যদি আমরা ভালবাসি, কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় কাজ স্থিরভাবে করতে পারি, তাতেই আমাদের আগ্রহী হওয়া উচিত। তা করতে গেলে আজ থেকেই আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, বঙ্গদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করব।

সালিশ যাই কেন না সিদ্ধান্ত করুন, তাঁর রায়ই হবে চূড়ান্ত। বাংলাদেশকে সেই রায় বিশ্বস্তভাবে পালন করতে হবে। একমাত্র তা হলেই আমরা আশা করতে পারব যে অতীতের তিক্ততার অবসান করে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করব বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে।

একদম শুরু থেকেই আমরা সালিশীতে সানন্দে সম্মত হয়েছি একাধিক কারণে। আমাদের নামে নানা গুরুতর অভিযোগ প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে আমরা ঘুষখোর, আমরা অসাধু, আমরা জোচ্চোর, জালিয়াত, নানা অসৎকার্যে লিপ্ত। বড়ই দুঃখের কথা, জনগণের সেবায় এত বছর ব্যয় করার পর আজ এই রকম সব জঘন্য অপরাধের অভিযোগে আমাদেরকে জনমতের আদালতের সামনে উপস্থিত করা হল। এত দিন পর্যন্ত এই সব অভিযোগ সম্পর্কে আমরা উদাসীন থেকেছি, ধৈর্য হারাইনি, কিন্তু এখন আমরা বিচার চাই। যত যাই হোক, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্যে কিছু স্বার্থত্যাগ আমরা করেছি, কিছু দুঃখ সয়েছি। আমার নিজের স্বার্থত্যাগ, আমার অসংখ্য সহকর্মীর তুলনায় যাদের মধ্যে শত শত এখন কারান্তরালে, মনে হয় অকিঞ্চিৎকর। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে অতীতে আমরা যদি কিছু করে থাকি, আশা করি ভবিষ্যতে আরও কিছু করব, কেন না যৌবনকাল থেকেই দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছি আমরা। আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই অংশে এসে আমাদেরকে ঘুষ নেওয়া, জালিয়াতি, জোচ্চুরি করা আরও নানা অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়া, এই-সব অভিযোগের উত্তর দিতে হবে, এ কি সুবিচার ? এ কি ন্যায়সঙ্গত ? আমাদের যে দেশবাসীর আমরা সেবা এত দিন করে এসেছি, ভবিষ্যতেও করব, তাঁরা আমাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেন, এমন আশা কি আমরা করতে পারি না ? কোনও কংগ্রেসকর্মীর পক্ষে আদালতে সুবিচার পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি আমার দেশবাসীর হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, তাঁরা ভালবেসে আমাদেরকে রক্ষা করবেন এই আশায়। ওয়ার্কিং কমিটিকে আমি বলেছি, মিঃ সেনগুপ্ত আমাদের নামে যে-সব অভিযোগ এনেছেন, তা যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন, প্রকাশ্যে আমাদের ভর্ৎসনা করা হোক, ঘোষণা করা হোক আমরা জনগণের সেবা করার অনুপযুক্ত। অপরপক্ষ, সে-সব অভিযোগ যদি তিনি প্রমাণ করতে না পারেন, আমরা দাবি করব ওয়ার্কিং কমিটির প্রদত্ত সম্পূর্ণ সুরক্ষা এবং সম্পূর্ণ সমর্থন। অতীতে আমাদের যত দূর ক্ষমতা আমরা সেবা করেছি, এবং ভবিষ্যতেও সেবা করব, তাই আমাদের ইচ্ছা। আমাদের দেশবাসীরা বলুন তাঁরা আমাদের সেবা চান কি না। যদি চান, যে-সমস্ত অভিযোগ দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আমাদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তার মোক্ষম জবাব দিয়ে, আমাদের প্রতি তাঁদের ভালবাসা ও আস্থা তাঁদেরকে প্রদর্শন করতে হবে।

শ্রমিক ইউনিয়ন ও বেকার সমস্যা

কলকাতায় ৪ঠা জুলাই ১৯৩১-এ অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ

বিগত আঠেরো বছরে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের শক্তি কিংবা আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন দাবি আমরা করতে পারি কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বরং আমার মনে হয়, ওই সময়ে সে আন্দোলন পিছিয়েই পড়েছে। পিছিয়ে পড়ার কারণ অনেক, কিন্তু আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয়, প্রধান দুটি কারণ হল প্রথমত, নাগপুরে আন্দোলনের বিভক্ত হয়ে যাওয়া, এবং দ্বিতীয়ত আইন-অমান্য আন্দোলনের দরুন শ্রমিক-ইউনিয়ন আন্দোলনের একাগ্রতার হানি। আমাদের কমরেডদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন বিভক্ত হওয়ার ফলে আমাদের শক্তি কমেনি, কিন্তু আমি তা মনে করি না। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, অন্তত এখনকার মতো বিভাগের ফলে আমরা দুর্বল হয়েছি। সেই কারণে, যাঁরা আন্তরিকভাবে এই বিভাগের জন্যে দুঃখিত, আমি তাঁদের অন্যতম, এবং আমাদের মধ্যে ঐক্য যদি স্থাপিত হয়, আমি সর্বান্তঃকরণে তাতে খুশি হব। দ্বিতীয় কারণটির কথা বলতে গেলে, আমার মনে হয় আইন অমান্য আন্দোলনের আকর্ষণ যেহেতু প্রবলতর, সারা দেশের মনোযোগ শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের দিক থেকে সরে গিয়েছে। পরিস্থিতি অন্য রকম হলে আইন-অমান্য আন্দোলনের দরুন শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের লাভই হত, তার শক্তি বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এখন যা হয়েছে, শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন তার স্বাভাবিক অগ্রগতিতে বাধা পেয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতর থেকেই নানা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। অতএব, কোন কোন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিবাদ এবং বর্তমান অবস্থায় ঐক্য-স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় কী, আমি মনে করি এ-সব কথা স্পষ্ট করে বললে ভাল হয়। প্রধান বিচার্য বিষয়গুলি হল (১) বিদেশী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, (২) জেনিভাতে প্রতিনিধি প্রেরণ (৩) শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাব অবশ্যপালনীয় কিনা।

প্রথম প্রস্তাবটির বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মত, বিদেশী কোনও সংস্থার সঙ্গে এখনই সম্পর্ক স্থাপনের দরকার নেই। ভারতের শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারবে। যে কোনও মহল থেকেই শিক্ষা নিতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, এমন কি পৃথিবীর যে কোনও জায়গা থেকে সাহায্য এলে তাও গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আমস্টারডাম কিংবা মস্কোর হুকুমের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত নয়। ভারতকে উদ্ভাবন করতে হবে তার নিজস্ব পদ্ধতির, তার নিজের পরিবেশ, নিজের প্রয়োজনের মতো করে তৈরি করতে হবে নিজেকে।

জেনিভাতে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে বলি, আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে মন খোলা রাখা, এবং প্রতি বছর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া। জেনিভাতে প্রতিনিধি পাঠাব কিনা সে বিষয়ে আগেভাগে চিরকাল বহাল থাকবে এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগতভাবে জেনিভার ওপর আমার কোনও আস্থা নেই। তা সত্ত্বেও এ রিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিয়ে বছর বছর সিদ্ধান্ত নিলে আমাদের বন্ধুরা যদি কেউ সন্তুষ্ট হন, আমার কোনও আপত্তি নেই তাতে।

শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যে অমান্য করা চলে না, সে বিষয়ে বলি, শ্রমিক ইউনিয়ন-কংগ্রেসের অস্তিত্ব যদি বজায় রাখতে হয়, এবং তাকে যদি—কাজ করতে হয়, তা হলে, আমার মনে হয়, কোনও রকম আপস চলবে না। দেশে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য যদি তাকে কাজ করতে হয়, শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের সমস্ত প্রস্তাব কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত ইউনিয়নকে মানতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এক শিথিল ফেডারেশনে, কিংবা সর্ব-দলীয় সমাবেশ জাতীয় কিছু একটাতে পর্যবসিত করলে

তা হবে আত্মহত্যা।

শ্রমিক ইউনিয়নের ঐক্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য পরিষ্কার। আমি ঐক্য চাই এই কারণে যে, তা হলে আমরা একটি শক্তিশালী সংঘ গড়ে তুলতে পারব। কিন্তু আবার যদি আমরা ঝগড়াঝাঁটি করি, আলাদা হয়ে যাই, তা হলে এখন জোড়া-তাড়া দিয়ে একটা ঐক্য স্থাপন করার দরকার নেই। শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি, সমস্ত ইউনিয়ন তাতে যোগ দিতে পারত, তাদের উপস্থিতি যাতে টের পাওয়া যায়, তা করতে পারে। তার ফলে কংগ্রেসের পদাধিকার যদি কোনও একটি দলের হাতে চলে যায়, ন্যায্যত কেউ আপত্তি করতে পারবেন না। অতএব আমি সমস্ত ইউনিয়নকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ করছি শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগ দিতে, ইচ্ছে করলে তার কার্যকরী সমিতি দখল করতে।

মহাত্মা গান্ধী এবং লর্ড আরউইনের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তাতে আমাদের কর্মীরা কেউ কেউ অতিশয় বিচলিত। সেই চুক্তির সমালোচনা আমি করতে চাই না, কারণ সেটা হবে পোস্টমর্টেম করার মতো কাজ। চুক্তি যা হবার হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সেটাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি। গত বছর আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতের আন্দোলনে ইচ্ছে করলে তারা অপেক্ষাকৃত বড় অংশ গ্রহণ করতে পারে। তা করতে গেলে প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করা দরকার।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস করাচি অধিবেশনে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, মৌলিক অধিকার প্রস্তাব নামে সেটি পরিচিত। সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত হয়েছে। এক দিকে, কেউ কেউ তাকে সর্বাংশে ধিক্কার দিয়েছেন, যথেষ্ট নয় বলে, অসন্তোষজনক বলে। আবার, অন্য দিকে, অন্যেরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু আমার মনে হয়, এই দুই মতই একদেশদর্শী। প্রস্তাবটি যতই অসন্তোষজনক হোক, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে চিরাচরিত ধারা থেকে স্বতন্ত্র নতুন একটি ধারার সূত্রপাতের, শ্রমিক ও কৃষকদের একটা স্বীকৃতিদানের, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এক সুনিশ্চিত পদক্ষেপের সাক্ষ্য দিচ্ছে প্রস্তাবটি। প্রস্তাবটিতে কী আছে না আছে, আপাতদৃষ্টিতে তার মূল্য বোঝা যাবে না, দেখতে হবে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। আমাকে যেটা আকৃষ্ট করে, সেটা প্রস্তাবের বিষয়বস্তু নয়, সেটা তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা। প্রস্তাবটির বিষয়বস্তুকে আরও ভাল করতে হবে, ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে, তা হলেই সেটি সন্তোষজনক হবে। একটি কমিটি ইতিমধ্যেই সে কাজ আরম্ভ করেছে দেখে আমরা খুশি হয়েছি।

এ দেশের লোক এখন গোল-টেবিল বৈঠকের ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এখনকার যা মনোভাব, যা মানসিকতা, তাতে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে সে বৈঠক থেকে প্রকৃত কোনও ফলোদয় হবে। তা ছাড়া গোলটেবিল বৈঠকটি এমনই বস্তু যে সেখানে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের দাবি জোর দিয়ে হাজির করা অত্যন্ত কঠিন, বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করা হলে তখন জনসাধারণের, তাঁরা যা উপযুক্ত মনে করবেন, তাই করবার সময় আসবে। সেই মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটি এলে জনগণ যেন তাকে বৃথা যেতে না দেন।

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে হুইটলে কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে কমিশন সদ্য তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। ঠিক ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ করতে গেলে যে রিপোর্ট আমাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে হয়। কিন্তু তা আমি করব না। সে রিপোর্ট ভাল হোক, মন্দ হোক, ভালো-মন্দ কিছুই না হোক, ওই রকম দলিল, জনসাধারণের সামনে যা এখন উপস্থিত, জনসাধারণ যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে, যার সমালোচনা করতে বাধ্য, তাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয় আমাদের।

প্রথমেই আমি বলতে চাই, কোনও একটি কমিশনের একটি রিপোর্টের মূল্য কাগজে-কলমে তাতে কী আছে তার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত তার ফল কী হবে, তার ওপর। কমিশনের পিছনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা কি যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হবে? এক,

সাধারণ লোকেই সে প্রশ্ন করবে। আমরা ভারতীয়েরা এত রিপোর্ট দেখেছি যে, একমাত্র রিপোর্ট দাখিল করা ছাড়া, অন্য কোন বাস্তব সুফল আমরা কোনও কমিশনের কাছ থেকে পাব কিনা সে বিষয়ে অবিশ্বাস এবং সন্দেহ আমাদের মনে থাকতে বাধ্য। এমন কি, বলতে পারি, অতীতে কোনও কোনও কমিশন সর্বাংশে লোকের নিন্দাই কুড়িয়েছে, কেন না তাদের রিপোর্টে ভাল যা ছিল তাকেও গভর্নমেন্ট কাজে পরিণত করতে পারেনি।

বর্তমান রিপোর্টে শ্রমিক-কল্যাণ কর্মসূচির সমস্যার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে, এবং যদিও আমি হুইটলি কমিশনকে বয়কটের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলাম, এ কথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই, এ বিষয়ে কমিশনের সুপারিশগুলি যদি কার্যকর করা হয়, বর্তমান অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে। তবু আমি বলতে বাধ্য, কতকগুলো বৃহত্তর এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিবেচনা করা হয়নি। আজকের শ্রমিক দাবি করে কাজের অধিকার। রাষ্ট্রের কর্তব্য নাগরিকের কর্মে বিনিয়োগের সুযোগের সংস্থান করা। যদি কাজের সংস্থান না করতে পারে, রাষ্ট্রকে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমজীবী নাগরিককে নিয়োগকর্তা যখন খুশি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, তার ফলে সে না খেয়ে থাকবে, এ হতে পারে না। এ দেশের শিল্প ব্যয়-সংকোচের ফলে এক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। নিয়োগকর্তার নানা অসুবিধার কথা আমি খেয়াল করছি না, তা নয়। তখনকার সব শ্রমিক-কর্মচারীকে কাজে বহাল রাখা এক অসম্ভব ব্যাপার তাঁদের পক্ষে, ছাঁটাই করতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু সে-রকম ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র সব দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না। নিয়োগকর্তাকে বলা দরকার, যখন সুদিন ছিল, দরিদ্র শ্রমজীবীদের সাহায্যে তিনি যদি লাভের পাহাড় জমিয়ে তুলে থাকেন, আজ দুর্দিনে তাদেরকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করবেন, তা চলবে না। এই ছাঁটাইয়ের সমস্যার যত দিন না সন্তোষজনক সমাধান হচ্ছে, দেশে শিল্পক্ষেত্রে শান্তি আসতে পারে না।

প্রত্যেক শ্রমিক যেমন কাজ দাবি করতে পারেন, তেমনই জীবনধারণের উপযোগী মজুরিও দাবি করতে পারেন। আজ ভারতে কারখানা-শ্রমিক কি বেঁচে থাকবার মতো মজুরি পান? চটকল, কাপড়ের কল, এ-সবের দিকে তাকান। তাদের বিপুল মুনাফার কতটুকু অংশ ব্যয় করে তারা দরিদ্র নিপীড়িত শ্রমিকদের জন্যে? আমি জানি তারা বলবে, ইদানীং তারা দুরবস্থায় পড়েছে। কিন্তু সে কথা মেনে নিলেও, আমরা কি প্রশ্ন করতে পারি না, অতীতে সংরক্ষিত খাতে তারা কত জমিয়েছে? এ প্রসঙ্গে ভারতীয় রেলপথের কথাও আমি ভুলব না। তারা এখন যে খুব তৎপরতার সঙ্গে ছাঁটাই করছেন, তাঁদের অবশ্যই কর্তব্য আছে সেই শ্রমিকদের প্রতি, যাঁদের সাহায্যে অতীতে তাঁরা মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করেছেন, সংরক্ষিত খাতে টাকা জমিয়েছেন। আমাদের চা-বাগানের মালিকদের কথাও আমরা বলতে পারি। তাঁরা মুনাফা কী রকম করছেন। আর তাঁদের শ্রমিকদের প্রতি কী আচরণ করছেন? এ কথা কি ঠিক নয়, যে অন্তত কোথাও কোথাও দরিদ্র শ্রমিকদের এমন অবস্থা যে প্রাচীন দাসপ্রথার সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য? শ্রম কমিশনার তা হলে কী সুপারিশ করেছেন, যাতে ভারতীয় শ্রমজীবী জীবনধারণের উপযোগী মজুরি পান, ভাল ব্যবহার পান? তাঁরা পাটশিল্পে ও বস্ত্রশিল্পে ন্যূনতম মজুরির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ন্যূনতম মজুরি মানে যে জীবনধারণের উপযোগী মজুরি, সে বিষয়ে কি আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি?

হুইটলি কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার করবার আমার দরকার নেই। শুধু তার একটি বিষয়ের কথা আমি বলতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও ভারতে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের উন্নতির প্রশ্নে তার তাৎপর্য সাংঘাতিক। রিপোর্টে আছে, শ্রমিক ইউনিয়ন আইনের ২২ নং ধারার সংশোধন প্রয়োজন, যাতে কোনও রেজিস্টার্ড শ্রমিক ইউনিয়নের পদাধিকারীদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশকে, যে শিল্পের সঙ্গে সেই ইউনিটটি সম্পৃক্ত, তাতে নিযুক্ত অথবা কর্মরত থাকতে হবে এমন ব্যবস্থা থাকে। কমিশনের জানা উচিত ছিল, ভারতে সাধারণত শ্রমিক ইউনিয়নের পদাধিকারী হিসাবে বহিরাগত, অথবা যাঁরা শ্রমিক নন, তাঁদের নির্বাচন করা হয় এই কারণে যে শ্রমিক-কর্মচারী যাঁরা পদাধিকারী হিসাবে কাজ করতে রাজি হন, নানা ছুতোয় নিয়োগকারীরা তাঁদের উৎপীড়ন করে থাকেন। কাজেই,

শ্রমিক-কর্মচারীরা যদি নিজেরাই পদাধিকারী হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হন, এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে তাঁরা নিয়োগকর্তাদের হাতে নিগৃহীত না হন। না হলে, এখনকার নিগ্রহনীতি যদি চলতে থাকে, শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে পদাধিকারী হওয়া অসম্ভব হবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেকারী, ছাঁটাই এবং জীবনধারণের উপযোগী মজুরির সমস্যায় ঠিকমতো হাত দেওয়া হয়নি। শ্রমিক-কর্মচারীদের দুর্দশা লাঘবের যে কর্মসূচি কমিশন রচনা করেছেন অনেকাংশে সেটি আকর্ষক কিন্তু সে কর্মসূচিকে কার্যকর কে করবে? বর্তমান গভর্নমেন্ট সুনিশ্চিতভাবে শ্রমিক-বিরোধী। তাঁদের কাজ থেকে কি কিছু আশা করা যায়? অতএব, শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে শ্রমিক সমস্যা হল রাজনৈতিক সমস্যা। যত দিন ভারত স্বাধীন না হচ্ছে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক, কিংবা অন্তত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করছে, শ্রমিকদের দুর্দশা মোচনের কর্মসূচি কার্যকর করা সম্ভব হবে না। রিপোর্টে একটি জিনিস পরিষ্কার বলতে গেলে, সব কিছুই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্টের হাতে। সরকারি শাসনযন্ত্র শ্রমিকেরা কী করে হস্তগত করবেন, কী করে তাকে প্রভাবিত করবেন, সে কথা কিছুই নেই রিপোর্টে। কিন্তু তা যতক্ষণ না হচ্ছে, শত রিপোর্টেও শ্রমিকের প্রকৃত কোনও উপকার হবে না। নতুন সংবিধানে কমিশনের উচিত ছিল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সুপারিশ করা। তার ওপরে, কিংবা সেই সঙ্গে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যপদের একটি নির্দিষ্ট শতকরা ভাগ শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের জন্যে সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ কমিশন করতে পারতেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের যে আন্দোলন—তার শক্তি এবং আকার অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, অতীতে সাময়িকভাবে যতই সে অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে থাক। নানা দিক থেকে নানা রকম পরস্পর-বিরোধী চিন্তার ধারা শ্রমিক-ইউনিয়নের শ্রমজীবীদের বিভ্রান্ত করে, তাঁরা বুঝতে পারেন না কোন পথে যাবেন, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। এক দিকে আছেন দক্ষিণ-পন্থীরা, তাঁরা সংস্কারবাদী কর্মসূচির পক্ষে। অন্য দিকে আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধুরা আছেন। তাঁরা, যদি আমি তাঁদের কথা সঠিক বুঝে থাকি, মস্কোর অনুগত এবং অনুসারী। এই দুই গোষ্ঠীর কোনওটির সঙ্গে আমরা একমত হই বা না হই তাঁদের কথা আমরা বুঝতে পারি। এই দুইয়ের মাঝখানে আর একটি গোষ্ঠী আছে, যাঁরা পুরোদস্তুর সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, কিন্তু চান ভারত তার নিজের ধরনের সমাজতন্ত্রের, তার নিজস্ব পদ্ধতির বিকাশ করুক। আমি সবিনয়ে দাবি করি, আমি শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত।

আমার নিজের মনে কোনও সন্দেহ নেই, যে ভারতের এবং বিশ্বেরও মুক্তি নির্ভর করে সমাজতন্ত্রের ওপর। অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ভারতকে গ্রহণ করতে হবে, তার দ্বারা লাভবান হতে হবে। কিন্তু নিজের অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের পদ্ধতি তাকে গড়ে তুলতে হবে। বাস্তবক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োগ করতে গেলে ইতিহাস এবং ভূগোলকে বাদ দেওয়া চলবে না। সে চেষ্টা যে করবে, সে বিফল হবেই। অতএব ভারতকে তার নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্রের বিকাশ করতে হবে। সারা দুনিয়াই যখন সমাজতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে, আমরাই বা তা করব না কেন? এমনও হতে পারে, ভারত যে ধরনের সমাজতন্ত্র বিকশিত করে তুলবে—তার মধ্যে এমন নতুন কিছু, অভিনব কিছু থাকবে, সারা বিশ্ব যারা দ্বারা লাভবান হবে।

শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলন কোন পথে

১১ জুলাই ১৯৩১-এর শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসে মস্কোজাত বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবৃতি

শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন সম্পন্ন হবার পর, এখন গত সপ্তাহের ঘটনাবলীর বিচার করবার সময় এসেছে। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯২৮-এ কংগ্রেসের ঝরিয়া অধিবেশনে আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু সে দুর্যোগ তখন এসে পড়েনি। ঝরিয়াতেও বিভিন্ন দলের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট ছিল। এক দিকে ছিলেন দক্ষিণপন্থীরা, যার নেতা ছিলেন মিঃ যোশী ও তাঁর কমরেডরা, যাঁদের কথা বলা যেতে পারে ভারতে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অপর দিক ছিলেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা। তাঁদের নেতা ছিলেন বোম্বাই গোষ্ঠী, যাঁরা আদর্শ, পদ্ধতি এবং কলাকৌশলের ব্যাপারে অন্ধভাবে মস্কোর হুকুম তামিল করেন। এই দুটি দল ছাড়া অন্যেরাও ছিলেন, যাঁরা এঁদের কোনটির সঙ্গেই একমত হতে পারেননি। কিন্তু তাঁরা সে-সময় একটি দলে সঙ্ঘবদ্ধ হননি। তাঁরা নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রেরই পক্ষে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, সংগ্রামী কর্মসূচিও চেয়েছিলেন। কিন্তু মস্কোর আঁচল ধরে চলতে, কিংবা প্যান-প্যাসিফিক সেক্রেটারিয়েটের তালে তাল দিতে তাঁরা অস্বীকার করেন।

শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তৃতীয় দলটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট দেন, যথা বোম্বাইয়ের ক্রমাগত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান, হুইটলি কমিশন বয়কট, ইত্যাদি। ফলে কী হল, দক্ষিণপন্থীরা ওই-সব প্রশ্নে একেবারে বেঁকে বসলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁরা ভাল মনে নিজেদের পরাজয় মেনে নিতে পারলেন না, নীরবে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন স্থাপন করলেন। নাগপুর অধিবেশনে মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা পুরো সেক্রেটারিয়েটটি নিজেরা দখল করতে চাইলেন কিন্তু তৃতীয় গোষ্ঠীর চাপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। আমার দুর্গতি এই হল যে, সেক্রেটারি হিসেবে এমন একজনকে আমায় মেনে নিতে হল, পদ্ধতি এবং কলাকৌশল, কোনও বিষয়েই যাঁর সঙ্গে আদৌ আমার মতের মিল নেই। তবু আমি কাজ চালিয়ে গেলাম, এই আশায় যে শেষপর্যন্ত আমাদের সুদিন আসবে। কিন্তু আমাদের মস্কোমুখী কমিউনিস্টরা, নাগপুরে তাঁদের সাফল্যের ফলে (তৃতীয় গোষ্ঠীর সমর্থনের দরুনই সে সাফল্য তাঁরা লাভ করেছিলেন) বুকে বল পেয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে তাঁদের দলভুক্ত নন এমন সকলকে বিতাড়িত করতে চাইলেন।

বৎসরাধিক কাল তাঁরা নিরন্তর প্রচার চালালেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের যে-সব গোষ্ঠী তাঁদের দলের নয়, তাদের সকলের বিরুদ্ধে। কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু একদম শুরুতেই, এমন কি নতুন কোনও ইউনিয়নের সাহায্য ছাড়াই, প্রমাণ হয়ে গেল, তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সেটা যখনই তাঁরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের আশঙ্কা হল সেক্রেটারিয়েট নিজেদের হাতে রাখতে পারবেন না। ঠিকই বুঝেছিলেন, কেননা শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য বদ্ধপরিকর ছিলেন, মিঃ দেশপাণ্ডে এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের বহিষ্কার করবেন। গত বছর, মিঃ দেশপাণ্ডের সেক্রেটারি থাকার কালে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছেছিল। অফিস আশ্রয় নিয়েছিল মিঃ জিনওয়ালার অফিসে, সেক্রেটারি কোনও চিঠিপত্রের জবাব দিচ্ছিলেন না, এবং বছরের শেষে কোষাধ্যক্ষ মিঃ জিনওয়ালা অভিযোগ করলেন যে সেক্রেটারি যত সব টাকা নিয়েছেন তার হিসাব দেননি।

উপরন্তু কলকাতা কংগ্রেসে স্বীকৃতি-প্রদান কমিটি (Credentials Committee) মিঃ দেশপাণ্ডের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এবং গিরনি কামগার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অপর গোষ্ঠীটির অনুকূলে রিপোর্ট দিয়েছিলেন। তার ফলে মিঃ দেশপাণ্ডে এমনিতেই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে

যাবেন। অতএব তাঁরা ঠিক করলেন, অধিবেশন ভেঙে দেবেন। হলের মধ্যে তাঁরা বাধাদান করার, হৈ-হট্টগোল করার কৌশল অবলম্বন করলেন, অপমান করলেন প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে যাকে ইচ্ছে তাকে। হলের বাইরে তাঁরা জড়ো করলেন প্রচুর গুণ্ডা-বদমাস, ইঙ্গিত পেলেই হলের মধ্যে হামলা চালাবার জন্যে। মিঃ দেশপাণ্ডে এবং তাঁর বঙ্গদেশবাসী অনুগামীদের মধ্যে কেউ কেউ (তাঁদের নেতা ছিলেন শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি এবং শ্রীভূপেন দত্ত) অনবরত হল থেকে বাইরে গিয়ে সেই গুণ্ডাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন। স্বেচ্ছাসেবীর ব্যবস্থা ছিল অভ্যর্থনা কমিটির হাতে, কিন্তু মিঃ দেশপাণ্ডে তাঁদেরকে চলে যেতে হুকুম দিলেন এবং কয়েকজন নিজের লোক গেটে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারা ঢুকতে দিল সেই গুণ্ডাদের।

এই সব ঘটনা যে ঘটতে পারল তার কারণ আমরা এবং অভ্যর্থনা কমিটি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছি তাঁদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যেন আমাদের ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়। পাঁচ তারিখে কার্যকরী সমিতি এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আমি মুলতুবি করে দিই, কারণ কোনও কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্টকে কিছু না জানিয়েই সেক্রেটারি ৬ তারিখ সকাল আটটায় অ্যালবার্ট হলে কার্যকরী সমিতির সভা ডাকলেন। কিন্তু এই কাজে শ্রমিকদের অসন্তোষের ফলে দেশপাণ্ডে গোষ্ঠীর সাহস হল না সেখানে কোনও সভা করার। এইভাবে তাঁদের সভা করার প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহর ছেড়ে তাঁদের সুদূর মেটিয়াব্রুজে গিয়ে সভা করতে হল।

পরদিন টাউন হলে কার্যকরী সমিতির মুলতুবি সভাটি এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল কিন্তু মিঃ দেশপাণ্ডে ও তাঁর গোষ্ঠী অনুপস্থিত থাকলেন।

মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা এবং তাঁদের বঙ্গদেশীয় অনুগামীগণ কার্যত শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কিন্তু শোভনভাবে করেননি সে কাজ। গুণ্ডামি সহ সব রকমের আপত্তিজনক কৌশল তাঁরা অবলম্বন করেন এই আশায় যে, নাগপুরে যেমন দক্ষিণপন্থীদের তাঁরা বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনই এখানেও তৃতীয় গোষ্ঠীটিকে বহিষ্কার করতে পারবেন। কিন্তু তাঁদেরকে কলকাতায় যাঁদের মোকাবিলা করতে হল তাঁরা আরও শক্ত ধাতুতে গড়া। তৃতীয় গোষ্ঠী, যাঁদেরকে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী বলা যায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যেই থাকবেন, এবং প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে লড়াই করবেন। তাঁরাই যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন, মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা ভয় দেখিয়ে তাঁদের তাড়াতে পারলেন না, তবে তাঁরা যদি সংখ্যালঘু হতেন, তা হলেও তাঁরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতেন না। ভারতে সুস্থ শ্রমিক ইউনিয়নের বিকাশের পক্ষে মস্কোপন্থী কমিউনিস্টরা গুরুতর বিপদস্বরূপ। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের সামনে থেকে আমরা পশ্চাদপসরণ করে আসব, তা হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, যাঁদের একটি নিজেদের আদর্শবাদ আছে, আদর্শ কর্মসূচি আছে, আজ ভারতে একটি দল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ভারতের অন্য যে কোনও দলের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁরা প্রস্তুত। কিন্তু তাঁদের ওপর অন্য কোনও দলের আধিপত্য তাঁরা মানবেন না, মস্কোপন্থী কমিউনিস্টদের তো নয়ই।

গত সপ্তাহের ঘটনাবলীর মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল খুব লজ্জাজনক, অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যাঁরা বিরোধী, তাঁরা শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভায় গণ্ডগোল সৃষ্টিতে দেশপাণ্ডের গোষ্ঠীকে যে-ভাবে সহায়তা করলেন। শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি, শ্রীভূপেন দত্ত এবং তাঁদের বন্ধুরা অবশ্যই বি.পি.সি.সি.-র প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, জাতীয় কংগ্রেসে তাঁদের সহযোগী যাঁরা বি.পি.সি.সি.-র বিরোধী, এবং শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই, তাঁরা কেন নিজেদের কাজকর্ম ছেড়ে মিঃ দেশপাণ্ডের দলকে গণ্ডগোল সৃষ্টিতে সাহায্য করতে যাবেন ?

মিঃ দেশপাণ্ডের দৃষ্টিতে আমাদের এইটাই হল অপরাধ যে মস্কোর হুকুম তামিল করার বিরুদ্ধে এবং আমাদের অনেকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য এবং মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী। আমরা তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "জাতীয় কংগ্রেস নিপাত যাক" "গান্ধী নিপাত

যান” আওয়াজ তুলতে রাজি নই। আমাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই নিজেদের প্রকৃত আনুগত্য গোপন করবার, ছদ্ম-পরিচয়ে নিজেদের জাহির করবার। আমরা যারা কংগ্রেসকর্মী তারা কংগ্রেসকর্মীই থাকব, মিঃ দেশপাণ্ডে আর তাঁর বন্ধুরা, চান বা না চান। শেষ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং সারা ভারত শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে সু-সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে, আবার ভারতের ব্যাপারে মস্কোর আধিপত্যের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করব, কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র তা হলেই ভারতের এবং ভারতের শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষিত হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের জনগণ আমাদের অবলম্বিত পথই মেনে নেবেন শেষ পর্যন্ত।

ভারত বাঁচলেই মানবজাতি বাঁচবে

নড়াইলে প্রদত্ত ভাষণ
১৭ জুলাই ১৯৩১

ভদ্রমহিলাগণ, ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমার তরুণ বন্ধুরা,

আমার মনে হয় আপনাদের জন্যে যাঁরা কাজ করেন, এবং দেশের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করেন, তাঁদের মনোভাব, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি কী তা আপনাদের জানা উচিত। অবশ্যই আপনাদের অধিকার আছে সে কথা জানবার।

আপনারা জানেন, ইংরেজ প্রথমে এদেশে এসেছিল বাণিজ্য-সামগ্রী নিয়ে, কিন্তু রাজদণ্ডের লোভের বশে তারা ক্ষমতা দখল করে নেয়। কী কৌশলে তারা আমাদের শাসক হয়ে বসল, আমরা বাঙালীরা ভালই জানি। যারা এসেছিল বাণিজ্য করতে, তারা যে উপায়ে সিংহাসন অধিকার করল তাকে সদুপায় বলা যায় না।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন কত জাতি, কত বিভিন্ন সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে এসেছিল, এবং তার পর ভারতীয় জাতির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এক হয়ে গিয়েছিল। এই যে স্বেচ্ছায় তারা মিশে গেল একে অপরের সঙ্গে, তার ফলে আমাদের সভ্যতা আমাদের সংস্কৃতি আরও বিকশিত, আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। ইংরেজরা কিন্তু অনমনীয়, অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সব প্রবণতা প্রতিরোধ করে গেল। আর এক দিকে, নিজেদের জীবনরীতি ও সংস্কৃতিই তারা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করল ভারতীয়দের ওপরে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে, যখন প্রশ্ন উঠল ভারত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করবে কিনা—রাজা রামমোহন রায় জোর দিয়ে বললেন ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া কোনও উন্নতি কিংবা বিকাশ হবে না, পাশ্চাত্যের মানুষদের কাছ থেকেই পাশ্চাত্য পদ্ধতিসমূহ না শিখলে আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারব না। সেই জন্যে আমরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিখলাম।

যথা সময়ে আবার তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। জাতি আত্ম-সচেতনতায় জাগ্রত হল, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগল তার মনে, কিন্তু সে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে কী করে তা বুঝতে পারল না। ঠিক রাস্তাটির জন্যে হাতড়াতে লাগল। সমস্যা হল বিচিত্র সাংস্কৃতিক, জাতিগত এবং ধর্মীয় উপাদানকে একত্রে কী করে মেলানো যাবে। ভারতের এই যে বৈচিত্র্য যা দেখলে মাথা ঘুরে যায়, তার তলে তলে কোন ঐক্য কি আছে?

এই অবস্থার মধ্যে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সে সমস্যার সমাধান করে দিলেন চিরকালের জন্য। তিনি বললেন, সমস্ত ধর্মই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পায়ের কাছে পৌঁছে দেয়। সর্ব ধর্মের সমন্বয়, যার ভিত্তি হবে বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতা এবং প্রেম, ভারতের জাতীয়তা-বোধের বিকাশের জন্য জুগিয়ে দেবে এক অক্ষয় বনিয়াদ।

লোকে যখন এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধি করল, তারা বুঝতে পারল যে শুধু ধর্মের নয়,

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সময় এসেছে সমন্বয়ের, বুঝল যে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে যত বৈচিত্র্য তার মধ্যে থেকে গড়ে তোলা যায় একটি জাতি।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এই সত্যটি যদি আমরা উপলব্ধি করতে না পারি, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, কোনও ক্ষেত্রেই সফলতা পাব না। এত-সব বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরাজ করছে একটি ঐক্য। বাইরের রূপ দেখে দমে না গিয়ে আমাদের উচিত সেই মূলগত ঐক্যের সন্ধান করা এবং আমাদের জীবন, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন, সেই চিরস্থায়ী ভিত্তির ওপর স্থাপন করা।

তার পর আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। আমাদের জাতীয়তাবোধের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হল। স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে জাতির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন স্বামীজি। তিনি জানতেন, ভারতীয় জীবনকে আলোকিত করতে পারে একমাত্র স্বাধীনতার আলো। বক্তৃতায়, কবিতায়, রচনায় তিনি ঘোষণা করলেন, 'স্বাধীনতাই আত্মার সংগীত"। অবশ্য তিনি আত্মার স্বাধীনতার কথা বলেছেন, কিন্তু এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই যে আত্মার উদ্বোধন হলে ঘুম-ভাঙার লক্ষণ দেখা দেয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে। লোকের স্বাস্থ্য যখন ভাল থাকে, প্রত্যেক অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে জীবনীশক্তির ঔজ্জ্বল্য। আবার তার অসুখ হলে, প্রত্যেক অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে দেখি বিবর্ণতা, রুগ্‌ণতা। জাতির জীবনেও এটা একই রকম সত্য। স্বাধীনতার স্পৃহা যখন কোনও জাতির অন্তরে দৃঢ়মূল হয়, তার লক্ষণ ছড়িয়ে পড়ে তার জীবনের সব ক্ষেত্রে।

স্বাধীনতার এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে নতুন আকৃতি নতুন রূপ দিতে এলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। তিনি ঘোষণা করলেন, "আমাদের লক্ষ্য ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন।" সাহসীর মতো কথা, মানুষকে অনুপ্রাণিত করবার মতো কথা। বাংলা, শুধু বাংলা কেন সমগ্র ভারত রোমাঞ্চিত হল, প্রাণ ফিরে পেল, সক্রিয় হয়ে উঠল, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রকাশ ঘটল। সমগ্র জাতি যেন সমস্বরে বলে উঠল, "এত দিনে পেলাম আমাদের মনের মতো মানুষ।" বন্ধুগণ, সে দিন ভারতের নেতাদের মধ্যে ক'জনের সাহস ছিল ও রকম কথা বলবার ? এইভাবে পঁচিশ বছর আগে জন্ম নিল আজকের জাতীয়তাবোধ।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে ভাগ করা যায় তিনটি অধ্যায়ে, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, ও অসহযোগ আন্দোলন। প্রথমে এল স্বদেশী আন্দোলন, মর্লি-মিন্টো সংস্কারের প্রবর্তনে যার অবসান। জনগণের একটা অংশ তাকে মেনে নিল, সন্তুষ্ট হল তাতেই। কিন্তু দেশের তরুণ সম্প্রদায়, স্বাধীনতার বীজ যাদের অন্তরে ইতিমধ্যেই মূল বিস্তার করেছিল, তারা মনে করল ও একটা ধাপ্পাবাজি, এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য অবলম্বন করল বৈপ্লবিক পন্থা।

বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পর এল অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করল সংগ্রামে যোগ দিতে। যা বলা হল তা ঠিকই। দেশের যত লোক, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা প্রত্যাহার করে, ভারত-সাম্রাজ্য এক দিনে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। মুষ্টিমেয় ইংরেজ কী করে শাসন করবে এই বিশাল দেশ। ভদ্রমহোদয়গণ, সমগ্র যশোহর জেলা শাসন করবার ইংরেজ আছেন কতজন ? তাঁদের শাসন একমাত্র এই কারণে চলতে পারে যে আমরা এগিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করি। একটি দৃষ্টান্ত দিই। যখন আমি বহরমপুর জেলে ছিলাম একজন সাধারণ কয়েদীর আত্মীয়-বন্ধুরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কয়েদীটি তাদের বলল, "বাড়ি গিয়ে সবাই বোলো আমি এখানে খুব আনন্দ আছি, সরকার আমাকে হাকিম বানিয়েছে, আমি ২০০জন কয়েদীকে শাসন করি।" আসলে, তাকে দেওয়া হয়েছিল কয়েদী সুপারভাইজারের পদ। ভদ্রমহোদয়গণ, এই ভাবেই তারা আমাদের শাসন করে আমাদেরই সাহায্য নিয়ে, এবং পদানত করে রাখে আমাদের। পরাধীন দেশে 'হাকিম' কেউ নয়, সবাই দাস। যেমন জেলের ভিতরে তেমনই জেলখানার বাইরেও তারা দাসদের শাসন করে অন্য দাসদের সহায়তায়।

অতএব দেশের লোক যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, সেখানে হবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান, বেশ কয়েক দশক আগে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে এটাই দেখেছিলেন সিলি, টাউনসেনড এবং অন্যেরা। ভারত যখন তার সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিল, টাউনসেনড লিখলেন, "এক দিনে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এক রাত্রিতে তার তিরোধান ঘটবে।"

বর্তমানে আমরা শুধু তাদের দাসত্বই করছি না অন্নও যোগাচ্ছি তাদের। ১১০ কোটি টাকা দামের তাদের প্রস্তুত সামগ্রী আমরা ক্রয় করছি, এবং তাতেই ইংল্যান্ডের ভরণপোষণ চলছে। সেই কারণেই আমরা বয়কট করেছিলাম, স্বদেশীর ব্রত নিয়েছিলাম। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে আমরা যত কর্মসূচি গ্রহণ করি, তার সর্বাগ্রে থাকে এই দুটি, অসহযোগ এবং বয়কট। উদ্দেশ্য, জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার সংকল্প জাগ্রত করা। জাতীয় সংকল্প জাগ্রত না হলে স্বাধীনতা আসতে পারে না।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা অবদমিত শ্রেণীর মানুষদের, শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে পাইনি। তারা চিরকাল যেমন অস্পৃশ্য ও অবহেলিত ছিল, আজও তাই আছে। আমাদের সঙ্গে তারা যোগ দেয়নি, কারণ তাদের সামাজিক দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারিনি আমরা। তারা বলে, কী গ্যারান্টি আছে যে স্বরাজপ্রাপ্তির পরেও অস্পৃশ্যতা বজায় থাকবে না, উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা শোষণ চালিয়ে যাবে না ? সেইজন্যে কংগ্রেসকে তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে, যে অবিচার ও শোষণ আর থাকবে না। যখন তারা বুঝবে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলে তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি লাভ করবে, তখন বিনা দ্বিধায় তারা যোগ দেবে আমাদের সংগ্রামে।

স্ত্রী-স্বাধীনতাও অবশ্য প্রয়োজন স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা সকলেরই জানা আছে, এখানে তার বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের নারীসমাজকে সব রকমের প্রতিবন্ধকতা থেকে এখন মুক্ত করা দরকার, তাদের বন্ধনমোচন প্রয়োজন। ভাগ্যের কথা, আজকের ভারতে গণতান্ত্রিক মনোভাব জাগ্রত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন জয়ী হবে, কেননা সে আন্দোলন ঈশ্বরপ্রেরিত। সারা বিশ্বের কল্পনাকে আজ আকৃষ্ট করেছে ভারত। সারা বিশ্বের সহানুভূতি আমরা লাভ করেছি, প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে, সে সহানুভূতি যাতে আমরা না হারাই। আমাদের কর্তব্য যদি আমরা করি, প্রয়োজন অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে সক্ষম হই, একমাত্র তা হলেই বজায় থাকবে সে সহানুভূতি।

আমি বিশ্বাস করি, ভারত বেঁচে আছে কারণ তার বেঁচে থাকা দরকার। সারা পৃথিবীর জন্যে দরকার তার বেঁচে থাকা। এখনও অনেক কিছু তার আছে বিশ্বকে শেখাবার। বিশ্বের প্রতি কোনও কর্তব্য যে জাতিকে সমাধা করতে হবে, তার মৃত্যু হতে পারে না। কত জাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু ভারত আজও বেঁচে আছে, কালের এত আঘাত সত্ত্বেও। সে অনেক কিছু দিয়েছে বিশ্বকে, কিন্তু এখনও বিশ্ব চায় তার শিক্ষা থেকে লাভবান হতে।

আমেরিকাকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বাগ্রগণ্য দেশ। গত বছর তারা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পায়। কিন্তু তার অনেক আগে সে পুরস্কার লাভ করেছেন এদেশের এক সন্তান। দাবি করা হয়, জিবিসানা নাকি বিশ্বের এক নম্বর কুস্তিগীর। এক মিনিটে গামা তাঁকে পরাস্ত করেছেন। একই ভাবে, দৈহিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পর্কিত নানা গুণাবলীতে ভারত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আজ ইউরোপ মানবিকতাবাদের কথা বলছে, আর আমাদের চণ্ডীদাস সেই বাণী উচ্চারণ করে গেছেন তাঁর কাব্যে, পাঁচশো বছর আগে।

ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মতো ভারতও এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থার জন্ম দেবে। মূল্যবান নানা সম্পদে তার চিত্ত সমৃদ্ধ। তাই সে বেঁচে থাকবে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের 'স্পিরিচুয়াল মিশন"-এর কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমি মনে করি, ভারতের মিশন কেবলমাত্র স্পিরিচুয়াল নয়, তার আরও অনেক দিক আছে। ধর্মীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সমাধান দিতে পারে একমাত্র ভারত। আমেরিকানরা বলে তারাই সবচেয়ে সভ্যজাতি, কিন্তু সেখানকার

নিগ্রোরা যেমন দাস ছিল, তেমনই দাস আছে। কৃষ্ণাঙ্গ সমস্যার সমাধান আমেরিকা করতে পারেনি। মহামানবের যে আদর্শ, একমাত্র ভারতই পারে তাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে। ভারতের যে-সব সমস্যা, তা বিশ্বের সমস্যা। বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে ভারতের ওপর। ভারতের সমস্যার যদি সমাধান হয়, বিশ্বের সমস্যারও সমাধান হবে। তাই আমি বলি, "ভারত বাঁচলে মানবজাতি বাঁচবে !"

বঙ্গদেশের বিতর্ক সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি
১২ আগস্ট ১৯৩১

ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া বোম্বাই থেকে বঙ্গদেশের বিতর্ক সম্পর্কে একটি খবর পাঠিয়েছেন। খবরটি সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিজনক। ডাঃ বি. সি. রায় গতকাল বোম্বাই থেকে এসে পৌঁছেছেন। তিনি বঙ্গদেশের বিতর্কের মীমাংসার জন্যে এই মর্মে একটি খসড়া প্রস্তাব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন :

১) আর কোনও তদন্ত হবে না।

২) ওয়ার্কিং কমিটির নিযুক্ত সালিশের মত অনুযায়ী যে-সব জেলায় নতুন করে নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেখানে নির্বাচন হবে তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

৩) অন্য সব জেলা-নির্বাচন বৈধ বলে গণ্য হবে।

৪) বি.পি.সি.সি.-র জন্যে অক্টোবরের নির্বাচন হবে মিঃ আনের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

গতকাল ডাঃ রায় মহাত্মা গান্ধীকে একটি তার পাঠিয়েছেন, তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন কোন কোন বিষয়ে আমি খসড়া প্রস্তাবটির সংশোধন চাই। তার পরেই আমি, গত কালের তার বার্তার বক্তব্য যে সঠিক, সেই মর্মে একটি টেলিগ্রাম মহাত্মাজীর কাছে সরাসরি পাঠাই।

টেলিগ্রামটি নিম্নরূপ :

"ডাঃ রায়কে প্রেরিত আপনার তারবার্তা। বর্তমান প্রাদেশিক নির্বাচন বি.পি.সি.সি. পরিচালিত, পণ্ডিত মতিলালজী কর্তৃক জানুয়ারি ১৯৩০-এ বৈধ ঘোষিত। আন্দোলনের জন্যে গত বছর নির্বাচন হয়নি। ১৯৩১ থেকে ১৯৩২-এর প্রাদেশিক নির্বাচন জুনে গৃহীত কংগ্রেসের বৎসর গণনায় পরিবর্তনের এবং সর্বভারতীয় নির্বাচনের সময়ের পরিবর্তনের কারণে। পরবর্তী প্রাদেশিক নির্বাচন আগামী বছর অনুষ্ঠেয়। খসড়া চতুর্থ পঞ্চম বিষয় সম্পর্কে : আমাদের বিবেচনায় তত্ত্বধায়ক নিয়োগে কোনও শর্ত আরোপ অনাবশ্যক। তবু, একটি স্থায়ী ন্যায়সঙ্গত মীমাংসায় আমরা আগ্রহী।

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, "ফ্রি প্রেস"-এর বোম্বাই থেকে প্রেরিত বার্তা সম্পূর্ণ অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। প্রকৃত ঘটনা হল, মীমাংসার জন্যে ঘরোয়া ভাবে কথাবার্তা এবং যোগাযোগ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে "ফ্রি প্রেস"-এর এমন অসতর্কতায় আমি দুঃখিত।

পরিশেষে একটি কথাই বলব। বোম্বাইয়ে খসড়া প্রস্তাব প্রস্তুতের সময়ে এটা জানা ছিল না যে কংগ্রেসের বর্ষ গণনার পরিবর্তনের দরুন এবং এ.আই. সি. সি.-র নির্বাচনের সময়ের পরিবর্তনের দরুন বি.পি.সি.সি.-র পরবর্তী নির্বাচন সামনের অক্টোবরে নয়, আগামী বছর কোনও এক সময়ে করতে হবে।

খবর এসেছে, বঙ্গদেশের নির্বাচন সম্পর্কে উত্থাপিত বিতর্ক নিয়ে মিঃ আনের তদন্তের ফলে যে সব প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী নাকি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রস্তাব করেছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তত্ত্বধানে তাঁরা সম্মত হন, এবং সে নির্বাচনে ওয়ার্কিং

কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন মিঃ আনে। বলা হয়েছে সে-প্রস্তাব গৃহীত হলে তাতে লাভ এই হবে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তত্ত্বাবানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীরা স্বাধীনভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের নির্বাচিত করে পাঠাতে পারবেন, এবং তার ফলে এমন কার্যকরী সমিতি গঠিত হতে পারবে যা হবে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর আস্থাভাজন।

গোল-টেবিল বৈঠক বয়কটকে স্বাগত

বি.পি.সি.সি.-র প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রদত্ত ভাষণ
১৫ অগাস্ট ১৯৩১

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যে গোলটেবিল বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে একাধিক কারণে আমি আনন্দিত। বর্তমানে গভনরমেন্টের যা মেজাজ ও মনোভাব, তাতে আমাদের জাতীয় দাবিসমূহ যে তাঁরা স্বীকার করতে চাইবেন সে সম্ভাবনা খুবই কম। তা ছাড়া সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বামপন্থীদের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে, এবং তাঁরা দাবি করতে পারেন, দেখা গিয়েছে যে তাঁরা যে জায়গায় দাঁড়িয়েছেন সেটাই সঠিক। প্রথম থেকেই চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে তাঁরা অখুশি। চুক্তির পরিণাম সম্পর্কে এবং গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তাঁরা আশাবাদী ছিলেন না। এখন যে কাজ বাকি থাকল তা হচ্ছে, ওয়ার্কিং কমিটিকে বসে এক দিকে গুরুতর ভাবে ভেবে দেখতে হবে, গভর্নমেন্টের কাছে কেতামাফিক নোটিস পাঠানো তাঁদের উচিত কিনা, যে চুক্তির অবসান হয়েছে, আর এক দিকে, এও গুরুতর ভাবে বিবেচনা করতে হবে, দেশের সামানে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কী হওয়া উচিত।

কেতামাফিক চুক্তির অবসানে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিশেষ কোন পরিবর্তন আসবে না। তার কারণ খুব সহজ। চুক্তিজনিত যে আবহাওয়া, এই হতভাগ্য প্রদেশ তা উপভোগ করতে পারেনি একদিনের জন্যেও। বঙ্গদেশে অর্ডিনান্স আছে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালগুলি আছে, ষড়যন্ত্র মামলা আছে, আরও অনেক ছোটখাটো ব্যাপার আছে, এ-সব নিয়ে দমন-পীড়নের যাঁতাকল গত মার্চ মাস থেকে নিরন্তর ঘুরে যাচ্ছে, যার ফলে, জনগণের মনের ভিতরে যদি দৃষ্টি-সঞ্চালিত করা যায়, দেখা যাবে, আস্থা ও বিশ্বাসের ছিটে-ফোঁটাও আজ অবশিষ্ট নেই সেখানে। দমন পীড়নে বাংলাদেশ এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এই প্রদেশে গান্ধী-আরউইন চুক্তির খেলাপ কাউকে আর বিস্মিত করে না, বরং অনিবার্যই মনে হয় সেটা। দুঃখের বিষয়, গভর্নমেন্টের দমননীতি এই প্রদেশে তরুণতর সম্প্রদায়ের মনের ওপরে কংগ্রেসের প্রভাব শিথিল করে দিয়েছে। এক দিকে গভর্ণমেন্টের মনোভাব, আর এক দিকে তার দমন-পীড়নের এটা যে অধ্যায় চলেছে, তার অবসান ঘটানোয় কংগ্রেসের ব্যর্থতা, তার ফলে আক্রোশে মস্তিষ্কের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন আমাদের তরুণেরা। এই আক্রোশের ফলে এবং দিনের পর দিন যে অহিংসার প্রচার করেছে কংগ্রেস, তার বিরোধিতায় ইদানীং বৈপ্লবিক কাজকর্ম আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গভর্নমেন্ট যদি আপস-নীতি গ্রহণ করে অহিংসার সপক্ষে যে আন্দোলন ও প্রচার কংগ্রেস চালাচ্ছে তাকে শক্তি না যুগিয়ে দেয়, আমি বুঝতে পারছি না, সারা দেশকে কংগ্রেস কী করে অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী করে তুলবে। যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিজ্ঞান থাকলে আপসের পথ অবলম্বন করতে হয়, গভর্নমেন্টের তা থাকবে, এ রকম আশা আজকের দিনে করা প্রায় অসম্ভব। অতএব, আশা এবং আলোক আসতে পারে কেবলমাত্র এক দিক থেকেই। গত বছরের মতো আবার যদি কংগ্রেস সংগ্রামী অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করে, তার দ্বারা শুধু যে সমস্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ভাসিয়ে দেওয়া

সম্ভব হবে, তাই না সারা দেশে কংগ্রেসকর্মীদের যত দল নিজেদের মধ্যে কলহে রত, সম্ভব হবে তাঁদেরও ঐক্যবদ্ধ করা। অতএব, আসুন আমরা ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃত্বের জন্যে অপেক্ষা করি।

বি.পি.সি.সি.-র নির্বাচন সংক্রান্ত বিতর্ক

অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকের প্রতি পত্র
১৮ই আগস্ট ১৯৩১

মহাশয়,

এই মর্মে একটি সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে যে "ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শ্রীযুত সুভাষ বসুর পক্ষে বোম্বাইতে এসেছেন, এবং মিটমাটের জন্য লিখিত ভাবে একটি প্রস্তাব—যার শর্তাবলী এই রকম...ইত্যাদি।" আমি জোর দিয়ে বলছি যে ডাঃ বি. সি. রায় আমার হয়ে বোম্বাই যাননি এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিতর্কের বিষয়ে আপস-মীমাংসার কোনও প্রস্তাব কিংবা সে-বিষয়ে কোনও কথাবার্তার সম্পর্কে আমি বিন্দু-বিসর্গও জানতাম না। প্রথম জানলাম যখন বোম্বাই থেকে ফিরে এসে ডাঃ রায় আমাকে অবাক করে দিলেন। চুক্তির শর্তাবলীর বিষয়ে আমার মতামত মহাত্মা গান্ধীর কাছে দিয়েছি। প্রথমত, আমি মনে করিয়ে দিয়েছি, বি. পি. সি. সি.-র পরবর্তী নির্বাচন হবার কথা সামনের অক্টোবরে নয়, আগামী বছর কোনও এক সময়ে। দ্বিতীয়ত, আমি বলেছি, বি.পি.সি.সি.-র নির্বাচন পরিচালনা করবার জন্যে বাইরে থেকে কোনও তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। ১৯২৮ থেকে ১৯৩১, এত দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় বি.পি.সি.সি.-র কাজকর্ম এবং সংগঠন আমরা চালিয়ে এসেছি, তার মধ্যে বি.পি.সি.সি.-র নির্বাচনও ছিল। এই পর্যায়ে কোনও তত্ত্বাবধায়কের সানুগ্রহ সহায়তার প্রয়োজন নেই আমাদের। বর্তমান ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগ, আমার মতে, বঙ্গদেশের মতো একটি প্রধান ও রাজনীতিতে অগ্রসর প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সরাসরি অপমান ছাড়া আর কিছু হবে না। আমি ভাবতে পারি না যে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ.আই. সি.সি. জোর করে একজন সুপারভাইজার আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে। নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও বিতর্ক যে কোনও নিরপেক্ষ সালিশের হাতে তুলে দেওয়া হোক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সমগ্র নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ আলাদা ব্যাপার, ব্যবস্থায় বিতর্ক নিরোধ করার বদলে তাকে উৎসাহিতই করা হবে।

এই প্রসঙ্গে, নির্বাচন-বিতর্কের মীমাংসার জন্য সালিশ হিসেবে মিঃ আনের নিয়োগ সম্পর্কে আর একটি অসত্য উক্তির কথা আমার মনে পড়ল। বলা হয়েছিল, স্থানীয় সালিশের নিয়োগের আমি বিরোধিতা করেছিলাম, এবং জোর দিয়ে বহিরাগত সালিশের নিয়োগ দাবি করেছিলাম। প্রকৃত ঘটনা হল, আমি তিনজন সালিশের নামের একটি তালিকা গান্ধীজির জন্যে প্রস্তুত করেছিলাম, এবং তার পরে বহিরাগত সালিশদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম, স্থানীয় সালিশদের নামের বিষয়ে যদি সহমত না হয়, তা হলে বিবেচনার জন্যে। সে কাগজটি, (যার ওপর দিকে স্থানীয় সালিশদের এবং তলার দিকে বহিরাগত সালিশদের নাম), বোধহয় এখনও মহাত্মা গান্ধীর কাছে আছে।

ত্রাণ তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

বঙ্গদেশ কংগ্রেসের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটির প্রেসিডেন্টকে লিখিত পত্র ২২ অগাস্ট ১৯৩১

প্রিয় মহাশয়,

আপনার মনে আছে ১৯২২ সালে উত্তর বঙ্গে ত্রাণ সংগঠনের জন্যে "বেঙ্গল রিলিফ কমিটি" নামে একটি বন্যাত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল। জনসাধারণ জ্ঞাত আছেন, কমিটির নাম ভেবে-চিন্তেই রাখা হয়েছিল, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি। উক্ত নাম রাখার কারণ, যে-সমস্ত ত্রাণ কমিটি ১৯২২-এর আগে স্থাপিত হয়েছিল, যাদের হাতে ব্যয়-না-হওয়া উদ্বৃত্ত অর্থ দিল, (যথা, ঢাকা সাইক্লোন ফান্ড), তারা সেই অর্থ ১৯২২-এর বন্যাত্রাণে ব্যয় করতে অনিচ্ছুক ছিল। এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে ঢাকায় ঘূর্ণিবাত্যায় ত্রাণকার্যের জন্যে সংগৃহীত অর্থ উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্যে আইনত ব্যয় করা যায় না। ১৯২২ সালে জনসাধারণের মনে হয়েছিল, উদ্বৃত্ত অর্থ বঙ্গদেশের যে কোনও অংশে পরবর্তীকালের বন্যা এবং অন্যান্য দুর্বিপাকের জন্যে সব সময়ে খরচ করা উচিত। তবু, আইনগত অসুবিধা এড়াবার জন্যে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ওই নাম ইচ্ছে করেই রাখা হয়েছিল, যাতে কমিটি যা ব্যয় করতে পারেনি এমন উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে বঙ্গদেশের যে কোনও অংশে ত্রাণকার্য হাতে নেওয়া যায়।

পরবর্তী কালে জানা যায়, ১৯২৩ সালে উত্তর বঙ্গে ত্রাণ কার্য বন্ধ করে দেওয়ার পর কমিটির হাতে কয়েক লক্ষ টাকা ছিল। উপরন্তু, উদ্বৃত্ত অর্থের মধ্যে একটা বড় পরিমাণ খাদির কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, খাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। সকলেই জানেন, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অন্যতম সেক্রেটারি শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত খাদি প্রতিষ্ঠানেরও সেক্রেটারি এবং প্রধান সংগঠক ছিলেন। সর্বশেষে প্রাপ্ত তথ্য, খাদি প্রতিষ্ঠান লোকসানের কারবার, এবং বিনিয়োগ-কৃত অর্থ উদ্ধার হবে না।

এখন, "বেঙ্গল কংগ্রেস ফ্লাড এন্ড ফ্যামিন রির্লিফ কমিটি"-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে, আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করুন, আপনার প্রতি তাই আমার অনুরোধ :

(১) উত্তরবঙ্গে ত্রাণকার্য ১৯২৩ সালে বন্ধ হওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কত অবশিষ্ট ছিল ?

(২) উদ্বৃত্ত অর্থের সবটা, কিংবা খানিকটা কি খাদির কাজে খরচ করা হয়েছে ?

(৩) যদি হয়ে থাকে, কত টাকা খাদির কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছে ?

(৪) খাদির কাজে বিনিয়োগের আগে কমিটির অনুমোদন কি নেওয়া হয়েছিল ? যদি নেওয়া হয়ে থাকে, সে অর্থের পরিমাণ কত, কোন্ ব্যাঙ্কে তা গচ্ছিত আছে ?

(৫) উদ্বৃত্ত নগদ টাকা যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, সে টাকা কি বেঙ্গল কংগ্রেস ফ্লাড এন্ড ফ্যামিন রিলিফ কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে ?

আমার খবর যদি সত্য হয়, বেঙ্গল রিলিফ কমিটির তিনজন সেক্রেটারি ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে দুজনকে ১৯২৩ সালে ত্রাণকার্য বন্ধের পর কত অর্থ ব্যয় হয়েছিল এবং বিনিয়োগ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখা হয়েছিল।

---

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে বর্তমান উপ-নির্বাচনের প্রসঙ্গে, কলকাতার পুর-নির্বাচন পরিকল্পনায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে খোঁজ-খবর করা হয়েছে। উত্তরে বলা যায়, ১৯২৪ সালে, যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রথম করপোরেশন দখল করে, তখন থেকে প্রত্যেক বার নির্বাচন চালিয়ে আসছে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। তার সে অধিকার প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত ১৯৩০ সালে, যখন বি.পি.সি.সি. তাঁর হাতে ছিল না, যদিও ১৯২৭ সালে যখন তিনি নির্বাচন করেছিলেন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন এবং কর্তৃত্ব তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু দাস, পুরসভার নির্বাচন পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব যাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল, প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে বি.পি.সি.সি.-র কর্তৃত্ব অমান্য করার জন্যে উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটিকে ভর্ৎসনা করেন। বি. পি. সি. সি. বঙ্গদেশে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তা ছাড়াও, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কেন বি.পি.সি.সি.-র ওপরে ন্যস্ত করা উচিত, জেলা কংগ্রেস কমিটির ওপর নয়, তার সঙ্গত কারণ আছে—তবুও, জেলা যদি নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে বি.পি.সি.সি.-র কাছে নাম সুপারিশ করতে চায়, সে অধিকার আছে তাদের। কলকাতায় পুর এলাকার অন্তর্গত কংগ্রেস জেলা পাঁচটি—উত্তর, দক্ষিণ, কেন্দ্রীয়, বড়বাজার ও ২৪ পরগণা। সেই কারণে বি.পি.সি.সি.-র মতো কোন উচ্চতর সংস্থা যদি সমগ্রভাবে নির্বাচনের দায়িত্ব হাতে না নেয়, জেলাগুলি যদি নিজের নিজের মতো চলে, গোলমাল হবে, খটাখটি লাগবে। আর, করপোরেশনের মধ্যে যদি একটি কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টি গঠন করতে হয়, তা সম্ভব হবে একমাত্র বি.পি.সি.সি.-র মতো একটি উচ্চতর সমন্বয়কারী থাকলে, তবেই।

তা ছাড়া, এমন কয়েকটি নির্বাচনমণ্ডলী আছে, যার এলাকা পুরোপুরি একটি কংগ্রেস জেলার মধ্যে পড়ে না। তেমনই একটি নির্বাচকমণ্ডলী ৬ নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডটির ওপর কর্তৃত্ব উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটি এবং বড়বাজার কংগ্রেস কমিটি উভয়েরই। এই রকম নির্বাচকমণ্ডলীতে দুটি জেলা কংগ্রেস কমিটি যদি প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে একমত না হয়, বিষয়টির মীমাংসা কে করবে ? সে রকম অবস্থা সামলাতে পারে একমাত্র বি.পি.সি.সি.-র মতো কোনও উচ্চতর সংস্থা। অতএব, সকলেই এটা বুঝতে পারবেন, জেলাগুলোকে যদি স্বায়ত্বশাসন দেওয়াও হত, উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কর্মিটি ৬ নং ওয়ার্ড থেকে মিঃ জে. এম. সেনগুপ্তকে প্রার্থী হিসেবে খাড়া করতে পারত না, বড়বাজার কংগ্রেস কমিটির সম্মতি নিয়ে। মিঃ জে. এম. সেনগুপ্ত একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন, যে কলকাতার ব্যাপারে বঙ্গদেশের অন্য ২৭টি কংগ্রেস জেলার কোনও কথা বলবার অধিকার নেই। আমার বক্তব্য তার বিপরীত। সমগ্র বঙ্গদেশ কলকাতার বেড়ে ওঠা এবং শ্রীবৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, এবং অবশিষ্ট বঙ্গদেশের সাহায্য ছাড়া, কলকাতা আজ যা হয়েছে, তা হতে পারত না। অতএব কলকতা হল বঙ্গদেশেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, এবং কলকাতায় যাঁরা প্রাচীন বাসিন্দা নন তাঁদের সকলকে যদি কলকাতা করপোরেশন থেকে আমাদের বাদ দিতে হত, তা হলে অনেক কাউন্সিলর এবং অফিসার ও কর্মচারীকে বাদ দিয়েই চলতে হত আমাদের। মিঃ সেনগুপ্ত কি তা চাইবেন ?

বি.পি.সি.সি.-র প্রেসিডেন্ট এবং কলকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যানের পদ থেকে ইস্তফার কারণ

বঙ্গদেশের কংগ্রেসকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

বঙ্গদেশের বর্তমান মতবিরোধ যে-দিন থেকে শুরু হয়েছে, আমার মনে হয় দেশপ্রেমী কংগ্রেসকর্মীদের মনে সুখ নেই। আমার কথা বলতে গেলে, একদম প্রথম থেকেই, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যত দূর সাধ্য, চেষ্টা করেছি যাতে বিরোধের অবসান হয়। প্রথম থেকেই আমি পরিষ্কার জানি, সমস্যার সমাধানের তিনটি উপায় আছে। প্রথম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সংবিধান ও নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করা এবং যাঁরা নিয়ম ভঙ্গ করছেন, শৃঙ্খলাভঙ্গ করছেন, কঠোর হস্তে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ; দ্বিতীয় : কংগ্রেসকর্মীদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে আপস হয় তার ব্যবস্থা করে কংগ্রেসের সমস্ত রকম কার্যকলাপ সমন্বয় সুনিশ্চিত করা ; তৃতীয় : উপরোক্ত দুটি উপায়ই যদি ব্যর্থ হয়, একটি পক্ষকে একেবারে সরে দাঁড়াতে রাজি করানো।

আমার নিজের যা অভিজ্ঞতা, এই প্রদেশে কংগ্রেস সংগঠনে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, একটি দল অথবা গোষ্ঠী তাদের বিরোধিতা করবেই। অন্তত বিগত দশ বছর তাই হয়ে আসছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির বিরুদ্ধে বিরোধিতা যখন দানা বাঁধল তাকে নিরস্ত্র করবার জন্যে, তার তীব্রতা কমাবার জন্যে প্রথম দুটি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের সংবিধান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে কোনও সমাধানে পৌঁছনো গেল না, কারণ, প্রথমত বঙ্গদেশে কংগ্রেসকর্মীদের এমন একটা দল ছিল যাঁরা যখনই সম্ভব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্য করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যাশা অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। একই ভাবে, বিভিন্ন দলের মধ্যে আপসের পথেও কোনও সমাধান পাওয়া গেল না।

স্মরণ থাকতে পারে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, যাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকি, বঙ্গদেশের মতবিরোধ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে যখন বঙ্গদেশে এসেছিলেন, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী আপসে রাজি হয়েছিলাম, কিন্তু অপরপক্ষ রাজি ছিলেন না। পণ্ডিতজি তাঁর রায় দেবার পর আশা করা গিয়েছিল, মতবিরোধের অবসান হবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি। একই রকমের বিরোধিতা এবং বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দেখা দিয়েছিল ১৯৩০-এর পুরসভা নির্বাচন, এবং আইন অমান্য কমিটির গঠনের সময়। এই বছর কংগ্রেস এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে যখন চুক্তি সম্পাদিত হল, আশা করা গিয়েছিল আমরা একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করব। আবার আশাভঙ্গ হল আমাদের। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রতি বিরোধিতা চলতেই থাকল। তার প্রকাশ দেখলাম জেলায় জেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটি গঠন এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বি.পি.সি.সি.-র গঠনে, যার নাম দেওয়া হল প্রাদেশিক কংগ্রেস সংঘ। তার পর এল গত মে মাসে নির্বাচনের সময় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহ। তখন ওয়ার্কিং কমিটি একজন সালিশ নিযুক্ত করলেন, সমস্ত ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে রায় দেবার জন্য। আবার আশা জাগল, সালিশের নিয়োগের ফলে শত্রুতার অবসান হবে। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বন্যাত্রাণ কমিটি গঠন করতে এগিয়ে সব দলকে তাতে যোগ দিতে আহ্বান করল, বিরুদ্ধবাদীরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে একটি আলাদা কমিটি গঠন করলেন। তার পরে এল নির্বাচনী ইস্তাহারে মিঃ জে. এম. সেনগুপ্তের একটি আবেদন। তিনি করপোরেশনের কংগ্রেস কাউন্সিলরদের আহ্বান করলেন কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা একটি কমিটি গঠন করতে। সেই আলাদা দল ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে এবং তাঁরা ইউরোপীয়দের এবং

মনোনীত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে খোলাখুলি মৈত্রী স্থাপন করেছেন।

ওপরে যা বললাম তার সংক্ষিপ্তসার হল, কংগ্রেস সংবিধান অনুসারে কিংবা আপসের দ্বারা বঙ্গদেশে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে কংগ্রেসকর্মীরা বিভক্ত, এবং এই অবস্থা থেকে ফায়দা লুটছে আমাদের শত্রুরা। এখন যারা সংগঠনটির দায়িত্বে আছেন, সমস্ত দলের সহযোগিতা আদায় করতে তাঁরা অক্ষম। আমাদের মনে হয়, বর্তমান মতবিরোধের জন্যে দায়ী আমরা নই, বিরুদ্ধবাদীরা। কিন্তু সাধারণ লোকেরা জানতে চায় না কার দোষ, তারা চায় যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে মতবিরোধের অবসান। আমার কোনও সন্দেহ নেই, আজ বঙ্গদেশের দাবি মতবিরোধের অবসান, এবং যদি তার জন্যে খুব কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তাও করতে হবে, তা হলেই বঙ্গদেশের মনের কথা ঠিকভাবে প্রকাশ করা হয়। এই প্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ফলে এই দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। এক দিকে আমাদের কয়েক লক্ষ স্বদেশবাসী বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছেন। আর এক দিকে চট্টগ্রামে অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে আমার দেশের লোক। তৃতীয়ত, দেশপ্রেমের অপরাধে কারারুদ্ধ আমাদের দেশের প্রায় আটশো জন শ্রেষ্ঠ সন্তান।

আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং সহকর্মীরা জানেন, দীর্ঘকাল ধরে আমি তৃতীয় উপায়টি অবলম্বন করে, অর্থাৎ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপন করবার কথা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি। দিনে দিনে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে পদ অধিকার করে থেকে কোনও কাজ হবে না, যদি সব দলের কংগ্রেসকর্মীদের সহযোগিতা জোটাতে না পারি। পদ অধিকার করে থাকলে আজ আর তাতে জাতির সেবার পথ সুগম হয় না, বরং বাধাগ্রস্তই হয়।

তৃতীয় পথ অবলম্বনে যদি কিছু দ্বিধা আমার থেকে থাকে, শেষ পর্যন্ত তাও দূর হল। হিজলি বন্দীশালার খবর শুনে যে মর্মান্তিক আঘাত আমি পেলাম—তার ফলে। কারাগারের ভিতরে ও বাইরে আমাদের স্বদেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখভোগ, আমাদের কাছে এক স্বর্গীয় সাবধানবাণীস্বরূপ, যেন আমরা বিভেদ ভুলে এক হয়ে শত্রুদের মুখোমুখি দাঁড়াই।

অতএব আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের এবং কলকাতা করপোরেশনের অল্ড্যারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগপত্র দাখিল করছি। সেই সঙ্গে আমি আমার স্বদেশবাসীর অন্তঃকরণে মহৎ এবং উচ্চ যা কিছু আছে তার কাছে আন্তরিক আবেদন করছি, আপনারা অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিন, এবং চিরতরে অবসান করুন বর্তমান মহাবিরোধের। আমি তাঁদেরকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমি কঠোর শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী, এবং কারও প্রতি কোনও বিদ্বেষ নেই আমার। একজন নগণ্য সাধারণ কংগ্রেসকর্মী হিসেবে আমি সন্তুষ্ট থাকব, এবং প্রেসিডেন্ট-আসন যিনিই অধিকার করুন, আমাকে কাজে লাগাতে পারবেন। আমি যে নিজেকে পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তার ফলে বঙ্গদেশ যদি রক্ষা পায়, সে মূল্য আমি সানন্দে দেব, এবং নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করব, যদি প্রতিদানে আমার স্বদেশবাসী তাঁদের এক কোণে আমাকে ঠাঁই দেন।

হিজলি বন্দিশালায় ও খড়্গপুর হাসপাতালে রাজবন্দিদের অবস্থা

হিজলি এবং খড়্গপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

শ্রীযুত জে. এম. সেনগুপ্ত, শ্রীযুত নৃপেন ব্যানার্জি, ডাঃ চারু ব্যানার্জি ও মিসেস ব্যানার্জি, শ্রীযুত সুশীল রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে গতকাল (শুক্রবার) আমি খড়্গপুর

গিয়েছিলাম। কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, শ্রীযুত শৈলজা সেন এবং শ্রীযুত রামসুন্দর সিংও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। হিজলি বন্দিশালায় আমাদের যেতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু খড়্গপুর রেলওয়ে হাসপাতালে আমি কয়েকজন রাজবন্দি দেখেছি, তাঁদের মধ্যে আহতরাও ছিলেন। যখন সেখানে ছিলাম, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট সত্য কি না তাও যাচাই করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন আমি বলতে পারি, সংবাদপত্রে যা বেরিয়েছে তাতে প্রকৃত ঘটনাকে কমিয়েই লেখা হয়েছে। রাজবন্দিদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল বিনা প্ররোচনায় এবং পৈশাচিকভাবে। শ্রীযুত সন্তোষ মিত্র এবং শ্রীযুত তারকেশ্বর সেনের মৃত্যু হয়েছে বীরোচিত এবং দেশ চিরদিন তাঁদেরকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রাখবে শহীদ হিসেবে। শ্রীযুত গোবিন্দ দত্ত ও শ্রীযুত শশীন্দ্র ঘোষ গুরুতর অবস্থায় রেলওয়ে হাসপাতালে শায়িত। শ্রীযুত কৃষ্ণপদ ব্যানার্জি, শ্রীযুত সুধীর সেন, শ্রীযুত সবিতা রায়চৌধুরী, যাঁরা হাসপাতালে আছেন, এবং শ্রীযুত আশুতোষ হাজরা, যিনি আছেন হিজলি বন্দিশালায়, তাঁদের অবস্থাও উদ্বেগজনক।

রাজবন্দিরা সবাই অনশন ধর্মঘট করছেন এবং নিরস্ত হবেন না যত দিন না বেসরকারি কমিটি গঠিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত রাজবন্দিরা হাসপাতালে আহতদের দেখতে যেতে পাচ্ছেন, কিন্তু মনে হয়, আগামী কাল (রবিবার) থেকে সে সুযোগ আর থাকবে না। তাই যদি হয়, গণ্ডগোল আবার শুরু হতে পারে। আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, নিষ্ঠুর হবেন না, রাজবন্দিদের অনুমতি দিন, যেন তাঁরা হাসপাতালে তাঁদের অসুস্থ বন্ধুদের সেবাশুশ্রূষা করতে পারেন।

অবর্ণনীয় যন্ত্রণা এবং অপমানবোধ নিয়ে আমি খড়্গপুর থেকে ফিরে এসেছি। কারাগারে আমাদের সাথীদেরকে গুলি করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে কুকুর বেড়ালের মতো। এই অবস্থায় কি আমরা ঝগড়া-মারামারি করব ? আসুন, আমরা সব বিভেদ ভুলে একতাবদ্ধ হয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াই। আজকের খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবৃতিতে আমি আগেই বলেছি, এখন থেকে আমি জনগণের এক সামান্য সেবক হিসাবে, আমাকে যেমনভাবে বলা হবে তেমনইভাবে সেবা করতে প্রস্তুত, এবং যতটা পারি, লোকচক্ষুর অন্তরালে সরে যেতেও প্রস্তুত। সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আমার কয়েকজন বন্ধু যে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাতে আমি আনন্দিত। তার ফলে এই বিশ্বাস আমার মনে আরও দৃঢ় হয়েছে যে, বাঙালীর মন আমি সঠিক বুঝেছি। আমরা আশা করব, আমাদের প্রচেষ্টার ফলে বঙ্গদেশ অবিলম্বে তার আগেকার মর্যাদা ও গৌরব ফিরে পাবে।

ব্যক্তিকে একাত্ম হতে হবে জাতির সঙ্গে

কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি প্রদত্ত ভাষণ
২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১

অনেক দিন পরে বঙ্গদেশের সব রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী একত্রে মিলিত হয়ে একই মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছে। দুঃখ, বেদনা ও অবমাননার ঘন কালো মেঘে একটিমাত্র আলোর রশ্মি কংগ্রেস কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হবার এই প্রচেষ্টা। ধর্মের সৌধ স্থাপিত শহীদের রক্তের ওপর। তাই হৃদয় থেকে আজ ধ্বনিত হচ্ছে এই একটিমাত্র ধ্বনি, 'শহীদের রক্তে পূত হোক জাতীয় ঐক্যের সৌধ'। যে ঘটনা ঘটল তার পরও বাঙালী যদি ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, সঙ্গত কারণেই তখন বলা যাবে, বাঙালী, তুমি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হও, তোমার মূল্যহীন অস্তিত্বের ভারে তুমি আর তাকে পীড়িত কোরো না। কিন্তু আমার স্বদেশবাসীর ওপর আমার বিশ্বাস আছে ; তাদের আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি জাতীয় ঐক্যের সৌধ নির্মিত হবে শহীদের রক্তের ওপর।

সেই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কথা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা প্রশ্ন। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে যা বলা হয়েছিল তা সত্য। কিন্তু কারণ কী ছিল ? কী যুক্তি ছিল ঘরের ভিতরে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বর্ষণের ? আর, গুলি যাঁদের করা হল, তাঁরা সাধারণ অপরাধী ছিলেন না, চোর-ডাকাত ছিলেন না, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন তাঁরা। হয়তো সরকার-বিরোধী মনোভাব তিক্ত করে তুলেছিল তাঁদের। কিন্তু বিশ্বজনীন ন্যায়নীতি অনুযায়ী, তাঁদের প্রাপ্য ছিল সেই রকম আচরণ, যুদ্ধবন্দিদের যা পাবার কথা। যুদ্ধবন্দিরা যে রকম ব্যবহার পেয়ে থাকে, বঙ্গদেশের রাজবন্দিরা অন্তত সে রকম ব্যবহার কেন পাবেন না, তার কোনও কারণ নেই। যখন আমি বহরমপুরে বন্দি ছিলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মৃদু হেসে আমায় বলেছিলেন, "একটিমাত্র পথ আমার খোলা আছে, আপনাকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করা।" আমিও হেসে জবাব দিয়েছিলাম, "ঠিক আছে। তা যদি আপনি করেন, এমন আগুন জ্বলবে যে, আপনিও পুড়ে ছাই হবেন।" প্রেসিডেন্ট যা বলেছেন তাই ঠিক, ভারতে অবৈধ কর্তৃপক্ষের এ হল অন্তিম শ্বাস। দেয়ালের লিখন পরিষ্কার। অন্যায়ভাবে যারা ক্ষমতা দখল করে আছে, ক্ষমতা তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে তাঁরা দেখছেন, জনগণ জেগে উঠছে, বুঝতে পারছেন তাঁদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ইংরেজ লেখক সিলি এবং টাউনসেন্ড ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "এক দিনে যে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, এক রাত্রিতে তা অদৃশ্য হবে।"

দেশবাসীর মধ্যে অনৈক্য ও দলাদলির জন্যেই ব্রিটিশেরা এ দেশে নিজেদের শাসন কায়েম করতে পেরেছিল। বাঙালীদের, বিশেষ করে তরুণ বাঙালীদের তারা পছন্দ করেনি। কিন্তু বাঙালীর অন্তরে যে আবেগ সুপ্ত আছে, একবার যদি তা জেগে ওঠে, তাকে প্রতিরোধ করবার সাধ্য কারও হবে না, সে জয়ী হবে।

বাঙালীদের বেলায় চুক্তির শর্তাবলী কখনওই মানা হয়নি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই দমন-পীড়ন চলেছে পুরোদমে। রাজবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়নি, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের প্রতি কোনও বিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়নি, ষড়যন্ত্রের মামলাগুলি প্রত্যাহার করা হয়নি, নতুন নতুন গ্রেপ্তার ও আটকের ঘটনা ঘটেছে প্রতিদিন। কোথায় গেল সে চুক্তি ? কোথায় গেল হৃদয়ের পরিবর্তন ? হৃদয়ই যেখানে নেই, পরিবর্তনের কথা সেখানে আসে না। ব্যক্তিগতভাবে একজন ইংরেজ দয়ালু স্বভাবের হতে পারেন, কিন্তু যখন তাঁরা টেবিলের চারপাশে বসে নিজেদের 'পলিসি' বিবৃত করেন, হৃদয়বত্তার সঙ্গে তখন আর তাঁদের কোনও সম্পর্ক থাকে না। তখন তাঁরা বলেন, "আরও দমন, আরও দমন চাই।"

নিজেদের স্বাধীনচিত্ততার জন্যে ও পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জন্যে বাঙালীরা ইংরেজদের চক্ষুশূল। গত ত্রিশ বছর ধরে বাঙালীরা তার জন্যে সংগ্রাম করেছে, দুঃখকষ্ট সহ্য করেছে। সেই জন্যে ইংরেজরা তাঁদেরকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন তারা ক্ষমতা ত্যাগ করবে, আয়র্ল্যান্ডে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান'-এরা যা করেছিল, এখানেও দেখব তারই পুনরাবৃত্তি। বঙ্গদেশের স্বদেশপ্রেমের সেই হবে অগ্নিপরীক্ষা। তখনই প্রমাণ হবে পূর্ণ স্বাধীনতার মূল্য দিতে বাঙালী প্রস্তুত।

এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, বাঙালী, তরুণ বাঙালী, সে দিন প্রমাণ করবে তার চরিত্রশক্তি। বাঙালী জানে কী মূল্য দিতে হয় স্বাধীনতার জন্যে। আমার দেশবাসী যদি সে মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে, তারা দাবি করুক পূর্ণ স্বাধীনতা। নয়তো, প্রভুদের সামনে তারা নতজানু হয়ে বসুক, খুদকুঁড়ো যা জোটে তাই হাত পেতে নিক, আর সেটাকেই স্বাধীনতা মনে করে আহ্লাদিত হোক।

নৃশংসতা দিয়ে বাঙালীকে কাবু করা যাবে না। বঙ্গদেশ বড় বড় মানুষের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তার মস্ত বড় এক দুর্বলতা এই যে কার্যক্ষেত্রে তারা এক হতে পারেনি, পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারেনি। সময় এসেছে, এখন ব্যক্তিকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে জাতি-সত্ত্বার মধ্যে আত্মবিলোপ করতে হবে। ওইখানে তার যে ব্যর্থতা, সেই কারণেই সহজাত নানা গুণে এত সমৃদ্ধ বাঙালী কার্যক্ষেত্রে এমন বারে বারে বিফল হয়।

বাঙালীদের শান্তভাবে, ঠাণ্ডা মাথায় ছকে নিতে হবে কী তাদের করা উচিত, এবং তার পর অগ্রসর হতে হবে সেই অনুযায়ী কাজ করতে। চট্টগ্রামে আর হিজলিতে যা ঘটেছে তার পরে আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না তারা। কিন্তু সব চেয়ে আগে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে তাদের।

রাজবন্দিরা সবাই তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে। তাঁদের এত দুঃখ-যন্ত্রণা যে বৃথা হবার নয়, তা প্রমাণ করতে হবে বাঙালীদেরই।

ও সব অভিযোগ যারা এনেছিল তারা নিজেরাই জানে অভিযোগগুলি সত্য নয়, তা না হলে এত দিন তাঁরা জেলের বাইরে থাকতেন না। সব অভিযোগ তোলা হয়েছিল শুধুমাত্র সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিসংবাদ ও বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করবার জন্যে।

আমার কথা বলতে গেলে, কংগ্রেস থেকে আমি সরে দাঁড়ালে যদি কংগ্রেসের যাত্রাপথ সুগম হয়, সানন্দে আমি সরে দাঁড়াতে রাজি আছি। যদি বুঝতে পারি, আমি লোকের চোখের আড়ালে সরে গেলে ভারতের স্বাধীনতা নিকটতর হবে, আমি সাগ্রহে তাতে প্রস্তুত। আগেই বলেছি, আমি জাতির একজন সামান্য সেবক। আমি আর কোনও পদ বা প্রতিষ্ঠা চাই না, শুধু চাই আমার দেশবাসীর হৃদয়ের এক কোণায় একটু ঠাঁই।

ব্যক্তিকে শিখতে হবে সকলের হিতের জন্যে নিজেকে বলি দিতে। দরকষাকষির কোনও মনোবৃত্তি যেন তার কাজের তাগিদ না জোগায়।

জামশেদপুরের পরিস্থিতি গুরুতর

২৪ সেপ্টেম্বরে প্রদত্ত বিবৃতি

জামশেদপুরের যা পরিস্থিতি তাতে জনসাধারণের উচিত গুরুত্ব সহকারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া। শ্রমিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ মানেক হোমির বিরুদ্ধে মামলায় জিতে এবং শ্রমিক ফেডারেশনের সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি এখন শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনকেও ধ্বংস করতে চাইছে। গত রবিবারে শ্রমিকদের একটি জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে। গুণ্ডারা সেই সভা ভেঙে দেয় এবং ত্রিশজনের বেশি তাতে গুরুতরভাবে আহত হন। শহরে এখন সবাই বলছেন গুণ্ডাদের সংগঠিত করার দায়িত্বে ছিল কোম্পানির দালালেরাই এবং এই প্রসঙ্গে কোম্পানির কয়েকজন সুপরিচিত অফিসারের নামও শোনা যাচ্ছে।

শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল কাউন্সিল রবিবারের ঘটনার তদন্ত করার জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করতে কোম্পানিকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু তা করা হোক বা না হোক, এ ব্যাপারে টাটার বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর একটি কর্তব্য আছে। খোয়াবার মতো সুনাম যদি তাদের কিছু থেকে থাকে, তাদের উচিত অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা। আমি বলতে পারি, যদি একটি নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং সাক্ষীদের যদি শাস্তি ভোগ না করতে হয়, তা হলে পুরোপুরি প্রমাণ হবে যে কোম্পানির কোনও কোনও অফিসারের নির্দেশে কোম্পানির কয়েকজন দালালই গত রবিবারের ঘটনার জন্যে দায়ী। তার পর থেকে অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি।

গতকাল শহরের উপকণ্ঠে আমার একটি সামাজিক কর্তব্য ছিল, এবং আমাদের ওপর আক্রমণের জন্যে গুণ্ডাদের ব্যাপক বন্দোবস্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে পূর্বাহ্ণেই আমাদের লোকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা আত্মরক্ষায় প্রস্তুত ছিল। সেই জন্যেই সেই পরিকল্পিত আক্রমণটি আর ঘটেনি। আমার কাছে খবর আছে শহরের গুণ্ডারা এখনও তৎপর

এবং আমাদের ওপর আক্রমণের সুযোগের সন্ধানে আছে। বলা বাহুল্য, কোম্পানির ব্যবহারে আমরা স্তম্ভিত। যদি তারা মনে করে থাকে গুণ্ডামি দিয়ে শ্রমিকদের দমন করা যাবে, আমাদের দমিয়ে দেওয়া যাবে, তারা ভুল করছে। যাদের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করতে হবে তারা শ্রমিক ফেডারেশনের পদাধিকারীদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ। এবার আমি একদিনের জন্যে জামশেদপুর এসেছিলাম, কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি আর সব কর্মসূচি বাতিল করে দিয়ে ঠিক করেছি এখানেই থেকে যাব। মালিক পক্ষ যদি এক জায়গায় গুণ্ডামির দ্বারা শ্রমিকদের দমন করতে পারে, অন্যত্রও সেই একই কৌশল অবলম্বন করবে। অতএব, আমাদের সামনে এখন জীবন-মরণের প্রশ্ন, এবং শান্তিপূর্ণ ও বিধিসম্মত উপায়ে কোম্পানির সঙ্গে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে শেষ পর্যন্ত।

টাটাদের আমি সাবধান করে দিতে চাই, এই সব কৌশল ছাড়ুন। তারা যা করেছে এবং ভবিষ্যতে যা করতে পারে তার জন্যে জনমতের আদালতে তাদের জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের সঙ্গে তাদের কারবার, তারা ন্যায়ের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই কোম্পানির দালালেরা তাদের আচরণের দ্বারা সব শ্রেণীর শ্রমজীবীকে খেপিয়ে তুলেছে এবং কারখানার সমস্ত বিভাগে তাদের বিরুদ্ধে মনোভাব তীব্র হচ্ছে। এর ওপরে আরও তাদের রাগিয়ে দিলে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এবং শিল্পে সংকটের সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের কথা বলতে গেলে, আমরা শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে সমস্ত রকম বিপদ ও পরিণতির সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।

হিজলি বন্দিশালায় অনশনরত রাজবন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলল না

১ অক্টোবর ১৯৩১-এ প্রদত্ত বিবৃতি

শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন ও আমি মঙ্গলবার সকালে ডাউন বোম্বাই মেল-এ খড়্গপুর পৌঁছই। প্রথম সুযোগেই আমরা অনশন ধর্মঘটরত রাজবন্দিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে আবেদন করি। আমরা কমান্ডান্ট মিঃ বেকারের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাদের বলেন, সরকারি আদেশ ছাড়া তিনি রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি আমাদের দিতে পারেন না। আমরা তাঁকে বলি, আমরা এসেছি আমাদের রাজবন্দি বন্ধুদের অনশন ধর্মঘট তুলে নিতে রাজি করানোর জন্যে। এবং হিজলি বন্দিশালার কমান্ডান্ট হিসেবে, ভাল মনে করলে, সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে। আমি যখন অর্ডিনান্সের ধারায় রাজবন্দি ছিলাম, একই রকম ক্ষেত্রে অনশন ধর্মঘটের সময় জেলের সুপারিনটেনডেন্ট নিজের বিবেচনায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিতেন। কিন্তু কমান্ডান্ট উত্তরে বললেন, সাক্ষাতের অনুমতি তিনি দিতে পারেন না এবং আমাকে অনুমতির জন্যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ টেলিগ্রাম করতে বললেন। আমি বললাম, তাঁর নিজের যদি সাক্ষাৎকারে আপত্তি না থাকে, টেলিফোনে তিনি গভনরমেন্টকে আমাদের ব্যাপারে আদেশের জন্যে বললে, কাজ তাড়াতাড়ি হবে। এতে উনি রাজি হন, এবং ঠিক হয়, বেলা ১টার সময় আমরা তাঁর কাছে যাব। ততক্ষণে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনও একটা জবাব হয়তো তিনি পেয়ে যাবেন।

বেলা ১টায় আমরা যখন হিজলি বন্দিশালায় গেলাম, সেপাইরা আমাদের গাড়ি আটকে দিলেন। বললেন, আমাদের ঢুকতে দেবার হুকুম নেই। আমরা সেপাইকে এবং হাবিলদারকে বললাম, আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী কমান্ডান্টের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এবং সকালে এভাবে আমাদের আটকানো হয়নি। কিন্তু তাঁরা অনড়। তখন আমি কমান্ডান্টকে লিখে জানালাম, তাঁর লিখিত পারমিট ছাড়া আমাদেরকে তাঁর অফিসে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কমান্ডান্ট জবাবে লিখলেন, তাঁর কাছে গিয়ে আমাদের কোনও লাভ হবে

না। তিনি মিঃ হাচিংস-কে টেলিফোন করেছিলেন। মিঃ হাচিংস তাঁকে বলেছেন, তিনি নিজে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে পারেন না, কিন্তু মিঃ প্রেন্টিস-এর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করবেন। কমান্ডান্ট আরও জানালেন, সেই দিনই রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করার সমস্ত প্রচেষ্টা আমাদের বিফল হল। সৌভাগ্যক্রমে সকালবেলা আমাদের দেখা হল শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে। তিনি যাচ্ছিলেন হিজলি বন্দিশালায় তাঁর ছোট ভাই শ্রীযুত বরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে আমরা বললাম, আমরা রাজবন্দিদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু অনুমতি পাব কি না জানি না। তাঁকে অনুরোধ করলাম, দেখা করবার অনুমতি যদি আমরা না পাই, রাজবন্দিদের কাছে আমাদের এই ইচ্ছাটি তিনি পৌঁছে দেবেন, যেন তাঁরা সর্বসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

নোওয়াপাড়া থানায় হয়রানি

১৪ অক্টোবরে প্রদত্ত বিবৃতি

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স-এর সংগঠকেরা আমাকে জানিয়েছেন যে আজ তাঁরা সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে পারবেন না। যেহেতু আজ কাজের দিন, শ্রমিকদের পক্ষে সম্মেলনে যোগ দেওয়া অসম্ভব যদি নাও হয়, অত্যন্ত কঠিন হবে। তা ছাড়া, শ্রোতাদের বিপুল সংখ্যার কারণে, সামিয়ানার বৃহৎ আকার সত্ত্বেও, সম্মেলন করতে হবে খোলা জায়গায় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন কঠিন হবে খোলা জায়গায় সম্মেলন করা। সংগঠকেরা জোর দিয়ে এ-ও বলেছেন, আজ যেন আমি জগদ্দল না যাই, যে-দিন সম্মেলন হবে, সে-দিন যাই। মুলতুবি সম্মেলন বেশি দেরি না করে এ সপ্তাহেই কোনও দিন করবার আয়োজন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে হিজলি থেকে আমার কাছে একটি জরুরি তলব এসেছে। তাই আমি আজ বোম্বাই মেলে হিজলি যাচ্ছি, কাল ফিরে আসব।

রবিবার অপরাহ্ণে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স-এর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত টি. সি. গোস্বামীর সঙ্গে আমি জগদ্দল যাচ্ছিলাম। জগদ্দল থানার সীমানায় পৌঁছবার আগেই, নোওয়াপাড়ার থানার এলাকার মধ্যে পুলিশের লোকেরা আমাদের আটকে দেয়। সেইখানে ঠেলাগাড়ি দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ অফিসারটি আমায় বলেন, তাঁর ওপরে আদেশ, তিনি যেন আমায় কলকাতায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। অন্যথায় তাঁকে আমায় গ্রেপ্তার করে নোওয়াপাড়া থানায় নিয়ে যেতে হবে। গাড়ি থেকে নামবার আগে আমি পুলিশ অফিসারটিকে সাবধান করে দিয়ে বলি, তিনি বেআইনি কাজ করছেন, এবং সে-জন্যে আমি তাঁকে দায়ী করব, কেননা আমি জগদ্দল থানার এলাকায় ঢুকবার আগেই আমায় গ্রেপ্তার করছেন তিনি। তিনি বললেন, তিনি নিরুপায়, তাঁর ওপর যা আদেশ তিনি তাই করছেন। আমি গাড়ি থেকে নামবার পর পুলিশ অফিসারটি 'নোওয়াপাড়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি ইচ্ছে করলে গাড়িতে থানায় যেতে পারি, যাতে হাঁটতে না হয়। দুজন কনস্টেবলকে তিনি আমার দায়িত্ব নিতে বললেন, এবং কনস্টেবল দুজন গাড়িতে (শ্রীযুত গোস্বামীর গাড়ি) উঠলেন এবং আমাকে নোওয়াপাড়ায় নিয়ে গেলেন। পাঁচটা নাগাদ আমরা সেখানে পৌঁছলাম।

আমরা থানায় পৌঁছবার পর অফিসার-ইন-চার্জ সব ওপরওয়ালাদের টেলিফোন করলেন। কিন্তু তাঁরা এসে পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকক্ষণ কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সাড়ে ছটা-সাতটা নাগাদ এস ডি ও (মিঃ ওয়ার্থ), এ. এস. পি (মিঃ বেমরোজ) এবং ইনসপেক্টর

ম্যাকেনজি এসে পৌঁছলেন। প্রথম দুজনের পোশাক দেখে মনে হল তাঁরা সোজা ক্লাব থেকে চলে এসেছেন, (পরে আমি শুনেওছিলাম টেলিফোন পাবার সময় তাঁরা ক্লাবে ছিলেন), এবং তৃতীয় অফিসারটি নিজেই জানালেন তিনি সোজা এসেছেন ফুটবল মাঠ থেকে। অতএব দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় তিনজন সর্বোচ্চ অফিসার দিব্য আরামে আমোদ-প্রমোদে রত ছিলেন যখন, তাঁদের কথা অনুযায়ী গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, এবং সেই কারণে জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন নিষিদ্ধ করতে হল, এবং জগদ্দল থানার এলাকায় প্রবেশ নিষেধ করে ১৪৪ ধারায় একটি আদেশ জারি করতে হল। অবশ্য সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র পুলিশের এক বিশাল সমাবেশের অনুষ্ঠান জগদ্দলে এবং আশপাশের কয়েকটি রেল স্টেশনে করা হয়েছিল, কিন্তু সত্যিই যদি গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকত, তিনজন সর্বোচ্চ স্থানীয় অফিসার জগদ্দল থানার সীমানা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ব্যারাকপুরে খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকতে পারতেন না। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি আরও জানতে পেরেছি, এস. ডি. ও. ব্যারাকপুরে তাঁর বাংলোতে ৪-৩০টে পর্যন্ত ছিলেন, এবং তার পর তিনি সোজা চলে যান ক্লাবে, এবং, আমি যেমন বলেছি, নোওয়াপাড়া থানায় তিনি ৬-৩০টা/৭টার আগে আসেননি। এস. ডি. ও. আমাকে আরও বলেছেন, রবিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত শনিবারের জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স-এর কথা কিছুই তিনি শোনেননি। তিনি আরও স্বীকার করেন, শনিবার সন্ধ্যায় সমাবেশে যদি গণ্ডগোল হত, সে-খবর তাঁর কাছে পৌঁছত।

নোওয়াপাড়া থানার ইনসপেক্টরকে সাবধান করে দিয়ে আমি যা বলেছিলাম, তাতে সম্ভবত বেশ কাজ হয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায় থানায় এস. ডি. ও. আমাকে বলেন, তিনি আমায় ছেড়ে দেবেন, যদি আমি কথা দিই যে কলকাতায় ফিরে যাব এবং জগদ্দলে আসব না। উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, যা হবার হোক, আমি তাঁকে কিংবা গভর্নমেন্টকে আমার গতিবিধি সম্পর্কে কোনও কথা দিতে পারব না, এবং ছাড়া পেলে, প্রথম সুযোগেই আমি জগদ্দল রওনা হব। তিনি বললেন, তাই যদি হয়, তিনি আমাকে ছেড়ে দিতে পারবেন না, আমাকে থানাতে আটক থাকতে হবে।

রবিবার রাত্রে নির্দেশ এল, আমি যদি কলকাতায় ফিরে না যাই, আমাকে যেন খাদ্য ও শয্যা না দেওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে সে-সব আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে আবার সেই একই নির্দেশ এল। ইনসপেক্টর আমাকে বললেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে, কারও সঙ্গে আমি দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারব না, এবং কোনও খাদ্য কিংবা পানীয় পাব না। আমি জবাবে তাঁকে বললাম, খাদ্য-পানীয় না দিলে তাতে আমার কিছু হেরফের হবে না। সোমবার সারাদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কারও সঙ্গে আমাকে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হল না (শুধুমাত্র একবার আমার ভাইয়ের সঙ্গে ছাড়া) এবং কোনও খাদ্য বা পানীয়ও দেওয়া হল না আমাকে (সকালে এক কাপ চা ছাড়া, এবং সে চা আমাকে দেওয়া হয়েছিল, খাদ্য-পানীয় না সরবরাহ করার নির্দেশ থানায় পৌঁছানোর আগে)।

সোমবার সারা দিন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন কিছু ঘটেনি, শুধুমাত্র সমস্ত দিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দলে দলে লোকের দেখা করতে আসা ছাড়া। রাত্রি এগারটা নাগাদ থানায় ইনসপেক্টর-ইন-চার্জ ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে বললেন, ওপরওয়ালার আদেশ পেয়ে তিনি আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি এনেছেন, এবং আমাকে কলকাতা যেতে হবে। আমি তাঁকে বললাম, রবিবার এবং সোমবারে আমি আগেই কলকাতার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি যে আমার ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে আমি কাউকে কোনও প্রতিশ্রুতি দেব না, ছাড়া পেলে আমি যেখানে খুশি যাব, এবং কলকাতায় যাবার জন্যে আমাকে জোর করা হলে আমি যাব না। আমি তাঁকে আরও জানিয়ে দিলাম, আমাকে ছেড়ে দেওয়ার পর নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় যাওয়ার জন্যে তিনি আমাকে জোর করতে পারবেন না। অফিসার-ইন-চার্জ অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোনে তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললেন, তার পর শেষ পর্যন্ত আমায় বললেন, আমি যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি, এবং সে জন্যে একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা আমার জন্যে করা হয়েছে। আমি উত্তরে বললাম, ওঁদের দেওয়া ট্যাক্সিতে আমি চড়ব না, কেননা ট্যাক্সির ড্রাইভার হয়তো

আমি কোথায় যেতে হবে বললে আমার কথা নাও শুনতে পারে। আমার নিজের গাড়ি নিয়ে আসা না হলে আমি থানা ছেড়ে যাব না। থানার অফিসার-ইন-চার্জ এ. এস. আর-এর অনুমতি নিলেন, তার পর আমার বাড়িতে ফোন করে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বললেন। মধ্যরাত্রির পর গাড়ি এল, এবং ৩১ ঘণ্টা বেআইনিভাবে আটক থাকার পর আমি মুক্ত হয়ে নোওয়াপাড়া থানা ত্যাগ করলাম।

রবিবার সকালে সম্মেলন সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট বেরিয়েছে। ওই সব রিপোর্ট পড়ামাত্র আমরা অনুমান করলাম আরও অনিষ্ট করবার চেষ্টা চলবে। এই সব অনিষ্টকারীরা সম্ভবত মিল-মালিকদের সাহায্য পেয়েছিল। তারা ১৪৪ ধারায় একটি আদেশ জারি করিয়ে নিল একজন অফিসারকে দিয়ে, যিনি নিজেই স্বীকার করেছেন রবিবার বেলা ১০টার আগে জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স-এর কথা কিছুই জানতেন না। আমি এস. ডি. ও-কে বললাম, তিনি যদি সত্যিই কোনও গণ্ডগোলের আশঙ্কা করেছিলেন, তার উচিত ছিল অনিষ্টকারীদেরই গ্রেপ্তার করা, যাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনের অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নয়। আমি তাঁকে আরও বললাম, যারা অনিষ্ট করতে চায় তাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সম্মেলনে কোনও গণ্ডগোলের আশঙ্কা আমি করিনি। যে সাম্প্রদায়িকতার জুজুর কথা এস. ডি. ও. এবং পুলিশ অফিসারটি স্বচ্ছন্দে বলে গেলেন, তার জবাবে আমি তাঁদের বললাম, কোনও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যাতে না হয় তার সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা হল শ্রমিক সম্মেলন, কেননা সে রকম সম্মেলনের মঞ্চে সমস্ত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। ১৪৪ ধারা জারির সমস্ত কাহিনীটা যদি বলা যায়, পড়তে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগবে। কিন্তু সে কথা পরে।

এই সব ঘটনার বিবরণ যে আমি দিলাম, তা আমার নিজের ব্যক্তিগত হয়রানির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নয়। আমি যে-দিকে জোর দিতে চাই তা হল, শ্রমিকদের একটি সম্মেলন, যাতে শ্রমিকরা এত চমৎকার সাড়া দিয়েছিলেন, সেটা যে হতে পারল না, সেটা স্থানীয় অনিষ্টকারীদের জন্যে নয়, (সে অঞ্চলে তাদের সত্যিকারের কোনও প্রভাব নেই) স্থানীয় অফিসারদের প্রচুর সহায়-সম্বল আছে, সেই কারণে। কায়েমী স্বার্থ আছে যাঁদের, তাঁরাই ওদের ব্যবহার করেছেন।

বঙ্গদেশ আবার নিজেই নিজেকে উদ্ধার করুক

১৬ অক্টোবর ১৯৩১-এ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে প্রদত্ত বিবৃতি

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত নই। বঙ্গদেশের ব্যাপারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা আমি কিছু দিন থেকে ছেড়ে দিয়েছি। এবং আমার ধারণা এই প্রদেশেও সাধারণের মনে ওই রকমই একটা ভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতপক্ষে, এ কথা বলা অতিরঞ্জন হবে না যে বঙ্গদেশের মারাত্মক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির ঔদাসীন্য এই প্রদেশের অনেক জায়গায় বিক্ষোভের সৃষ্টি করছে। এখন বঙ্গদেশের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ওয়ার্কিং কমিটিকে ভুলে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করা। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ নিজের চেষ্টায় নিজেকে বাঁচিয়েছিল। ১৯৩১-এও সেইভাবেই সে কেন নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না, তার কোনও কারণ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২৫ বছর আগেকার মতো বর্তমানের মর্মান্তিক পরিস্থিতিরও সম্মুখীন সে হতে পারবে, নিজের সমস্ত অভাব-অভিযোগের নিরসন করতে পারবে, ভারতের অবশিষ্টাংশ যদি তাকে সাহায্য নাও করে, কিন্তু তার জন্যে, বঙ্গদেশকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে, সব দলাদলি ভুলতে হবে, ব্যক্তির কথা ভুলতে হবে। আমি বড় আশায় আছি, বর্তমান মুহূর্তে বঙ্গদেশে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের অভাব হবে না। আমরা চাই,

আমাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা মহত্তম, তাঁরা সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে এগিয়ে আসবেন। আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণার প্রতি ওয়ার্কিং কমিটি উদাসীন থাকতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, অন্য প্রদেশের লোকেরা, আমরা এখন যে অহিংস সংগ্রামে রত, তাতে সর্বান্তঃকরণে আমাদের সঙ্গে আছেন।

কমিটি প্রথম পর্যায়ের তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করেছে। আগামীকাল তাঁরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনবেন। তারপর আমরা সাগ্রহে তাঁদের রিপোর্টের প্রতীক্ষা করব। কমিটি সরকারি হলেও, হিজলিতে তাঁদের কাজ সম্পর্কে আমাদের কোনও অভিযোগের কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। অন্তত, সেটাই আমার ব্যক্তিগত মত। কিন্তু সর্বসাধারণ কত দূর সন্তুষ্ট হবেন কমিটির রিপোর্টে, কত দূর তার অনুমোদন করবেন, সে-কথা বলবার সময় এখনও আসেনি। যাই হোক, কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য জনসাধারণ দেখতে পাবেন এবং তা থেকে নিজেরাই তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। এ সম্পর্কে আমি পরিষ্কার বলতে চাই, জনসাধারণ শুধু ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ রিপোর্টই চান না কমিটির কাছ থেকে, যে-সব ঘোর অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার যথোপযুক্ত প্রতিবিধানও চান।

জনসাধারণের একই দাবি চট্টগ্রামের ঘটনাবলী সম্পর্কেও। আমরা চাই, চট্টগ্রামের নিরস্ত্র ও অসহায় লোকের যে সাংঘাতিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ। আমার ব্যক্তিগত মত, হিজলি এবং চট্টগ্রামের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে যে তদন্ত হয়েছে তার ভিত্তিতে জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটা দাবির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে, এবং আন্দোলন শুরু করতে হবে সেই সব দাবির পূরণের জন্যে।

বাংলাদেশে নাগরিক অধিকারসমূহ এত অবলীলায় এবং এমন মুহুর্মুহু লঙ্ঘিত হচ্ছে, যে আমার মনে হয়, অন্যায়-অবিচারের এবং নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সমস্ত ঘটনার দ্রুত প্রতিকারের জন্যে 'সিভিল রাইটস্ কমিশন' নামে একটি স্থায়ী সংস্থা থাকলে ভাল হয়। সে রকম কমিটি যদি শক্তিশালী, সক্রিয় এবং যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হয়, এখন আমরা যে অন্ধকার অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, সংগঠিত জনমতের জোরে আমরা অবিলম্বে তার অবসান করতে পারব।

জামসেদপুরের শ্রমিকদের দাবি ও অভিযোগ

টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ
১৭ অক্টোবর ১৯৩১

কিছু দিন যাবৎ জামসেদপুরের শ্রমিকদের অমীমাংসিত অভিযোগ ও দাবিগুলো নিয়ে কর্তৃপক্ষের ওপর আমরা চাপ দিচ্ছি। জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১, রবিবার আমাদের বৈঠক হয়, এবং তখন কয়েকটি অভিযোগ ও দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর আবার আমরা জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠকে বসি এবং নিম্নে উল্লিখিত দাবি ও অভিযোগগুলি নিয়ে আবার আলোচনা করি তাঁর সঙ্গে, এবং সেই আলোচনার পূর্ণ লিখিত বয়ান পেশ করা হয় তাঁর কাছে। রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ডিরেক্টর মিঃ এ. আর. দালালের সঙ্গে আমি দেখা করি। সে দিনই সকালে তিনি বোম্বাই থেকে এসে পৌঁছেছিলেন। সেই সাক্ষাতের সময় তাঁর কাছে কয়েকটি অভিযোগ পেশ করি। পর দিন মিঃ দালালের সঙ্গে আমাদের একটি বৈঠক হয়। কমরেড নাইডু, কমরেড মৈত্র এবং কমরেড মণি ঘোষও সেই বৈঠকে ছিলেন। আমরা যে-সব দাবি ও অভিযোগের তালিকা জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আগেই পেশ করেছিলাম, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। আরেকটি প্রশ্নও আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করি তাঁর সঙ্গে, ২০ সেপ্টেম্বর জি-টাউন ময়দানের সভায়

যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে তদন্তের প্রশ্ন।

আমাদের প্রচেষ্টার ফল কী হবে এখনই বলা যায় না। অনেক কিছু নির্ভর করে শ্রমিকদের নিজেদের শক্তি ও একতার ওপর। তবু, আমরা আশা করি খানিকটা উন্নতি হবে। ইতিমধ্যেই কাজের সময় পরিবর্তন করে বেলা ৯-৩০টা থেকে ৫টা করা হয়েছে, মধ্যে আধ ঘণ্টায় ছুটি। অনেক বছরের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলে এসেছে বহু বাঞ্ছিত পরিবর্তন।

শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও দাবি

১) বেতনের বিল থেকে সদস্য-চাঁদা সংগ্রহ ব্যবস্থার পুনর্প্রবর্তন।

২) সার পি গিনওয়ালা ৩১ মার্চ ও ৭ এপ্রিল ১৯৩১ তারিখে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী, যে সমস্ত বার মিল শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে এনে যার যার বেতনে কাজে লাগাতে হবে।

৩) নতুন রেল মিল, নতুন ফিনিশিং মিল, প্লেট মিল এবং শিপিং ডিপার্টমেন্ট-এর লোকদের যত দিন বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তত দিনের পুরো বেতন তাদের দিতে হবে।

৪) সামান্য অজুহাতে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, বরখাস্ত করা হয়েছিল, তাদেরকে পুনর্বহাল করতে হবে।

৫) বিনা কারণে যাদের মজুরির হার কমানো হয়েছিল, তাদেরকে আবার পুরনো হারে মজুরি দিতে হবে।

৬) ভবিষ্যতে মজুরি কমানো চলবে না।

৭) সামান্য কারণে, উপযুক্ত তদন্ত বিনা সাময়িকভাবে বসিয়ে দেওয়া, এবং অন্যান্য শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে হবে, এবং সে-রকম ধরনের ঘটনার পুনর্বিবেচনা কর্তৃপক্ষকে যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে।

৮) বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া চলবে না।

৯) গেটে শ্রমিকদের গতিবিধির ওপর সমস্ত অযৌক্তিক বাধানিষেধ প্রত্যাহার করতে হবে।

১০) নির্দিষ্ট সময় অন্তর পাওনা ছুটিতে পুরো বেতন দিতে হবে।

১১) দৈনিক কিংবা সাপ্তাহিক মজুরিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নতুন করে নির্ধারণ করতে হবে এবং যত দূর সম্ভব, যাঁরা মাসিক বেতন পান তাদের মতন করতে হবে।

১২) অসুস্থতার কারণে অর্ধেক বেতনে ছুটি দিতে হবে।

১৩) অনেক বছর ধরে যে-সব গ্র্যাচিউটি এবং পেনশনের পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে, তার প্রবর্তন করতে হবে।

১৪) ১৯২৮ সালের মতভেদের মীমাংসার সময়ে যে অগ্রিম ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তা মকুব সরকারিভাবে করতে হবে, কারণ যদিও কর্মরত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সে ঋণ আদায় করা হচ্ছে না, কর্মচ্যুতির সময়ে সে ঋণ আদায় করা হচ্ছে।

১৫) কর্মীদের সন্তানদের স্কুলের বেতনে ছাড় দিতে হবে।

১৬) যে-সব ডিপার্টমেন্ট-এ বর্তমানে ডিপার্টমেন্টাল উৎপাদন বোনাস দেওয়া হয় না, সেখানে তা দিতে হবে।

১৭) জমি এবং বাসস্থানের জন্যে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করতে হবে।

১৮) যাঁরা এখন, যে-গ্রেডে তাঁরা আছেন তার ন্যূনতম বেতন পান না, তাঁদেরকে সেই বেতন দিতে হবে, এবং সেই গ্রেড অনুযায়ী অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁদের বার্ষিক বেতন-বৃদ্ধি চালু রাখতে হবে।

১৯) এক কামরায় কোয়ার্টার্সের (যেমন গোলখালি আর এন টাইপ, রামদাস ভট্ট এবং সি-টাউন) উন্নয়নের কাজে এখনই হাত দিতে হবে।

২০) শ্রমিকেরা যে-সব রাস্তায় এবং বস্তিতে থাকেন ও আসা-যাওয়া করেন, সেখানে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২১) যেখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই সেখানে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

২২) যতদিন কাজ করলে নারী শ্রমিক প্রসবকালীন সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন, তা এক বছর থেকে কমিয়ে ছ মাস করতে হবে।

২৩) কেরানি এবং টাইমকিপাররা যে অভিযোগের স্মারকপত্র ২২-৭-৩০ তারিখে পেশ করেছেন, বিশেষত জেনারেল শিফ্‌ট নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু রাখার প্রশ্ন বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

২৪) টাইম কিপিং ডিপার্টমেন্ট-এ জেনারেল রিলিভিং গ্যাং-এর প্রথা তুলে দিতে হবে, কারণ তার দরুন অত্যন্ত দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

২৫) বিদ্যালয় কমিটিসমূহে, ওয়েলফেয়ার কমিটিতে এবং অন্যান্য সব জনকল্যাণমূলক সমিতিতে শ্রমিক সংগঠনের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই।

চট্টগ্রাম এবং হিজলিতে তদন্তের ভিত্তিতে উত্থাপিত দাবি

সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ২৩ অক্টোবর ১৯৩১

বাংলাদেশের সমস্যাগুলি নিয়ে সর্দার বল্লভভাই পটেল প্রকৃতই কিছু করতে চান জেনে আমি আনন্দিত। শুধু, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক কলকাতায় বসুক এইটাই আমার ইচ্ছে ছিল, এবং কংগ্রেসের সভাপতির ইচ্ছা সত্ত্বেও, কয়েকজন সদস্যের অসুবিধার জন্যই যে তা সম্ভব হল না, তাতে আমি দুঃখিত।

খবরের কাগজে দেখছি, সর্দার পটেল বলেছেন যে বি.পি. সি.সি., কিংবা আমি হিজলির ঘটনার কথা তাঁকে জানাইনি। আমাদের সকলের মনে ধারণা জন্মানো হয়েছিল যে ওয়ার্কিং কমিটির বঙ্গদেশের সদস্যেরা কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছেন, তা ছাড়া, সেই সময়ে বি.পি. সি.সি.-র সভাপতি পদেও কেউ ছিলেন না, আমি হিজলির মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়েই পদত্যাগ করেছিলাম। হিজলির ঘটনার খবর সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিশ্চয়ই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে।

কংগ্রেস সভাপতিকে আমি আগেই জানিয়েছি, আমার পূর্ব-নির্ধারিত অন্য কাজ থাকার জন্য এ মাসের ২৭ তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আমি হয়ত উপস্থিত থাকতে পারব না, শহীদ তারকেশ্বর সেনের পূত দেহাবশেষ সমাধিস্থ করার জন্যে আমাকে বরিশালের গৈলা যেতে হবে। ও রকম পবিত্র একটি সর্বজনিক অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া, কিংবা বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবু, আমি আশা করি, বি.পি. সি. সি.-র বর্তমান সভাপতি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং সভার সামনে যাবতীয় তথ্য পেশ করবেন।

আমার মতামত আমি আগেই প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছি, চট্টগ্রাম এবং হিজলির তদন্তের ভিত্তিতে আমাদের ঠিক করতে হবে আমাদের দাবি কী কী। সে-সব দাবির মধ্যে অবশ্যই থাকা চাই সমস্ত রাজবন্দির অবিলম্বে মুক্তি এবং ভবিষ্যতে এ রকম মর্মান্তিক ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা। তা ছাড়া, আমাদের দাবি করতে হবে, আমাদের দেশবাসীর প্রতি যে গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে তার জন্যে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ। যে পূত অগ্নিশিখায় শহীদ সন্তোষ মিত্র এবং শহীদ তারকেশ্বর সেনের মরদেহ ভস্মীভূত হয়েছে, তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। চট্টগ্রাম এবং হিজলির মর্মান্তিক ঘটনাসমূহের সুদীর্ঘ ছায়া পড়েছে সারা দেশে। আমাদের আত্মার আগুনের অক্ষরে গভীরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে আমাদের

দাসত্ব আর অপমানের শিক্ষা। ইংলন্ড এবং ভারতের মধ্যে এখন শায়িত আছে সন্তোষ মিত্র এবং তারকেশ্বর সেনের মরদেহ। যেন ভুলে না যাই, যেন ভুলে না যাই !

ব্যক্তি-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, এবং হয়রানি

চাঁদপুর থেকে প্রদত্ত বিবৃতি, ১০ নভেম্বর ১৯৩১

শনিবার ৭ নভেম্বর ১৯৩১ তারিখে শ্রীযুত জে. সি. গুপ্ত, শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত অবিনাশ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে আমি নারায়ণগঞ্জে পৌঁছাই। স্মরণ থাকবে, ৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে এক জনসভায় আমাদের তিনজনকে ঢাকা তদন্ত কমিটির সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

স্টিমার যখন নারায়ণগঞ্জের ঘাটে পৌঁছল কয়েকজন পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবল এবং নারায়ণগঞ্জের সাব-ডিভিশনাল অফিসারও স্টিমারে উঠলেন। একটি লঞ্চও এসে স্টিমারের গায়ে লাগল। অল্পক্ষণ পরে একজন ইউরোপীয় পুলিস অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন (পরে জেনেছিলাম, তিনি অস্থায়ী পুলিস সুপারিটেনডেন্ট, মিঃ এলিসন)। তিনি ফৌজদারি আইনে ১৪৪ ধারায় দু মাসের জন্যে ঢাকা জেলায় আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে একটি আদেশ আমার হাতে দিলেন। তাতে স্বাক্ষর ছিল ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ গ্ল্যাডিং-এর। তারপর মিঃ এলিসন আমাকে সেই লঞ্চে উঠতে বললেন। সেই লঞ্চ আমাকে একটি স্টিমারে নিয়ে যাবে। সেই স্টিমার নারায়ণগঞ্জ থেকে সোজা চলে যাবে গোয়ালন্দ। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বললেন, কেননা ডাউন স্টিমারটিকে আমার জন্যে আটকে রাখা হয়েছে। আমি বললাম, আমার গন্তব্যস্থল ঢাকা, এবং যতক্ষণ আমি মুক্ত থাকব, ঢাকা অভিমুখেই যাব। আমি আরও বললাম, আদেশটি অর্থহীন, বে-আইনি এবং অপ্রয়োজনীয় এবং সেটি পালন করবার আমার কোনও ইচ্ছা নেই। মিঃ এলিসন তখন নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও এবং অন্যদের সঙ্গে খানিক পরামর্শ করলেন এবং তারপর আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমি আপনাকে গ্রেফতার করলাম"। তারপর তিনি বললেন, আমার লঞ্চে উঠে, যে মেল স্টিমারটি নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ যাচ্ছে তাতে চড়তে হবে। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, আমি যদি ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করি, আমাকে ১৮৮ ধারায় অভিযুক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু এইভাবে জোর করে ঢাকা জেলা থেকে আমায় বহিষ্কার করা যায় না। অস্থায়ী পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট আমার কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, তিনি ওই আদেশই পেয়েছেন। আমার মালপত্র লঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তবু, গভর্নমেন্ট এবং পুলিশ অফিসারদের যে কাজ স্পষ্টত বে-আইনি বলে আমার মনে হল, তার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ করলাম। তার ফলে মিঃ এলিসন খানিকক্ষণ থেমে থেকে আবার পরামর্শ করলেন নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত, আমার কাছে এসে তিনি বললেন, আমায় ডাঙায় নেমে তাঁর সঙ্গে থানায় যেতে হবে। আমি গ্রেপ্তার হয়েছিলাম, কাজেই তাঁর সঙ্গে স্টিমার থেকে নেমে গেলাম। তিনি আমাকে একটি গাড়িতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে গেলেন, প্রথমে তিনি আমায় বলেছিলেন থানায় আমাকে এক মিনিট থাকতে হবে, কিন্তু পরে দেখলাম আমার সেখানে থাকতে হল দু ঘণ্টার বেশি, থানাতে অফিসারেরা আরও অনেকক্ষণ শলা-পরামর্শ করলেন। কিছুক্ষণ পরে মিঃ এলিসন এসে বললেন, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কিন্তু আমি পুলিসের হেপাজতে আছি। তিনি আমাকে আরও বললেন, আমি যেন কলকাতায় ফিরে যাই এবং আদেশটি পালন করি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বললেন, তিনি প্রথম থেকেই জানেন, আদেশটি আমি অমান্য করব। তিনি আমাকে এ কথাও জিজ্ঞেস

করলেন, জগদ্দলে যখন অনুরূপ একটি আদেশ ১৪৪ ধারা অনুযায়ী আমার ওপর জারি করা হয়েছিল, তখন কী হয়েছিল। উত্তরে আমি বললাম, আমি যদি গ্রেপ্তার না হয়ে থাকি, তবে সেখান থেকে চলে যেতে চাই। ঢাকা আমার গন্তব্য, সেখানেই পৌঁছতে চাই আমি। আর, জগদ্দলের কথায়, আমি বললাম, আমার গ্রেপ্তারের পরই কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে বুঝতে পারেন তাঁরা ভুল করেছেন এবং শুধু যে আমাকে ছেড়ে দেন তাই নয়, ওই অঞ্চলে সভা করতে নিষেধ করে আমায় যে আদেশ দিয়েছিলেন তাও প্রত্যাহার করেন। তারপর আমি মিঃ এলিসনকে জিজ্ঞাসা করি, আমার অপরাধ যে এমন নয় যাতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় (নন- কগনিজিবল), সে কথা মনে রেখে তিনি কী করতে চান। আমি দাবি করি আমাকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হক। সেক্ষেত্রে, ঢাকাতেই আমার থাকা তাঁরা আটকাতে পারেন না। তখন মিঃ এলিসন এবং এস ডি ও চলে গেলেন। অন্য জায়গায় গিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ করলেন, এবং খুব সম্ভব ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গেও টেলিফোনে কথা বললেন। তিনি তখন নারায়ণগঞ্জ থেকে দশ মাইল দূরে ঢাকায় ছিলেন। ততক্ষণে আমি অস্থির হয়ে উঠছিলাম। থানা অফিসারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যাবার আগে মিঃ এলিসন যা বলে গেলেন, তাতে আমি কি মনে করব আমি তখনও গ্রেপ্তার হয়ে আছি, না ছাড়া পেয়েছি। থানা অফিসার সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারলেন না। অস্থায়ী এস পি-কে তিনি টেলিফোন করলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি উত্তর দিলেন, তিনি তখনই আসছেন। একটু পরে তিনি এসে বললেন, আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, কিন্তু বলতে গেলে এক রকম আটকই আছি। আমি বললাম, আমি সোজাসুজি এবং পরিষ্কার উত্তর চাই, আমি তখনও আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার আছি কি না। একবার আমাকে স্টিমারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলাম বলেই অস্থায়ী সুপারিনটেনডেন্ট-এর সঙ্গে থানায় এসেছি। সে সময়ে আমি গ্রেপ্তার না হলে থানায় আসতাম না। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মিঃ এলিসন কোন রকমে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। সোজাসুজি উত্তর তিনি কিছুতেই দেবেন না, একই কথা বলে চললেন, আমি এক রকম আটকই আছি বলা চলে। স্টিমারে গ্রেপ্তারের কথা আমি যখন বললাম, আমাকে বলা হল, সেটা একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। আমি উত্তর দিলাম, সেই গ্রেপ্তারটা নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি ছিল না, যদিও সেখানে আমাকে গ্রেপ্তার করাটা একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। তারপর বললাম, যেহেতু আমি তখন আর গ্রেপ্তার হয়ে নেই, আমি সে স্থান ত্যাগ করব । বলে আমি সত্যিসত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম। মিঃ এলিসন তখন আমার হাতটা চেপে ধরে আমায় আটকে দিলেন। দু' বার সে ঘটনা ঘটল। একজন পুলিশ অফিসারের সেই বে-আইনি আচরণে আমি প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, হয় আমাকে আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হক, নয়ত ছেড়ে দেওয়া হক। ও রকমভাবে নিছক বাহুবলের দ্বারা আমার স্বাধীনতা অপরহণ করা চলবে না। আমি তাকে সাবধান করে দিয়ে আরও বললাম, ওইভাবে বে-আইনি আচরণের ফলে আইন অনুযায়ী তাঁর শাস্তি হতে পারে। তিনি বললেন, তিনি সুরক্ষিত কেননা তিনি একজন অফিসার, আদেশ অনুযায়ী কাজ করছেন। আমি বললাম, তাতে তিনি আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না। কিন্তু আমার কথায় কিছুমাত্র প্রভাব পড়ল না তাঁর ওপরে। বেলা চারটে নাগাদ তিনি উঠে পড়ে আমায় বললেন, তাঁর সঙ্গে আমাকে চাঁদপুর মেল স্টিমারে যেতে হবে এবং সেই স্টিমারে তুলে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ঢাকা জেলার বাইরে। আমি বললাম, আমি যাব না, কেন না তাঁর কথা অনুযায়ী আমি গ্রেপ্তার হয়ে নেই। তখন হাত ধরে তিনি আমাকে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর দেখে আমি বাধাদানে নিরস্ত হলাম। কয়েকজন লোকের সমক্ষে আমি বললাম, কোনও আইনানুগ আদেশের কাছে নয়, আমি আত্মসমর্পণ করছি দৈহিক শক্তির কাছে।

থানা থেকে যাবার ঠিক আগে মিঃ ইলিসনকে আমি বললাম, যেহেতু দৈহিক বলপ্রয়োগে তিনি আমাকে ঢাকা জেলা ত্যাগ করতে বাধ্য করছেন, অতয়এ দায়িত্বশীল সরকারি

অফিসারদের বে-আইনি আচরণের জন্যে প্রয়োজন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেবার জন্যে আমি আমার উকিলদের নির্দেশ দিয়ে যেতে চাই। শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী তখন আমার সঙ্গে ছিলেন, এবং আমি তাঁকে কয়েকজন আইনজ্ঞকে নিয়ে আসতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু মিঃ এলিসন বললেন, কোনও আইনজ্ঞকে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না, এবং নরেনবাবুকে বললেন ফিরে আসতে। পরে মিঃ এলিসন বললেন, মিঃ জে. সি. গুপ্তকে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেবেন, কিন্তু মিঃ গুপ্ত যে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, থানা থেকে যাবার আগে তার জন্যে অপেক্ষা করলেন না তিনি। অবশ্য, মিঃ গুপ্ত স্টিমারে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে দিলাম, কী অবস্থায় জোর করে আমায় স্টিমারে তুলে দিয়ে ঢাকা জেলার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীযুত জে. সি. গুপ্ত, শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এই সব ঘটনার কালে অধিকাংশ সময়টাতেই আমার সঙ্গে ছিলেন, এবং আমি ঘটনার যে বর্ণনা দিলাম, সে বিষয়ে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন।

স্টিমার যখন নারায়ণগঞ্জ ত্যাগ করছে, এক বৃহৎ জনতা ঘাটে জড়ো হয়ে আমাকে সমর্থন জানাতে শুরু করল। মিঃ এলিসনের সেটা অসহ্য হল, কনস্টেবলদের নিয়ে তিনি স্টিমার থেকে নেমে লাঠি হাতে জনতাকে তাড়া করতে লাগলেন।

মুন্সীগঞ্জ পৌঁছানো পর্যন্ত সঙ্গের পুলিস দল সুদ্ধ মিঃ এলিসন স্টিমারে ছিলেন। মুন্সীগঞ্জ ঘাটে পুলিসের দল নামতে শুরু করল। মিঃ এলিসনকে আমি তখন বললাম, তাঁর সঙ্গেই আমার থাকার কথা, অতএব আমিও নেমে যাব। তাতে অস্থায়ী এস পি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি হুকুম দিলেন, স্টিমার থেকে ঘাটে নামবার সেতুর একটি বাদে সব তক্তা সরিয়ে ফেলা হক। পুলিসের সবাই নেমে যাবার পর তিনি তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তক্তাটি সরিয়ে ফেলা হল, যাতে আমি তাঁর পিছন পিছন ডাঙায় যেতে না পারি। স্টিমার তৎক্ষণাৎ চলতে আরম্ভ করল।

এই অবস্থায় চাঁদপুরে আসতে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে। আমার মালপত্র এস পি-র নির্দেশে ঢাকায় পাঠানো হয়েছিল। আমি যখন দেলখাম আমাকে ঢাকার বাইরে পাঠাতে তাঁরা বদ্ধপরিকর, আমি সে-সব আনতে লোক পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু মালপত্র এল না। এস পি আমায় বললেন, সময় মত আমার বিছানা না এসে পৌঁছলে তিনি আমার জন্যে কিছু বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু কাজে কিছুই করা হল না। আর আমার টিকিটের কথা বলতে গেলে আমাকে একটা পাস দেওয়া হল কেবলমাত্র মুন্সীগঞ্জের পরের স্টেশন গাজারিয়া পর্যন্ত। এস পি-কে আমি বললাম, গাজারিয়া থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত বিনা টিকিটে গিয়ে আইন ভাঙতে আমাকে বাধ্য করছেন তিনি। তাতেও তাঁর কোনও বিকার নেই।

পরে বর্ণিত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, যে কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি, এবং আবার বলছি, তা বলার সঙ্গত কারণ আছে। এই হতভাগ্য দেশে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলে আমাদের কিছু নেই। আমরা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় অফিসারদের করুণার ওপর নির্ভরশীল। আমার আরও মনে হয়, এমন অনেক কিছু ঢাকায় ঘটেছে প্রকাশ্য দিবালোকে যার বেরিয়ে আসা স্থানীয় অফিসারেরা চান না। তাঁদের সাংঘাতিক ভয়, পাছে তাঁদের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। মনে হয়, সেই জন্যেই আমার ওপর তাঁরা ১৪৪ ধারায় তাঁদের তদন্ত নির্ভীকভাবে শুরু করবেন এবং চালিয়ে যাবেন। আমার কথা বলতে গেলে, বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন, আবার আমি ঢাকা যাবার চেষ্টা করব। তার ফলাফল কী হবে, এখনই বলা যায় না।

ঢাকার উদ্বেগজনক ঘটনাবলীর কথা জনসাধারণ ইতিমধ্যেই শুনেছেন। আমি চাই, তাঁরা উপলব্ধি করুন যে আরও নিপীড়ন যাতে না চলে তার জন্যে দরকার স্থানীয় অফিসারদের আচরণ নির্মমভাবে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করা। আমাকে যদি বন্দি করা হয় (এবং সেটা প্রায় নিশ্চিতই মনে হয়), আমার আন্তরিক আশা জেলের বাইরে আমার যে সহযোগীরা থাকবেন তাঁরা সে কাজ নির্ভয়ে, অকুণ্ঠিতচিত্তে চালিয়ে যাবেন।

আত্মমর্যাদা, পৌরুষ এবং জনসাধারণের অধিকার পদদলিত

গ্রেপ্তারের সময়ে প্রদত্ত বাণী, ১২ নভেম্বর ১৯৩১

স্মরণ করুন চট্টগ্রাম ও হিজলির কথা। সেখানে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি নয়, সমগ্র জাতির প্রতি। আমার স্বদেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, জনগণের যে দাবি আমরা উত্থাপন করেছি চট্টগ্রাম এবং হিজলিতে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য, সে দাবি সমর্থন করুন, আন্দোলন করুন দেশবাসী।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন শীঘ্রই হবে, এবং সেই অধিবেশনে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। আমার প্রস্তাব, ইতিমধ্যে যদি সরকার আমাদের দাবি না মেটায়, বিলাতি দ্রব্য বয়কটের এবং পিকেটিং-এর এক আন্দোলন আমাদের আরম্ভ করা উচিত। আমি আশা করি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন বাংলা দেশকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব প্রদান করবে।

চট্টগ্রাম এবং হিজলির অত্যাচার যে সমস্যাটি তুলে ধরেছে সেটি শুধু বঙ্গীয় কংগ্রেসের নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির সমস্যা। কংগ্রেস সংগঠন যদি তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হয়, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা ব্যর্থ হবে না, বিষয়টি জনসাধারণ কেন নিজেদের হাতে তুলে নেবে না, তার কোনও কারণ থাকবে না। আত্মমর্যাদা, পৌরুষ এবং জনসাধারণের অধিকার পদদলিত হয়েছে, জনসাধারণের কর্তব্য সে-সব পুনরুদ্ধার করা। শেষ উপায় হিসাবে, আমার আশা, প্রয়োজন হলে জনগণ নিজেরাই একটি সংগঠন গড়ে তুলবে চট্টগ্রাম এবং হিজলির অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে, এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবে, সাফল্য না আসা পর্যন্ত। যাতে আমরা বিস্মৃত না হই, সারা দেশে আমার দেশবাসীর প্রতি আমার আবেদন, প্রতি সালের ১৬ তারিখ চট্টগ্রাম ও হিজলি দিবস হিসাবে পালন করুন।

হিজলি এবং চট্টগ্রামের জঘন্য অত্যাচারের প্রতিকার করতেই হবে

হরিশ পার্কের বক্তৃতা, ২৬ নভেম্বর ১৯৩১

এ বিশেষ মুহূর্তে আমাদের কী কর্তব্য যদিও আমি অসংখ্যবার সে-কথার পুনরাবৃত্তি করেছি, বিষয়টি যেহেতু অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমাদের জাতীয় সম্মান এর সঙ্গে জড়িত— আমার মনে হয়, দেশবাসীকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলার জন্যে আমাদের একটি প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করা দরকার।

নিপীড়নে অভ্যস্ত আমরা হয়ত পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারব না, কিন্তু অবস্থটা যদি আমরা তলিয়ে দেখি, বুঝতে পারব এ আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। চট্টগ্রামে যা ঘটল সে ধরণের অত্যাচার নতুন কিছু নয়, তবে তার মধ্যে নূতনত্ব এইটা যে, বেসরকারি তদন্ত কমিটি অভিযোগ করেছেন, স্থানীয় অফিসারদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব থেকে কোনও ক্রমেই রেহাই দেওয়া চলে না। সেই গুরুতর অভিযোগের কোন জবাব এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, এবং জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ধরে নিতে পারি অভিযোগ অমূলক নয়। গভর্নমেন্ট যদি কোনও জবাব না দেয়, দেশবাসী অভিযোগ সত্য বলে মেনে নেবে। অবশ্য যদি তাদের বলবার কিছু থাকে, অবিলম্বে তারা তা বলুক।

চট্টগ্রামের ঘটনা কোনও স্থানীয় অভিযোগের ব্যাপার নয়, কারণ একই ঘটনা দেশের যে কোনও জায়গায় যে কোনও সময়ে ঘটতে পারে। অতএব, এ রকম ধরণের জঘন্য অত্যাচারের বিষয়ে আমরা যদি উদাসীন থাকি, গভর্নমেন্ট মনে করবে এর প্রতিকারে আমরা

সম্পূর্ণ অক্ষম, এবং একই রকমের ঘটনা, আরও গুরুতর আকারে, ঘটাতেই থাকবে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক সন্তোষ এবং তারকেশ্বরের মরদেহ গ্রহণ করবার জন্যে সমবেত হয়, এবং মিছিল করে তাঁদের কলকাতার রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়। কিসের তাগিদ ছিল তাদের ? তারা বুঝেছিল, হিজলির অত্যাচার আবার ঘটতে পারে যে কোনও জায়গায়। নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার অধিকার ছিল তাদের। হিজলির হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালাবাগের চেয়েও জঘন্য, কারণ এখানে জড়িত ছিল এমন-সব লোকেদের জীবন, বিনা বিচারে যাঁরা বন্দি ছিলেন, এবং আমাদের দৃষ্টিতে তাঁদের কোনও অপরাধ ছিল না, যাঁদের দায়িত্ব ছিল সরকারের হাতে। কনস্টেবলটি পর্যন্ত প্রত্যেকে তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। এই ঘটনাতেই প্রমাণ হল, আমরা কত অসহায়।

আমরা যদি দাবি করি, সত্যি সত্যিই বিশ্বাস পোষণ করি যে আমরা মানুষ, তা হলে আমরা যে মোষ নই, মানুষ, সেটা প্রমাণ করা আমাদের কর্তব্য। যাঁরা আমাদের আইনশৃঙ্খলার অভিভাবক হিসেবে নিজেদের জাহির করেন, আমাদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে কোনও পরোয়া নেই তাঁদের।

এই যে অবস্থা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আমরাই এর জন্যে দায়ী। ১৯২০-তে কলকাতায় এবং তার পরের বছর নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে, পঞ্জাব এবং খিলাফত সংক্রান্ত যে-সব আমাদের অভিযোগ, তাকে স্থান দেওয়া হয়েছিল স্বরাজের দাবির ওপরে। তখন আমি বুঝতে পারিনি সে-কাজ কেন করা হল, এখন তার কারণ বুঝতে পারছি। আমাদের জীবন ও সম্পত্তির ভাবনা সর্বাগ্রে, স্বরাজের কথা তার পরে। সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় আমাদের অধিকার। সেটা যদি আমরা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, স্বরাজের যে বৃহত্তর প্রশ্ন, তার মীমাংসায় কোনও অধিকার আমাদের থাকবে না। বঙ্গবিভাগ যদি বাঙালীরা মেনে নিত, স্বরাজের জন্য অমন গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম করতে পারত না তারা। এবারও আমাদের সামনে একই ধরণের সমস্যা, একই ধরণের সংকট উপস্থিত।

দুর্বল বাঙালী, নিরন্ন বাঙালী "সেট্‌লড, ফ্যাক্ট"-কে "আনসেট্‌লড" করে দিয়েছিল। তারা যুদ্ধজয়ের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। এখন সময় এসেছে, তাদের প্রমাণ করতে হবে নিজেদের শক্তি। তাদের সংগঠিত করতে হবে নিজেদেরকে, লড়াই করতে হবে বীরের মত। এই সব অত্যাচার যদি আমরা মেনে নিই, ক্ষমতাসীন সরকার মনে করবে, আমরা সব কিছুই মেনে নেব। আপনারা কাজে প্রমাণ করুন, এ-সব আমরা কিছুতেই মেনে নেব না।

যারা নিপীড়ন করে তাদের চেয়ে বড় অপরাধী তারা— যারা সে নিপীড়ন মেনে নেয়। পাঁচ কোটি বাঙালী সমস্বরে দাবি করুক, প্রতিকার চাই। আর সব অভিযোগ অনুযোগ ত্যাগ করুন এই সব বিষয় মনে রেখে। অর্ডিন্যান্স এবং স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল দিয়ে নিপীড়ন আরম্ভ হয়েছিল ক্ষুদ্র আকারে। তার পিছন পিছন এল চট্টগ্রাম এবং হিজলি। সে-সবও যদি আমরা মেনে নিই, আরও বড়, আরও গুরুভার নিপীড়ন আছে আমাদের অদৃষ্টে।

হিজলি এবং চট্টগ্রামের ব্যাপারে জনসাধারণের যে-সব দাবি, ইতিমধ্যেই সেগুলো ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের আন্দোলন হোক তার ভিত্তিতে। আমরা যদি চুপ করে থাকি, সারা পৃথিবীর সভ্য সমাজের চোখে আমরা হাস্যাস্পদ হব। বিশ্রামের সময় নেই, হিজলি ও চট্টগ্রামের প্রতিকার করতেই হবে।

বয়কট কর্মসূচি

খুলনা পরিত্যাগের আগে প্রদত্ত বিবৃতি, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৩১

বহরমপুরে বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এগার দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, বি.পি. সি. সি. এখন পর্যন্ত সে প্রস্তাবে সম্মতি জানায়নি, এবং রীতিসম্মত অনুমোদনের জন্যে প্রস্তাবটি ওয়ার্কিং কমিটির কাছেও পাঠানো হয়নি। শ্রী রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রী নরিম্যান এবং শ্রী আনে বহরমপুরে আমাদের জোর দিয়ে বলেছিলেন, বঙ্গদেশ থেকে পাঠানো যে কোনও কর্মসূচি ওয়ার্কিং কমিটি অনুমোদন করবে। অতএব, অনেকটা সময় বৃথা নষ্ট হল। যাই হোক, সামনের ২৯ ডিসেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসছে, এবং আমার আশা বি.পি. সি.সি.-র সংযুক্ত কমিটি যথেষ্ট সময় থাকতে বয়কট প্রস্তাবটিতে সম্মতি জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে, সারা প্রদেশের যত কংগ্রেস সংগঠন এবং অন্যান্য সংস্থা বয়কট প্রস্তাব কার্যকর করবার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করুক। প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ, সেছচ্ছাসেবীর তালিকা প্রণয়ন এবং ইস্তাহার ছাপায় অনেক সময় লাগবে, এবং এই সব প্রাথমিক কাজকর্ম এখনই আরম্ভ করা দরকার। খুলনা থেকে ফিরে আমি পুণা এবং বোম্বাই যাব। বোম্বাইয়ে, আমি আশা করি, মহাত্মা গান্ধীর ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে, বয়কট প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক রীতিসম্মত ভাবে অনুমোদিত হবার পর অবিলম্বে আমরা আন্দোলন আরম্ভ করব।

ঈশ্বরেচ্ছায়, আমি আশা করি, সমগ্র প্রদেশে একযোগে বয়কট প্রস্তাব কার্যকর করবার উপায় নির্ধারণের জন্যে জানুয়ারির প্রথম দিকে সব জেলা থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সম্মেলন আহ্বান করতে পারব।

চুক্তি সত্ত্বেও নিপীড়ন সমানে চলছিল

মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ২২ ডিসেম্বর ১৯৩১

বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সারা বিশ্বের যুবসম্প্রদায় অধৈর্য হয়ে উঠছে। তাদের একটা স্বপ্ন আছে, ভবিষ্যতের একটা চিত্র আছে তাদের কল্পনায়, উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার একটি চিত্র। সে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার জন্যে সর্বত্র তারা অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করছে। হতে পারি আমরা স্বপ্নদর্শী, কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আজকের স্বপ্ন আগামী কাল হতে পারে বাস্তব। সেই আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা গুরুতর এক সংগ্রামে লিপ্ত, আজকের কঠোর বাস্তবের আজকের যত বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে, আমাদের নিজেদের এবং আমাদের দেশবাসী সকলের জন্যে এক নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে।

আমি জানি এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা মনে করেন পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতায় আমাদের মঙ্গল হবে না, কেননা তাতে স্বেচ্ছাচারিতা আসতে পারে। তাঁদের সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই আমাদের। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করে আমরা সময় ও শক্তির অপচয় করতে চাই না। শুধু এইটুকুই আমরা বলব, মৌলিক মতভেদ আছে তাঁদের সঙ্গে আমাদের, আমরা বিশ্বাস করি, স্বাধীনতা সকলের প্রাপ্য, স্বাধীনতা আমরা যত বেশি পাব, আমাদের নিজেদের এবং মানবজাতির তত বেশি কল্যাণ হবে...কিন্তু, বন্ধুগণ, যুবজনের পক্ষে সহজ নয় নিজেদের কণ্ঠস্বর লোকের কানে পৌঁছে দেওয়া। প্রায়ই চেষ্টা করা হয় সে-কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করার। কিন্তু

কষ্ট করে যাঁরা কান পেতে থাকেন তাঁরা সেই রুদ্ধ কণ্ঠস্বরও শুনতে পান। আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যেও যুবসম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। ফলে, আপনারা দেখতে পান, দেশের কোথাও কোথাও কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুব দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক আবেদন আমাদের দেশে যাঁরা আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী, তাঁদেরকে কংগ্রেসে প্রবেশ করতে দিন। কোনও দলের কোনও সংগঠনের তাঁরাই আসল শক্তি এবং আমার মতে এই রকম মৌলিক যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে না দিলে বিপদ হতে পারে, এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়।

গোল-টেবিল বৈঠক যে ব্যর্থ হল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় তার প্রধান কারণ, সেই যে চুক্তি, দুর্ভাগ্য নিয়েই যার জন্ম হয়েছিল, সেটির স্বাক্ষরের সময়ে যুবসম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর অল্পবিস্তর উপেক্ষা করা হয়েছিল। উচিত ছিল, দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যেই গোল টেবিল বৈঠক সীমাবদ্ধ রাখা। দুঃখের বিষয়, এমনি কি যাঁরা আনুগত্যপন্থী (loyalist) সাম্প্রদায়িকতাবাদী, এবং যাঁরা কেউই নন, তাঁদেরকেও গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছিল। মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা নয়, প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। এই অবস্থায় গোল টেবিল বৈঠক যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সে আর আশ্চর্য কী ? এই গোল টেবিল বৈঠক আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় "আইরিশ কনভেনশন"-এর কথা, আয়ার্ল্যান্ডের "শিনফিন" দলভুক্তদের জন্যে পাতা সে ছিল একটা ফাঁদ। তাঁরা সে ফাঁদ থেকে শত হস্ত দূরে থাকলেন, আর আমরা সেই রকম ফাঁদেই পা দিলাম। অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম হত, যদি আমরা জোর দিয়ে বলতাম, একমাত্র যাঁরা সংগ্রামী দলভুক্ত তাঁদের প্রতিনিধিদেরই উপস্থিত থাকতে দিতে হবে, এবং যদি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আদায় করে নিতাম এই প্রতিশ্রুতি যে, করাচি প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয়দের মৌলিক দাবিসমূহ স্বীকার করে নেওয়া হবে, বৈঠকে আলোচনা হবে শুধু খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে। তা করা হল না। ফলে বৈঠক বসল, ভারত যে স্বরাজ পাবে তার রূপ কী হবে, তা নিয়ে নয়, ভারত আদৌ স্বরাজ পাবে, না স্বরাজের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র পাবে, তাই নিয়ে আলোচনার জন্য। এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে তার একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী যে স্বরাজের দাবি করলেন, তার বিরোধিতা করবার জন্যে খাড়া করে দেওয়া হল নানা ধরণের লোককে।

এই যে ভুলটি করা হল চুক্তি সম্পাদনের সময়ে, তার জন্যে দায়ী শুধু কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ নন, ভারত গভর্নমেন্টও। আমি বলি, এ বিষয়ে গভর্নমেন্টের দায়িত্বই অধিকতর। চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল, তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল দেশের দুই সংগ্রামী গোষ্ঠী, বিপ্লবী বন্দিরা এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিরা ছিলেন যাঁদের প্রতিনিধি। লর্ড আরউইনকে জানানো হয়েছিল এবং পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, শান্তি যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, উপরোক্ত দুই সংগ্রামী গোষ্ঠীকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না, তাতে কাঙ্খিত ফল লাভ হবে না। কোনও কাজ হল না সে উপদেশে। চুক্তি ঘোষণার ফলে সত্যাগ্রহী বন্দিদের মুক্তি হল, কিন্তু সারা দেশে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এবং অন্যান্য বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা পুরোদমে চালিয়ে যাওয়া হল। সারা দেশে জেলখানায় বিপ্লববাদী বন্দিরা হলেন বিস্মৃত, অবহেলিত। এই দুই গোষ্ঠী ছাড়াও, যে-সব রাজবন্দিরা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ তাদের মুক্তি না দেওয়াটাও হল সবচেয়ে বড় ভুল।

তার ওপর, কংগ্রেস এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে নামে মাত্র চুক্তি যদিও একটা হল, নিপীড়ন চালিয়ে যাওয়া হল মহা আনন্দে। বিনা বিচারে আটক রাজবন্দিদের সংখ্যা স্ফীত হতে থাকল দিনে দিনে। যেমন নিপীড়নের মাত্রা তেমনই তার বৈচিত্রও বেড়ে যেতে লাগল। গভর্নমেন্ট যে-সব নীতি অবলম্বন করল, তার দ্বারা মানুষকে খেপিয়ে তুলতে লাগল তারা। কংগ্রেস তা বন্ধ করতে পারল না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবসম্প্রদায় যখন এতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এবং তার ফলে দুঃখজনক সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটতে লাগল, ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এবং সরকারি শানসযন্ত্রের এজেন্টরা, যাদের আমরা সরকারি সন্ত্রাসের জন্য দায়ী মনে করি, সব দোষ তারা

কংগ্রেস এবং তার প্রতিনিধিদের ওপর চাপাতে লাগল। আমি যাকে বলি সরকারি সন্ত্রাস, তার প্রতিরোধে কংগ্রেসের ব্যর্থতাই, আমি মনে করি, দেশের নানা অংশে, বিশেষ করে বাংলায়, যুবসম্প্রদায়ের ওপর কংগ্রেসের প্রভাব হ্রাসের কারণ। সরকারি শাসন-যন্ত্রের দমননীতিকে কংগ্রেস যদি পরাস্ত করতে পারত, অপ্রতিরোধ্য হত কংগ্রেসের অহিংসানীতির আবেদন। কিন্তু এখনও যা অবস্থা, স্বীকার করতেই হয়, সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতা-মঞ্চে আমরা অহিংসা বজায় রাখবার জন্যে বারে বারে যে আবেদন জানাই, তাতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না। গভর্নমেন্ট যখন কার্যক্ষেত্রে দেখিয়েছে, 'চুক্তি'-র তারা অবসান করেছে, তখন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহাত্মা গান্ধী ভারতে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে অনুরোধ করা উচিত, তিনি গভর্নমেন্টের কাছে একটি চরমপত্র পাঠান। আমি বুঝতে পারি না, কংগ্রেস 'চুক্তি'র ছায়াটিকে কেন আঁকড়ে ধরে থাকবে, বস্তুটিই যখন অন্তর্হিত।

কংগ্রেসের উচিত সাহসে বুক বাঁধা

শিবাজী মন্দিরে মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩১

কোন মহলেই আর কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে আমাদের মনে স্বাধীনতার ক্ষুধা জেগেছে। তীব্র নিবিড় এই ক্ষুধা। যে স্বীধনতার জন্যে আমরা ক্ষুধার্ত তা হল সম্পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। একবার যখন সে ক্ষুধা আমাদের মনে জেগেছে, পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীনতা ছাড়া তা আর নিবৃত্ত হবার নয়।

স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ পেয়ে আমরা হয়তো ভারসাম্য হারাতে পারি, আমাদের মাথাও ঘুরে উঠতে পারে, কিন্তু অচিরে আমরা সম্বিৎ ফিরে পাব অবশ্যই, এবং তখন আমরা দেখব, স্বাধীনতা অন্তহীন ক্ষমতার, অপ্রতিরোধ্য শক্তির উৎস, জন্মলগ্নেই রাহুগ্রস্ত দিল্লী-চুক্তি সম্পাদনের সময়ে যুব সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বরে কেউ কর্ণপাত করেনি। তার ফলে অনেক বন্দির, তার মধ্যে অনেকে বিনা বিচারে আটকও ছিলেন, মুক্তি হল না। এবং গভর্নমেন্ট এবং কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তি হল বটে, দমন নীতির ফলে গরম হয়ে উঠল যুবসম্প্রদায়ের রক্ত, এবং তার ফলে দুঃখজনক সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটতে লাগল।

সরকারের দমননীতিকে কংগ্রেস যদি পরাস্ত করত, কংগ্রেসের অহিংসানীতির যে আবেদন, তা হত অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, স্বীকার করতেই হল, অহিংসার জন্যে আবেদনে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাত্মা গান্ধী দেশে পৌঁছানো মাত্র তাঁকে অনুরোধ করা উচিত, তিনি যেন গভর্নমেন্টের কাছে এই মর্মে একটি চরমপত্র পাঠান যে, বিভিন্ন স্থানে গভর্নমেন্টের দমননীতি যদি প্রত্যাহৃত না হয়, তাঁর পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত থেকে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে। গভর্নমেন্ট যখন কার্যক্ষেত্রে দেখিয়েছে, 'চুক্তি'র অবসান করে দিয়েছে তারা, আমি বুঝতে পারি না, আসল বস্তুটিই যখন নেই, 'চুক্তি'-র ছায়া কংগ্রেস কেন আঁকড়ে ধরে থাকবে।

কংগ্রেসের উচিত সাহসের সঙ্গে নিজের নীতি নির্ধারণ করা, কেননা দেশ প্রতীক্ষা করে আছে এমন নেতৃত্বের জন্যে— যা সাহসী হবে, অবিলম্বে এগিয়ে আসবে। এই সাবধান-বাণী আমি কংগ্রেসের উদ্দেশে উচ্চারণ করছি, গভর্নমেন্টের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়া করবার সময়ে, দেশে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান গোষ্ঠী আছে, কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী সমেত, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করে দেখবেন।

একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা

কলকাতা ত্যাগের পূর্বে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতি, ৩ জানুয়ারি ১৯৩২

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন আরও আলাপ আলোচনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, সেই সময়ে লর্ড
আরউইন আমাদের উপকারই করলেন, অনেক সরল করে দিলেন পরিস্থিতিটা। এবারে আমাদের অবিলম্বে বাস্তব অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে, লড়াই করতে হবে প্রকৃত সমস্যাবলীর সঙ্গে। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের সময়ে আমাদের মনে হয়েছিল তখনও যুদ্ধ বিরতির সময় আসেনি, লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। এখন প্রমাণ হল, আমরাই ঠিক বলেছিলাম।

বঙ্গদেশের কথা বলতে গেলে, আমরা ঠিক যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে। বঙ্গদেশের যা পরিস্থিতি, তা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আবার আরম্ভ করা ছাড়া আর গতি ছিল না। আনন্দের বিষয়, বিলাতি সামগ্রী এবং বিলাতি ব্যবসা-বাণিজ্য বয়কট করার নীতি আবার অবলম্বিত হয়েছে, সর্বভারতীয় অস্ত্র হিসাবে।

এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, আরও একটি বিপদ আছে আমাদরে সামনে। কিছু দিন সংগ্রাম চলবার পর, আবার একটি প্রস্তাব আসতে পারে দিল্লী চুক্তির মতো আর একটি চুক্তির। তার পথ বন্ধ করতে গেলে, আজ থেকেই সাধারণ কর্মীদের মধ্যে তার বিরোধিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে, গড়ে তুলতে হবে। সংগ্রামে যাঁরা যোগ দেবেন, তাঁদের উচিত হবে এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া যে একমাত্র লক্ষ্য তাদের স্বাধীনতা, নতুন নতুন চুক্তি আলাপ আলোচনা বরদাস্ত করবেন না তাঁরা। তা না হলে আবার আমরা বিপদে পড়ব।

আমার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য চিন্তা

এক বন্ধুকে লিখিত পত্র
১৬ এপ্রিল ১৯৩২

বাবার স্বাস্থ্যের উন্নতি অব্যাহত আছে জেনে আমরা অতিশয় স্বস্তি বোধ করছি। আমরা আশা করি গরম পড়া সত্ত্বেও এই উন্নতি বজায় থাকবে।

আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছ। দ্যাখো, সত্য গোপন করে লাভ নেই। তুমি আগেই শুনেছ আমার পাকস্থলী গোলযোগ করছে। সেই জন্যে আমার খাওয়া নির্মমভাবে কমিয়ে দিতে হয়েছে। প্রথমে কয়েক দিন আমি দুধ সাগু খেয়ে থাকলাম। তাতে যখন অরুচি ধরে গেল, হরলিক্স খেতে আরম্ভ করলাম। এখন আবার সুপও খেয়ে দেখছি। খাওয়া-দাওয়ার এই রকম বাঁধাবাঁধির ফলে তীব্র যন্ত্রণাটা কয়েক দিন হয়নি, কিন্তু প্রত্যেক দিন দুটি আহারের মাঝের সময়টাতে আমি একটা জ্বালা অনুভব করি। তাতেই বুঝতে পারি. খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে গণ্ডীর বাইরে যাওয়া চলবে না। অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির যা স্বাভাবিক খাদ্য সেই রকম কিছু যদি আমি, ওই জ্বালা যতক্ষণ আছে, খাই, তা হলে হঠাৎ আরম্ভ হবে তীব্র যন্ত্রণা ও অস্থিরতা।

সম্প্রতি আবার আমার আরেক বন্ধু জুটেছে, সায়েটিকা। প্রথম পনের দিন সে আমাকে শয্যাশায়ী করে রাখল। বারে বারে ম্যাসাজ করার ফলে খানিকটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু উরু

থেকে আরম্ভ করে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের নিম্নাংশে এখনও ব্যথা, এবং গত পনের দিনে কোনও উন্নতি হয়নি। ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে, ম্যাসাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোন কাজ হয়নি। সায়েটিকায় কোনও ঘরোয়া চিকিৎসা যদি তোমার জানা থাকে, আমায় জানাতে পারো।

মেজদা (শ্রীযুত শরৎ বসু) মোটের ওপর ভালই আছেন, শুধু গত মাসে শর্করাটা বেড়েছে। আশা করি, যত দিন তিনি এখানে আছেন, রীতিমত ডায়াবেটিসে দাঁড়িয়ে যাবে না।

নিজের কথা এত বললাম বলে আমি দুঃখিত। এতে তোমার হয়ত মনে হতে পারে আমি খুব দুঃখে আছি। তা মোটেই নয়। সুখ মনের ব্যাপার, দেহের নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমি অনেক সময়ে দেখেছি, শরীর যখন খারাপ থাকে, আমার মস্তিষ্ক আরও পরিষ্কারভাবে, আরও স্বচ্ছভাবে চিন্তা করে। অসুখ যত বাড়ে, দেহটা যেন মনে হয়, খসে পড়ে গেল। এই উপলব্ধি বাড়তে থাকে যে আসলে মানুষ বিদেহী আত্মা, দেহ তার অস্থায়ী বসন মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা, ভবিষ্যতের চিত্র মনের মধ্যে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বিশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনুভব হয়, সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলাম, যে মহৎ চিন্তা আমার জীবনের অনুপ্রেরণা, তার সঙ্গে এক হয়ে গেলাম। নিজে আমি কেবলমাত্র একপ্রস্থ দৈহিক রোগভোগের পরেই, আমার যত দূর সাধ্য আত্মিক অভিজ্ঞতার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে পারি। আমাদের এই মনুষ্যজাতির নিয়তির পিছনে যে এক ঐশী উদ্দেশ্য বিরাজমান তা আমি চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি, এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই, সেওনিতে আমার বাস নিরর্থক হবে না—যেমন আমার ম্যান্ডালেতে থাকাও নিরর্থক হয়নি কোন ক্রমেই। আমার কোনও সন্দেহ নেই, উন্নততর, বিশুদ্ধতর, মহত্তর মানুষ হয়ে আমি এর থেকে বেরিয়ে আসব—এমন একজন মানুষ হয়ে, যে মহৎ সংকল্পের জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিতে প্রস্তুত, নিজের কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করে, আত্মসচেতনতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধনা, আত্মবিসর্জনই সর্বোচ্চ পরীক্ষা, আমরা সেবা করবার যোগ্য কিনা তার। আত্মবিলোপের সাধনা খুব সহজ, আবার খুব কঠিনও বটে। নিজের সঙ্গে এই শেষ সংগ্রামে আমি যদি জয়ী হতে পারি, জীবনযুদ্ধে আমার জয় হবে, এবং তখন আমি ঐশী উদ্দেশ্য সাধনের এক পরিশুদ্ধ যন্ত্রে পরিণত হব। অরবিন্দ একবার বলেছিলেন, "আমাদের হতে হবে ঐশী বিদ্যুতের ডায়নামো, যাতে, আমরা এক-এক জন যখন উঠে দাঁড়াব, আমাদের চারপাশে হাজার হাজার মানুষ আলোয় উদ্ভাসিত হবে।"

আমি অরবিন্দর লেখা বেশি বেশি করে পড়ছি। দেখছি অমি চমৎকার সে-সব লেখা। কয়েকজন বন্ধু, দিলীপ (শ্রীযুত দিলীপকুমার রায়) তাঁদের মধ্যে একজন, তাঁর সর্বশেষ রচনাবলী আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। "আর্য" যখন বেরোত, আমি খুব মন দিয়ে পড়তাম। তখন আমার মনে তার গভীর ছাপ পড়ত। কিন্তু ইদানীং তাঁর লেখা পড়বার সময় আমি পেতাম না। এখন আমার মনে হয়, একবার ছাড়া পেলে পণ্ডিচেরী আমায় যেতেই হবে। সম্প্রতি আমি দিলীপের একখানি চিঠি পেয়েছি। পণ্ডিচেরীর দর্শন সম্পর্কে আমি ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে যে মন্তব্য করেছিলাম, তা পড়ে দিলীপ অন্তরে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন। দিলীপ এবং অনিলবরণ রায়ের মতো পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে আমি খুব খুসি হব।

বন্ধুদেরকে আমার কথা স্মরণ করিয়ে দিও। সবাইকে আমি চিঠি লিখতে পারি না, যদিও লিখতে চাই। সত্যবাবুর (শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী) পরিবারবর্গ কেমন আছেন ?

আশা করি তুমি ভালই আছ। ইতি।

কবিরাজ অনাথনাথ রায়কে লিখিত পত্র
৪ জুন ১৯৩২

আপনি অনুগ্রহ করে এত দূর সেওনিতে এসে আমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। আরও কয়েকজন ডাক্তার, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজ আমার চিকিৎসা করতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। যদিও আমার জন্যে তাঁদের যে চিন্তা-ভাবনা, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ, তাঁদের সে প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার মতো একজন রোগীর চিকিৎসার জন্যে যে সব সুযোগ-সুবিধা চাইবেন, আমার বর্তমান অবস্থায় তার অভাব।

আমার রোগ আপনি যা নির্ণয় করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত। একজন অবিশেষজ্ঞর মতে, আমার রোগের কারণ হয় পাকস্থলীর ঘা, নয়তো পিত্তস্থলী সংক্রান্ত কোনও গোলযোগ। কিন্তু একস্-রে ছাড়া কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছন সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আমি একমাত্র যা করতে পারি তা হল নিয়ম-বাঁধা খাদ্যগ্রহণ এবং পেটের যন্ত্রণার উপশমের জন্যে ওষুধ খাওয়া। কিন্তু খাদ্যের ব্যাপারে অত নিয়ম মানা সত্ত্বেও আমার পেটে জ্বালা হয়। আপনার উপদেশ অনুযায়ী, ডাব কিংবা আখ এখানে যোগাড় করা সম্ভব নয়। আর যে ধরনের খাদ্য প্রয়োজন, একমাত্র বাড়িতেই তা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আপনাদের সকলের যে আমি দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছি, তার জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি কী করতে পারি? যখন এখানে আসি তখন আমার স্বাস্থ্য এত ভাল ছিল যে, আশা করেছিলাম এবারে অন্তত আমার কোনও অসুখ করবে না। গতবার আমি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলাম, কেননা আমার পাকস্থলীর অবস্থা ভাল ছিল। আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থার মধ্যে ভাল শুধু এইটুকুই যে, আমার ফুসফুস ঠিক আছে, এবং এখন পর্যন্ত বিষণ্ণতা কিংবা বিমর্ষতার কোনও চিহ্ন আমার মধ্যে নেই।

সঠিক রোগনির্ণয়ের জন্যে একস্-রে

জব্বলপুর থেকে লিখিত এক বন্ধুর প্রতি পত্র
১০ জুন ১৯৩২

আজ সকালে একস্-রে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর এই পরীক্ষা কাল সকাল পর্যন্ত চলবে, কেননা আজ সকালে আমার 'বিসমাথ সিল' গ্রহণের পর কয়েকটি ছবি তুলতে হবে। পরীক্ষা সম্ভবত চলবে সোমবার পর্যন্ত। আমি আশা করি, তাঁরা রোগের মূলে পৌঁছবেন এবং সঠিক রোগনির্ণয় করবেন।

মাঝে মাঝে এখনও আমার অল্প টেম্পারেচার হচ্ছে। আজ সকালে ওজন নেওয়ার সময়ে আমার ওজন উঠেছিল ১৪১ পাউন্ড। ভর্তির সময় ওজন ছিল ১৮২ পাউন্ড। তার মানে, ৪১ পাউন্ড কমেছে। সায়েটিকার ব্যথা এখনও আছে, তার সঙ্গে জুটেছে আরেক বন্ধু, অর্শ। মেজদাকে ডায়াবেটিসের জন্যে নিয়মিত পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি, আগামী সপ্তাহে কোন এক সময়ে পরীক্ষার ফল জানা যাবে। এর পরে আমরা কোথায় যাব, না যাব, সবই আমাদের অজানা। আমাদের পরীক্ষা চলছে ব্রিটিশ স্টেশন হাসপাতালে। তিনজন ডাক্তারের একটি মেডিক্যাল বোর্ড আছে।

শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত

মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি থেকে লেখা বন্ধুর প্রতি পত্র
৩১ জুলাই ১৯৩২

এখানে আসবার আগে আমি শুনেছিলাম পেনিটেনশিয়ারিটি সম্ভবত একটি 'বরস্ট্যাল' প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দেখলাম সে খবর ভুল। এটি আমাদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মতো। জব্বলপুরের জেল সুপারিন্টেডেন্ট, আমার স্থানান্তরের আদেশ যাঁর কাছে এসেছিল, তাঁর কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, মাদ্রাজে পৌঁছে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে আমি দেখলাম পেনিটেনশিয়ারির সুপারিন্টেডেন্টের কাছে আমাকে হাসপাতালে পাঠাবার বিষয়ে কোনও আদেশ আসেনি। তার ফলে আমার নিয়মমাফিক খাবারের ব্যবস্থা করার সমস্যা কঠিন হয়েছে।

জব্বলপুর থেকে চলে আসবার আগে আমি আমার নিজের ডাক্তার স্যর নীলরতন সরকার, ডাঃ বি. সি. রায় এবং আমার ভাই ডাঃ সুনীল বোসকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করানোর জন্যে গভর্নমেন্টকে লিখেছিলাম। আমি আবার সে কথা লিখব, যাতে গভর্নমেন্ট মনে না করে আমাকে মাদ্রাজে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা এমনিতেই চুকে গেছে।

এখানে পৌঁছানোর পর এখনও আমার টেম্পারেচার হচ্ছে। আমার শারীরিক অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। আমি শুনছি অক্টোবরের আগে বৃষ্টি শুরু হবে না।

ফুসফুসের রোগ ধরা পড়েছে

মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি থেকে কলকাতার এক বন্ধুকে লেখা চিঠি
১৮ অগাস্ট ১৯৩২

আমি মাদ্রাজ গভর্নমেন্টকে, মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্টকে এবং ভারত গভর্নমেন্টকে লিখেছি, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হোক, এবং মনে করিয়ে দিয়েছি, তা না হলে আমাকে যে মাদ্রাজে পাঠানো হল, তার কোন অর্থ হবে না। এটা ত মানতেই হবে, পুরো দস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসপাতালে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা যদি না করা হয়, তা হলে তার কোন মূল্য থাকে না। হাসপাতালের ওপর আমি যে এত জোর দিচ্ছি, তার কারণ গভর্নমেন্টের ভাব-গতিক দেখে মনে হয় না বাড়িতে থেকে নিজের ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবার অনুমতি তারা আমাকে দেবে। আর, গভর্নমেন্টের কাছে কোনও অনুগ্রহ ভিক্ষা করবার লোক আমি নই। আমি শুধু সেইটুকুই চাই, প্রকৃতই আমার বিবেচনায়, প্রথমত দেশের নাগরিক হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত রাজবন্দী হিসাবে আমার প্রাপ্য।

আমার নিজের ডাক্তারদের দিয়ে আমার চিকিৎসা করাবার জন্যেও আমি দাবি করছি, এবং মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট ও ভারত গভর্নমেন্টকে তা নিয়ে লিখেছি। জব্বলপুরে যখন ছিলাম, মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্টকেও সে কথা লিখেছিলাম।

পরীক্ষা কার্যত সম্পূর্ণ হয়েছে। একস্-রে পরীক্ষায় অনেক সময় লেগেছে। এ পর্যন্ত আমাকে পরীক্ষায় করেছেন লেঃ কর্নেল স্কিনার এবং এখানকার সরকারি হাসপাতালের সিনিয়র চিকিৎসক ডাঃ গুরুস্বামী মুদালিয়র। এখন পর্যন্ত রক্তের শর্করা পরীক্ষা করা প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়নি, কিন্তু Von Pirquet's Test করা হয়েছিল। ডাক্তারদের কথা শুনে যত দূর বুঝেছি, পিত্তস্থলীতে তাঁরা তেমন কোনও গুরুতর গোলযোগ পাননি। কিন্তু ফুসফুসের অবস্থা ভাল নয়, পরিষ্কারও নয় (ডাক্তারি পরিভাষাটা আমার মনে

পড়ছে না)। সেই কারণেই Von Pirquet's Test প্রয়োজন হয়েছিল। সে পরীক্ষার ফল পজিটিভস-এর দিকেই হয়েছে।

এই-সব পরীক্ষা থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে, তা হল, আমি যা ভেবেছিলাম অবস্থাটা তার চেয়ে খারাপ। সেওনি আর জব্বলপুর, দু জায়গাতেই মনে করা হয়েছিল পিত্তস্থলীটিই গোলযোগের মূলে। কিন্তু রোগের মূল, মনে হয়, ফুসফুসে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি ত ডাক্তার নই, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ফুসফুসেই ব্যাধি ধরে নিলে, উপসর্গ যে-সব দেখা যাচ্ছে, তার ব্যাখ্যা কী করে হয় ? পেটের ব্যথা, সায়েটিকা, অর্শ ইত্যাদি উপসর্গ মনে হচ্ছে তার ব্যাখ্যা হতে পারে, পিত্তস্থলীতেই গোলযোগ, এইরকম কোন ধারণা থেকে। যাই হোক, মাদ্রাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এইটুকুই আমার লাভ হয়েছে যে, সেওনি এবং জব্বলপুরে গোলযোগের যে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি চোখ এড়িয়েছিল, সেটি এখানে ধরা পড়েছে।

আমার শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয়নি। দৈনিক টেম্পারেচার লেগেই আছে, আর আমার পুরনো বন্ধুরা, যথা শরীরের ভিতরে যন্ত্রণা, সায়েটিকা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, বদহজম, অনিদ্রা সবাই বহাল আছেন। মাদ্রাজে এখনও বেশ গরম।

মেজদাদার খবরের জন্যেও আমি ব্যস্ত। আমার চিকিৎসা নিয়ে গতকাল মাদ্রাজ কাউন্সিলে কথা উঠেছিল, খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছ। ল মেম্বার স্যর কৃষ্ণন নায়ার সহানুভূতিসূচক উত্তর দিয়েছিলেন (যদিও তাঁর বক্তব্যে কিছু কিছু ভুল ছিল) এবং বলেছিলেন যে হাসপাতালে আমার চিকিৎসার বিষয়ে ভারত গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁরা পত্র-বিনিময় করছেন।

আমার ব্যাপার নিয়ে সমস্ত তথ্য দিয়ে আমি ল মেম্বারকে (তিনি জেলখানারও দায়িত্বে আছেন) চিঠি দিয়েছি। জানিয়েছি, জব্বলপুরের মেডিক্যাল বোর্ড হাসপাতালে আমার চিকিৎসার সুপারিশ করেছেন ; ডাঃ সুনীল বসুকে আমাকে পরীক্ষা করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি (এই কারণ দেখিয়ে যে, হাসপাতালে আমার পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করছেন) ; আমার স্থানান্তরের আদেশে বলা হয়েছিল যে মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারিতে আমাকে পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে আমার পরীক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্যে। ইতিমধ্যে প্রতিবাদস্বরূপ হাসপাতালে যাওয়া আমি বন্ধ করেছিলাম। কিন্তু ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস হাসপাতাল পরিদর্শনে এলে আমাকে মৌখিক আশ্বাস দেন যে পরীক্ষার পর আমায় হাসপাতালে ভর্তির প্রশ্ন বিবেচনা করা হবে। তারপরে আমি পরীক্ষার জন্য আবার হাসপাতালে যেতে শুরু করি।

আশা করি ওখানে সবাই ভাল আছে।

ডাঃ আলমের আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা

বেগম আলমকে লিখিত পত্র
২ নভেম্বর ১৯৩২

প্রিয় মিসেস আলম,

আমি যখন মাদ্রাজে ছিলাম ডাঃ আলমের চিঠি পাই এবং অবিলম্বে তার উত্তর দিয়েছিলাম। আশা করি সে চিঠি যথা সময়ে তাঁর হাতে পৌঁছেছে। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখানে এসে সে খবর পাওয়ায় আমি এতদূর মর্মাহত হয়েছি যে বলার নয়। আমার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, এবং শুধু দিবারাত্র প্রার্থনাই করতে পারি তাঁর জন্য। ইচ্ছাশক্তি বলে একটি

বস্তু আছে, তা আমি বিশ্বাস করি, এবং তাঁর অসংখ্য বন্ধু ও দেশবাসীর চিন্তা ও প্রার্থনা এখনও হয়ত তাঁকে সারিয়ে তুলতে সক্ষম হবে। সেটাই আমার আন্তরিক ঐকান্তিক আশা।

লাহোরে আপনার গৃহে আমরা আনন্দে যে দিনগুলি কাটিয়েছি, তার কথা আমার মনে পড়ছে।

ডাঃ সাহেবের ভাল খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমি নিজের কথা কিছু লিখব না।

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ডাঃ সাহেব ও আপনার প্রতি শুভেচ্ছা সহকারে ইতি।

আপনাদের
সুভাষচন্দ্র বসু

পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় তিক্ত-বিরক্ত

মিঃ সত্যমূর্তিকে লিখিত পত্র
১৯ নভেম্বর ১৯৩২

আপনার ৩১ অকটোবর-এর চিঠি পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। খবরের কাগজ থেকে আমি আপনার গতিবিধির এবং স্বাস্থ্যের খবর রাখছি, এবং কয়েকদিন আগে খবরের কাগজ পড়ে আপনার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার কথা জেনে আনন্দিত হয়েছি। আপনি যে বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে বাইরে যাবেন মনস্থ করেছেন, তা ঠিকই হয়েছে। কিন্তু আমি আশা করি, আপনার ডাক্তারেরা যা ভাবছেন, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আপনি সেরে উঠবেন। আপনার বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময়টা আপনি কি ভাবে কাটাবেন মনে করছেন ?

আমার স্বাস্থ্যের উন্নতির খবর ঠিক নয়, একটু বেশি আগেভাগে রটে গেছে খবরটা। প্রকৃত যা ঘটনা, তা হল, আবহাওয়া এবং পরিবেশের পরিবর্তনের পর আমি মনে একটু ফূর্তি বোধ করছি। গরমটা এখানে মাদ্রাজের চেয়ে একটু কম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় আমার গা-গরম হওয়াটা চলছেই। এখন সেটা থাকছে ৯৯.২ এবং ৯৯.৪-এর মধ্যে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য সংক্রান্ত অসুবিধাটা এখনও অতিশয় অস্বস্তিজনক হয়ে আছে, এবং হজম ও ক্ষিদে এখনও কম হচ্ছে। আমার ওজনও এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ভালো নয়। ভর্তি হওয়ার সময়ে ওজন যা ছিল চার সপ্তাহ পরে তাই আছে। আমি আশা করেছিলাম এখানে থাকতে থাকতে আমি ছাড়া পাব, কিন্তু তা হল না। স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার অধিকার আমি এখনও পাইনি, ১৯৩৩-এর তিন আইন অনুযায়ী এখনও নিষেধ-বিধির অধীনে আছি। স্যানাটোরিয়াম ১৫ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ১৯৩৩-এর মার্চের আগে খুলবে না। একজন বন্ধু আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন আমাকে দেরাদুন পাঠানো হতে পারে, কিন্তু সরকারিভাবে কোনও খবর এখনও পাইনি।

আরেকটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আপনি জানেন, ডাক্তারেরা সবাই আশঙ্কা করছিলেন আমার দুটি ফুসফুসেই টি.বি.-র আক্রমণ হয়েছে। তার ওপরে, ডাক্তার স্কিনার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, আমার অন্ত্রের গ্ল্যান্ডে টি.বি. আছে। তারপরে মেডিক্যাল বোর্ডও সন্দেহ করে ফুসফুসে গোলযোগ আছে। পেটে কিছু হয়েছে বলেও সন্দেহ করেন তাঁরা, কিন্তু ঠিক কী হয়েছে সে বিষয়ে তাঁরা মনস্থির করতে পারেননি এখন পর্যন্ত।

কিন্তু যে চিকিৎসা আমার চলছে, সেটা হল, টি.বি. রোগের সাধারণত যে চিকিৎসা হয়ে থাকে, তাই। এখানে এসে পৌঁছানো মাত্র আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়, এবং এখনও সেই 'বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম'-এর চিকিৎসাই চলছে। আমাকে দেওয়া হচ্ছে "কলয়ড্যাল ক্যালসিয়াম" ইনজেকশন এবং আরও কিছু কিছু ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, যেগুলো আমি শুনেছি সাধারণত অন্ত্রের টি.বি.-র ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। কিন্তু এ অবস্থায় আমি খুসি নই।

আমার অসুখটা কী আমি ঠিক করে জানতে চাই। পরীক্ষামূলক চিকিৎসায় আমার বিরক্তি

ধরে গেছে। ডাক্তারেরা যদি রোগ নির্ণয় করতে না-ই পারেন, আমি চাই সে-কথা আমাকে খোলাখুলি জানানো হোক। সেই জন্যে আমি গভর্নমেন্টকে লিখেছি, আরেকবার আমার নিজের ডাক্তারদের দিয়ে পরীক্ষা করানোর অনুমতি আমাকে দেওয়া হক।

এই স্যানাটোরিয়াম ফুসফুসের রোগীদের জন্যে। আমার ফুসফুসে যদি কিছু না হয়ে থাকে এখানে আমার থাকবার কোনও কারণ নেই। আর, আমার যদি আন্ত্রিক টি.বি.-র কেস হয়, তা হলে কী করা হবে? ভারতে এমন কোনও স্যানাটোরিয়ামের কথা আমি জানি না যেখানে আন্ত্রিক ক্ষয়রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। যাই হোক, দেখা যাক, কী হয়।

মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি লিখবেন। আমিও অবশ্য, বর্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব উত্তর দেব।

আপনার দ্রুত নিরাময় প্রার্থনা করি। আন্তরিক শুভেচ্ছা সহকারে, ইতি।

আপনার
সুভাষচন্দ্র বসু

তাঁর ওপরে পরীক্ষায় ক্লান্ত

যুক্তপ্রদেশের ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়াম থেকে মাদ্রাজে এক বন্ধুর প্রতি পত্র
১৯ নভেম্বর ১৯৩২

মাদ্রাজের চিকিৎসকেরা আমাকে পরীক্ষার এবং আমার রোগ-নির্ণয়ের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্যে তাঁদের প্রতি আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ, যদিও তার ফল আমার এবং অন্য সকলের আশঙ্কার কারণ হয়েছে। কিন্তু অনেক ব্যাধির ক্ষেত্রে শীঘ্র এবং সঠিক রোগ নির্ণয়ই রোগ নিরাময়ের অর্ধেক।

ভোওয়ালি মোটের ওপর বেশ ভাল জায়গা এবং বছরের মধ্যে এই ঋতুটিই শ্রেষ্ঠ। প্রাচীর ঘেরা জেল-খানা থেকে পাহাড়ের ওপরে এই স্যানাটোরিয়ামে আসাতে আমার পরিবেশের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাতে আমি মানসিকভাবে আরাম বোধ করছি। আমি নিজে পাহাড়ের খুব ভক্ত। পাহাড়ের একটা মৌন গৌরব ও মর্যাদা আছে যাতে মনটাকে পার্থিব সব কিছুর ঊর্ধ্বে তুলে দেয়, তখন মনে হয় মানুষ মূলত আত্মা-প্রধান জীব। যুগে যুগে আমাদের কত কাব্য, দর্শন, রোম্যান্স সংশ্লিষ্ট হয়েছে পাহাড়-পর্বত, বিশেষত হিমালয়ের সঙ্গে।

দুঃখের বিষয়, দেহকেও বলে এক তাল মাটি, কাজেই পরিবেশের পরিবর্তনে মন যত তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়, দেহ তেমন দেয় না। দৈহিক উন্নতির কথা বলতে গেলে, আমি যতটা আশা করেছিলাম, তা হয়নি। গায়ে জ্বরটা লেগেই থাকছে, কিছুদিন থেকে সেটা ৯৯.২ এবং ৯৯.৪-এর মধ্যে ওঠা-নামা করছে। কোষ্ঠ-জনিত সমস্যাটা বেশ অস্বস্তির কারণ হচ্ছে, এবং আগেকার মতোই, খাওয়ার পর সেটা বেড়ে যাচ্ছে। হজম এবং ক্ষুধা এখনও ভাল হচ্ছে না। ওজন মেপে যা দেখা যাচ্ছে, সেটাও সন্তোষজনক নয়। ভর্তির সময় ওজন যা ছিল চার সপ্তাহ পরে এখনও তাই আছে।

আমি আশা করেছিলাম এখানে ভর্তির পর আমার রাজ সরকারের হাতে বন্দীদশা ঘুচবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল আছে। ১৫ ডিসেম্বর স্যানাটোরিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে, তার পর আমার আবার ফুটবলের দশা হবে।

আরেকটা ব্যাপারও একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। তুমি জান মাদ্রাজে ডাক্তারেরা সবাই আমায় পরীক্ষা করে একমত হয়েছিলেন যে আমার দুটো ফুসফুসেই টি.বি.-র সংক্রমণ

হয়েছে। তা ছাড়া লেঃ কর্নেল স্কিনার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, অন্ত্রে টি.বি. আক্রান্ত গ্ল্যান্ড আছে। পরে মেডিক্যাল বোর্ড এই অভিমত দেয় যে আমার পেটেও কিছু ব্যাধি জন্মেছে। কিন্তু ব্যাধিটা যে কী সেটা ঠিক করতে পারছিলেন না, এবং অনুমান করছিলেন অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে ওটার উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু, আমি যা বুঝেছি, এখানকার ডাক্তারেরা ফুসফুসে কোনও সক্রিয় রোগ খুঁজে পাননি। পেটে কী হয়েছে সে বিষয়েও তাঁরা মনস্থির করতে পারছেন না। কিন্তু এখানে যে চিকিৎসা আমার চলছে সেটা সাধারণত টি.বি.-র ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। ১১ অক্টোবর আমি এখানে পৌঁছানো মাত্র আমাকে আদেশ দেওয়া হল বিছানায় শুয়ে বিশ্রামের এবং এখনও আমি শয্যাশায়ী রোগী। সব রোগীর বেলাতেই, বিশেষ করে শয্যাশায়ী রোগীদের বেলায়, এখানে নিয়ম-কানুন খুব কড়া, এবং হওয়া উচিতও তাই। আমাকে কলয়ড্যাল ক্যালসিয়াম ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। অন্য ওষুধও আমাকে দিচ্ছে। সে-সব, আমি শুনেছি আন্ত্রিক টি.বি.-র ক্ষেত্রে দেওয়া হয়।

রোগ নির্ণয় যে কঠিন হচ্ছে, সে জন্যে কয়েক দিন আগে আমি আবার গভর্নমেন্টকে লিখেছিলাম আমার নিজের ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বি সি রায় এবং ডাঃ সুনীল রায়কে দিয়ে আমার চিকিৎসা করানোর অনুমতি দেওয়া হক। সঠিক রোগ নির্ণয় ছাড়াই চিকিৎসা আমার পছন্দ নয় এবং আমার ওপর যে পরীক্ষা চলছে তাতে আমি একেবারে তিক্ত-বিরক্ত। আমার রোগটা কী আমি সঠিক জানতে চাই এবং ডাক্তারেরা যদি রোগ নির্ণয় করতে না পারেন, সে-কথা তাঁরা খোলাখুলি বলে দিন। গভর্নমেন্ট কী উত্তর দেয় দেখা যাক। এক বন্ধু চিঠিতে আমায় লিখেছেন স্যানাটোরিয়াম বন্ধ হয়ে গেলে আমাকে দেরাদুন পাঠানো হতে পারে, যদিও সরকারিভাবে কোনও খবর আমি এখনও পাইনি।

আমার ফুসফুসে যদি টি.বি. না হয়ে থাকে, এখানে আমার থাকবার কোনও কারণ নেই। এই স্যানাটোরিয়াম ফুসফুসের ব্যাধিতে যারা আক্রান্ত তাদের জন্যে, এবং ভারতে এমন কোনও স্যানাটোরিয়ামের কথা আমার জানা নেই যেখানে অন্ত্রের টি.বি.-র চিকিৎসা এবং নিরাময়ের জন্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। শেষ পর্যন্ত যদি ডাক্তারেরা স্থির করেন আমার অন্ত্রে টি.বি. হয়েছে (ফুসফুসের অসুখ তার সঙ্গে থাক বা না থাক), তখন অবস্থাটা গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, এখন যা অবস্থা, এখানকার ডাক্তারদের অভিমত স্বীকার করতে আমি রাজি নই, যতক্ষণ না যে-সব ডাক্তারদের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁরা সে মত সমর্থন করছেন।

চিকিৎসা চলছে, উন্নতি নেই

বিমলকান্তি ঘোষকে লেখা চিঠি
২২ নভেম্বর ১৯৩২

প্রিয় বিমলবাবু,

আপনার এ মাসের ৮ তারিখের লেখা স্নেহপূর্ণ পত্র পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বিশেষ খুসি হয়েছি এই কারণে যে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে খানিকটা স্বান্তনা আমি পৌঁছে দিতে পেরেছি। আপনার চিঠি পড়ে পুরোন দিনের কথা মনে পড়ল। আপনি জানেন, মতিবাবু (তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি) সব সময়ে বলতেন "পত্রিকা" একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আমাদের ছেড়ে চলে চলে যাবার সময়ে তিনি তার দায়িত্ব আপনার পরলোকগত পিতাকে দিয়ে যান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আপনার বাবা এ কথা ভেবে অবশ্যই খুব সন্তোষ বোধ করে থাকবেন যে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি যেভাবে পালন করেছেন, তা

তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রত্যাশার অতীত। আমরা যে জীবনধারণ করি, তা ত শুধু কোন রকমে টিকে থাকবার জন্যে নয়, কর্তব্য পালনের জন্য, কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সে কর্তব্য যখন সম্পন্ন হল, পূর্ণ হল জীবনধারণের লক্ষ্য। সে জন্যে, আমার কোনও সন্দেহ নেই, আপনার পিতা, যাঁর বিয়োগে আমরা ব্যথিত, সুখের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

আমার স্বাস্থ্যের বিষয়ে আগে যা লিখেছি তার পরে আর নতুন কিছু লিখবার নেই। টেম্পারেচার এখনও হচ্ছে ৯৯.৪ পর্যন্ত, আবার কখনো তার ওপরে উঠছে। খাওয়ার পর পেটে যে ব্যথাটা হয়, সেটাও সারতে চাইছে না। ওজনেও কিছুমাত্র উন্নতি হয়নি। এঁরা বলছেন, টি.বি.-তে ওজনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গতবার যেমন লিখেছিলাম, এখানকার ডাক্তারদের মতে ব্যাধিটা ফুসফুসের চেয়ে উদরেই বেশি। সুপারিন্টেডেন্ট এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমার অসুখটা অন্ত্রের ক্ষয়রোগ। অবশ্য তিনি ফুসফুস এবং অন্ত্র দুইয়েরই টি.বি.-র চিকিৎসা করছেন। একটা করে কলয়ড্যাল ক্যালসিয়াম আর একটা করে সোডিয়াম মরুয়েট-এর (Colloidal Calcium and Sodium Morrhuate) ইনজেকশন চলছে পালাক্রমে। ওষুধ হিসাবে আমি খাচ্ছি কডলিভার অয়েল, টমেটো জুস দিয়ে, অ্যানজিয়ার্স ইমালশন এবং আরও কিছু কিছু ওষুধ হজমে সাহায্য করবার জন্য আর পেটের যন্ত্রণার উপশমের জন্যে। এত সব করেও, আমার হজম এবং ক্ষিদের অবস্থা এখনও খুবই খারাপ। একজন ডাক্তার বন্ধু পরামর্শ দিয়েছেন অপারেশনের পর পেটে অক্সিজেন দেওয়ার। কিন্তু, যদিও টি.বি. রোগের সেটি একটি স্বীকৃত চিকিৎসা (ফুসফুসের টি.বি.-তে কৃত্রিম নিউমো-থোরাক্স চিকিৎসার মত), এখানে সে চিকিৎসা করে দেখা হয়নি, কেননা এই স্যানাটোরিয়াম ফুসফুসের টি.বি.-র চিকিৎসার জন্য। তা ছাড়া, একমাত্র যাঁদের এই চিকিৎসা করবার যথেষ্ট অভ্যাস আছে, তাঁরা ছাড়া অন্য কারো হাতে আমার এই চিকিৎসা আমি করাব না। আসল মুস্কিল হচ্ছে, অন্ত্রের টি.বি.-র চিকিৎসার জন্যে কোন স্যানাটোরিয়াম ভারতে নেই।

এখন পর্যন্ত যা ব্যবস্থা, তাতে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি এখানে থাকব। একজন বন্ধু চিঠিতে আমাকে লিখেছেন, এর পরে আমাকে এরা দেরাদুন পাঠাতে পারে। কিন্তু সরকারি সূত্র থেকে আমি সে-রকম কোনও খবর পাইনি।

এখানকার পারিপার্শ্বিক অতি চমৎকার এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি খুসি আছি, ফূর্তিতে আছি।

সকলের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহকারে

এখনও রোগে শয্যাশায়ী

ভাওয়ালি থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে পত্র
২৪ নভেম্বর ১৯৩২

এত দিনে আপনি জানতে পেরেছেন, গত মাসের মাঝামাঝি আমি এখানে এসেছি। এখানে আমার ওপর যে কড়াকড়ি আছে, সে-সব সত্ত্বেও, প্রাচীর-ঘেরা জেলখানা থেকে এই স্যানাটোরিয়ামে আসার যে পরিবর্তন সেটা খুবই ভাল হয়েছে। পাহাড়ের দৃশ্য মনের পক্ষে খুব আরামদায়ক। হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত আমাদের যত পবিত্র স্মৃতি, সে-সব জাগিয়ে তোলে সে দৃশ্য প্রকৃতই, পর্বতের এমন একটা মহান গাম্ভীর্য আছে যা মনকে যা কিছু ক্ষুদ্র এবং হীন সে-সব থেকে আকাশের দিকে তুলে ধরে, এক উচ্চতর, মহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করতে দেয়। আমি শুনেছি এখান থেকে আর ৫০০ ফুট ওপরে উঠলে চির-তুষারের

রাজকীয় দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আমার বড় ইচ্ছে করে, ওপরে উঠে সেই রৌপ্যধবল মহান দৃশ্য অবলোকন করি।

এখানে পৌঁছন মাত্র আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সব টি.বি. রোগীদের জন্যেই সাধারণভাবে সাধারণত এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে থাকে, এবং যতদিন টেম্পারেচার থাকে, বিছানা থেকে তাদের উঠতে দেওয়া হয় না। প্রথমে শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম থেকে আরম্ভ করে শেষে একনাগাড়ে পাঁচ-ছ মাইল হাঁটা পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার একটা পদ্ধতি আছে। যারা হেঁটে বেড়ায় সে-রকম কিছু কিছু রোগীকে দেখে এত স্বাস্থ্যবান মনে হয় যে তারা যে টি.বি. রোগী তা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। তবু কিন্তু, তাদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়, এবং অসাবধান হলেই তাদের অবস্থা যে কোনও সময় খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এখানকার ডাক্তারি নিয়ম-কানুন খুব কড়া, এবং সে-রকমই হওয়া উচিত। সারা দিনের রুটিন পরিষ্কার করে ছকে দেওয়া থাকে, এবং তা মানতে হয়। ভোর ছটায় বিউগল বাজিয়ে দিনের শুরু করা হয়, আর রাত নটায় বিউগল বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় তার অবসান। তখন শুতে যেতে হয়। রোগীর অবস্থার যেমন যেমন উন্নতি হয়, নিয়মিত হারে বৃদ্ধি করা হয় তার খেলাধূলা ইত্যাদি এবং ব্যায়ামের মাত্রা। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ে তাকে বিছানায় ফিরে যেতে হয়। স্যানাটোরিয়ামটা একটা কলোনির মত, পাহাড়ের গায়ে সর্বত্র কুটীর। বছরে দুবার এখানে স্পোর্টস হয়, তাতে যোগ দেন, যে-সব রোগী হেঁটে বেড়াতে পারেন, তারা ছাড়াও কর্মীরা এবং রোগীদের আত্মীয়েরা। স্যানাটোরিয়ামের একটি একস-রে যন্ত্র এবং আধুনিক ল্যাবরেটরি আছে।

এখন পর্যন্ত আমি শয্যাশায়ী রোগী, এবং দৈহিকভাবে জেলখানার কয়েদীর মতই আমার অবস্থা, তবু সুন্দর পারিপার্শ্বিকের দরুন মন খুসি যাকে, মনে ফুর্তি থাকে। স্যানাটোরিয়াম ১৫ তারিখ নাগাদ যেহেতু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় না এখানে থাকার কালে আমি 'হেঁটে-বেড়ান' রোগী হতে পারব।

বঙ্গবাসীর প্রতি বিদায়-বাণী

এস. এস. গঙ্গে থেকে পাঠানো বাণী

"এক বছরের অধিক আমি আমার নিজের প্রদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে আছি। যে অবস্থার মধ্যে আমি বন্দি সেটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ার দরুন এই সময়ে আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। আমার অবস্থা যত খারাপ হয়, আমাকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হতে থাকে—কিন্তু যে-সব হাসপাতাল এবং চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, ইচ্ছে করে তাদের কাছ থেকে আমাকে দূরে রাখা হয়। এমনকি বঙ্গদেশের সব জেলখানা, আমার হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে যারা এত সাদরে বরণ করে থাকে, তারাও আমার মুখের ওপর তাদের দরজা বন্ধ করে দিল।

"আমার শারীরিক পীড়ার সঙ্গে যুক্ত হল মানসিক যন্ত্রণা। বঙ্গদেশের বাইরে বন্দি হয়ে থাকার সময়ে ক্রমবর্ধমান বেদনা এবং অসহায়তার বোধ নিয়ে আমি দেখতাম কী নিপীড়ন চলছে আমার প্রদেশে। সেই অবস্থায় আমি কেবল আমার নির্জন সেল-এ বসে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে নীরবে প্রার্থনাই করতে পারতাম, আমার স্বদেশবাসীকে যেন তিনি শক্তি দেন, এক নতুন বাঙলা যেন জন্মগ্রহণ করে।

"জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ওই দীর্ঘ এবং অন্ধকার প্রহরগুলিতে আমি আশ্রয় খুঁজতাম ধ্যানের মধ্যে। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠত, ভারতের যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন,

পূজা করেছেন বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং দেশবন্ধু পর্যন্ত। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে আমাকে সান্ত্বনা দিত, সাহস দিত, অনুপ্রেরণা দিত। আমি উপলব্ধি করতাম—আগে কোনদিন তেমন ভাবে উপলব্ধি করিনি,—যে সেই মূর্তি, ভারতমাতা যা হবেন, সেইটেই চূড়ান্ত সত্য, বর্তমান মুহূর্তের সব ত্রুটি, সব অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কোনও পার্থিব শক্তির ক্ষমতা ছিল না আমার সেই স্বপ্নে দেখা মূর্তি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। প্রতিদিন আমি পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছি তার বেদীমূলে।

"একটি স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমাকে এনে দিয়েছে জীবনের একটি উদ্দেশ্য। সে এক অখণ্ড বঙ্গের স্বপ্ন, যে বঙ্গ ভারতের এবং বিশ্বমানবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, যে বঙ্গ সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, যে বঙ্গ মুলসমান, হিন্দু, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ সকলেরই মাতৃভূমি—যে বঙ্গ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, আমার জীবনের প্রতিদিন যাকে আরাধনা করি আমি, যার সেবা করার চেষ্টা করি।

"এই স্বপ্নের যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা, বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়া, আমার জীবনের একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সব কিছু দিয়ে এর সাধনা করতে হবে, যদি সিদ্ধিলাভ করতে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন কোনও ত্যাগ নেই যা করা চলে না, এমন কোনও কষ্ট নেই যা স্বীকার করা চলে না। বন্ধুগণ, আপনারা কি সেই উচ্চে উঠবেন না, যেখানে আমাদের সামনে বিরাজ করবে একটিমাত্র সত্যবস্তু, এক মহান, অখণ্ড বঙ্গদেশ। আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা কী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আমাদের জন্য, স্মরণ করুন। ভুলবেন না, তাঁদের স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আপনারা—আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা আপনারা। আপনারা যদি চিন্তায় এবং কাজে বড় হন, তবেই আপনারা আপনাদের দেশকে বড় করতে পারবেন। তাই, আমি যতদূর আমার সাধ্য, অন্তরের থেকে বলছি, 'ভুলে যান আপনাদের ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদ, বিসর্জন দিন যত ব্যক্তিগত মতভেদ, চেষ্টা করুন, বাঙলা যাতে এক হয়, মহান হয়, যাতে বাঙলার গৌরবের মধ্যেই খুঁজে পাই আমাদের সর্বোচ্চ সুখ এবং গৌরব। যত যাই বলুন, বাঙলা বাঁচলে কে মরবে, বাঙলা মরলে কে বাঁচবে ?' "

এস. এস. গঙ্গে

সুভাষচন্দ্র বসু

২.৩.৩৩

রাজকীয় দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। আমার বড় ইচ্ছে করে, ওপরে উঠে সেই রৌপ্যধবল মহান দৃশ্য অবলোকন করি।

এখানে পৌঁছন মাত্র আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। সব টি.বি. রোগীদের জন্যেই সাধারণভাবে সাধারণত এই ব্যবস্থা দেওয়া হয়ে থাকে, এবং যতদিন টেম্পারেচার থাকে, বিছানা থেকে তাদের উঠতে দেওয়া হয় না। প্রথমে শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম থেকে আরম্ভ করে শেষে একনাগাড়ে পাঁচ-ছ মাইল হাঁটা পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে ব্যায়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার একটা পদ্ধতি আছে। যারা হেঁটে বেড়ায় সে-রকম কিছু কিছু রোগীকে দেখে এত স্বাস্থ্যবান মনে হয় যে তারা যে টি.বি. রোগী তা কেউ কল্পনাই করতে পারবে না। তবু কিন্তু, তাদের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়, এবং অসাবধান হলেই তাদের অবস্থা যে কোনও সময় খারাপ হয়ে যেতে পারে।

এখানকার ডাক্তারি নিয়ম-কানুন খুব কড়া, এবং সে-রকমই হওয়া উচিত। সারা দিনের রুটিন পরিষ্কার করে ছকে দেওয়া থাকে, এবং তা মানতে হয়। ভোর ছটায় বিউগল বাজিয়ে দিনের শুরু করা হয়, আর রাত নটায় বিউগল বাজিয়ে ঘোষণা করা হয় তার অবসান। তখন শুতে যেতে হয়। রোগীর অবস্থার যেমন যেমন উন্নতি হয়, নিয়মিত হারে বৃদ্ধি করা হয় তার খেলাধূলা ইত্যাদি এবং ব্যায়ামের মাত্রা। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে পড়ে তাকে বিছানায় ফিরে যেতে হয়। স্যানাটোরিয়ামটা একটা কলোনির মত, পাহাড়ের গায়ে সর্বত্র কুটীর। বছরে দুবার এখানে স্পোর্টস হয়, তাতে যোগ দেন, যে-সব রোগী হেঁটে বেড়াতে পারেন, তারা ছাড়াও কর্মীরা এবং রোগীদের আত্মীয়েরা। স্যানাটোরিয়ামের একটি একস-রে যন্ত্র এবং আধুনিক ল্যাবরেটরি আছে।

এখন পর্যন্ত আমি শয্যাশায়ী রোগী, এবং দৈহিকভাবে জেলখানার কয়েদীর মতই আমার অবস্থা, তবু সুন্দর পারিপার্শ্বিকের দরুন মন খুসি যাকে, মনে ফুর্তি থাকে। স্যানাটোরিয়াম ১৫ তারিখ নাগাদ যেহেতু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় না এখানে থাকার কালে আমি 'হেঁটে-বেড়ান' রোগী হতে পারব।

বঙ্গবাসীর প্রতি বিদায়-বাণী

এস. এস. গঙ্গে থেকে পাঠানো বাণী

"এক বছরের অধিক আমি আমার নিজের প্রদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে আছি। যে অবস্থার মধ্যে আমি বন্দি সেটা অস্বাস্থ্যকর হওয়ার দরুন এই সময়ে আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। আমার অবস্থা যত খারাপ হয়, আমাকে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হতে থাকে—কিন্তু যে-সব হাসপাতাল এবং চিকিৎসক আমার চিকিৎসা করবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন, ইচ্ছে করে তাদের কাছ থেকে আমাকে দূরে রাখা হয়। এমনকি বঙ্গদেশের সব জেলখানা, আমার হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে যারা এত সাদরে বরণ করে থাকে, তারাও আমার মুখের ওপর তাদের দরজা বন্ধ করে দিল।

"আমার শারীরিক পীড়ার সঙ্গে যুক্ত হল মানসিক যন্ত্রণা। বঙ্গদেশের বাইরে বন্দি হয়ে থাকার সময়ে ক্রমবর্ধমান বেদনা এবং অসহায়তার বোধ নিয়ে আমি দেখতাম কী নিপীড়ন চলছে আমার প্রদেশে। সেই অবস্থায় আমি কেবল আমার নির্জন সেল-এ বসে শ্রীশ্রী মায়ের কাছে নীরবে প্রার্থনাই করতে পারতাম, আমার স্বদেশবাসীকে যেন তিনি শক্তি দেন, এক নতুন বাঙলা যেন জন্মগ্রহণ করে।

"জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ওই দীর্ঘ এবং অন্ধকার প্রহরগুলিতে আমি আশ্রয় খুঁজতাম ধ্যানের মধ্যে। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠত, ভারতের যে মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন,

পূজা করেছেন বঙ্কিম এবং বিবেকানন্দ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং দেশবন্ধু পর্যন্ত। আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠে আমাকে সান্ত্বনা দিত, সাহস দিত, অনুপ্রেরণা দিত। আমি উপলব্ধি করতাম—আগে কোনদিন তেমন ভাবে উপলব্ধি করিনি,—যে সেই মূর্তি, ভারতমাতা যা হবেন, সেইটেই চূড়ান্ত সত্য, বর্তমান মুহূর্তের সব ত্রুটি, সব অসম্পূর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। কোনও পার্থিব শক্তির ক্ষমতা ছিল না আমার সেই স্বপ্নে দেখা মূর্তি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। প্রতিদিন আমি পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করেছি তার বেদীমূলে।

"একটি স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমাকে এনে দিয়েছে জীবনের একটি উদ্দেশ্য। সে এক অখণ্ড বঙ্গের স্বপ্ন, যে বঙ্গ ভারতের এবং বিশ্বমানবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে, যে বঙ্গ সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে, যে বঙ্গ মুলসমান, হিন্দু, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধ সকলেরই মাতৃভূমি—যে বঙ্গ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, আমার জীবনের প্রতিদিন যাকে আরাধনা করি আমি, যার সেবা করার চেষ্টা করি।

"এই স্বপ্নের যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা, বাস্তবে তাকে রূপ দেওয়া, আমার জীবনের একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সব কিছু দিয়ে এর সাধনা করতে হবে, যদি সিদ্ধিলাভ করতে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন কোনও ত্যাগ নেই যা করা চলে না, এমন কোনও কষ্ট নেই যা স্বীকার করা চলে না। বন্ধুগণ, আপনারা কি সেই উচ্চে উঠবেন না, যেখানে আমাদের সামনে বিরাজ করবে একটিমাত্র সত্যবস্তু, এক মহান, অখণ্ড বঙ্গদেশ। আমাদের মহান পূর্বপুরুষেরা কী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আমাদের জন্য, স্মরণ করুন। ভুলবেন না, তাঁদের স্বপ্নের উত্তরাধিকারী আপনারা—আমাদের দেশের ভবিষ্যতের আশা আপনারা। আপনারা যদি চিন্তায় এবং কাজে বড় হন, তবেই আপনারা আপনাদের দেশকে বড় করতে পারবেন। তাই, আমি যতদূর আমার সাধ্য, অন্তরের থেকে বলছি, 'ভুলে যান আপনাদের ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদ, বিসর্জন দিন যত ব্যক্তিগত মতভেদ, চেষ্টা করুন, বাঙলা যাতে এক হয়, মহান হয়, যাতে বাঙলার গৌরবের মধ্যেই খুঁজে পাই আমাদের সর্বোচ্চ সুখ এবং গৌরব। যত যাই বলুন, বাঙলা বাঁচলে কে মরবে, বাঙলা মরলে কে বাঁচবে ?' "

এস. এস. গঙ্গে

সুভাষচন্দ্র বসু

২.৩.৩৩

নির্ঘণ্ট

অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ২২, ২৮, ৫৪, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০-৮৪, ১০৪, ১৪৩, ১৪৫
অগ্রগতি-মতবাদ ১০৯
অনশন ধর্মঘট ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৫২
অরবিন্দ *দেখুন* শ্রীঅরবিন্দ
অমরাবতী ৫৯, ৬৬
অমৃতবাজার পত্রিকা ('পত্রিকা') ৪১, ১৪৫, ১৭৫
অম্বিকা মেমোরিয়াল হল ১২০
অসহযোগ ১৮, ২৩, ৩৬, ১৪১, ১৪২
অসহযোগ আন্দোলন ১৪১

আইন অমান্য আন্দোলন ৭৬, ১০৬, ১১৫, ১২৩, ১৩৪, ১৪৮
আইরিশ ইতিহাস ১১৩
আইরিশ জনগণ ১১৩
আনসারি, ডঃ ৮৩
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭৬
আনে, এম. এস. ১৩২, ১৪৩-১৪৫, ১৬৫
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ৬১
আফগানিস্তান ৩১
আভারি, মিঃ ১০৬
আমস্টারডাম ১৩৪
আমানুল্লা, বাদশা ৩১
আমেদ, স্যার সৈয়দ ৮৫
আমেরিকা ১২০, ১৪২, ১৪৩
আয়ার্ল্যান্ড ৭৫, ৮৪, ৮৫, ৯১, ১১৩, ১১৪, ১৫১, ১৬৬
আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাস ৫৪, ৮০, ৮২, ৮৩
আরউইন, লর্ড ৫৩, ১৩৫, ১৬৬, ১৬৮
'আর্য' (পত্রিকা) ১৬৯
আলম, ডঃ ৪৪, ৬৩-৬৫, ১৭২, ১৭৩
আলম, বেগম ১৭২, ১৭৩
আলি, মওলানা মহম্মদ ১০২, ১০৩
আলি, শওকত ১০৩
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ১০৩
আলিপুর ৯২
আলিপুর কোর্ট ৮৬, ৮৯
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ৮৯, ১০৪, ১৭১
আহিরিটোলা ৯৬
অ্যারিস্টটল ২৯
অ্যালবার্ট হল ১৩৯, ১৬০
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ২১, ৮৬

ইংরেজ ৩০, ৭৬, ১৫১
ইংল্যান্ড ৬২, ১০২, ১০৪, ১৪২, ১৬৫
ইউনিয়ন বোর্ড ৭২, ৭৩, ৮৪, ৮৭
ইউ. পি. ১২৫
ইউরোপ ৪৭, ৬১, ১৪২
ইউরোপীয় বণিকসভা ৭৬, ৭৮
ইটালি ১২০, ১২৩, ১২৪
ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স ৯০
ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ৮৩
ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ১১৩
ইম্পিরিয়্যাল গার্ডস ৩১

উত্তরবঙ্গ ১২৫, ১৪৬
উপনিষদ ১২৩
উর্মিলা দেবী ৯২

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ৩৬

এ. আই. সি. সি *দেখুন* কংগ্রেস
এ. বি. এস. এ *দেখুন* নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি
এলাহাবাদ ২২, ৫৪, ৭০, ৭১
এলিসন, মিঃ ১৬০, ১৬১, ১৬২
এশিয়া ৪৭
এস. এস. গঙ্গে ১৭৭, ১৭৮

ওয়ার্কিং কমিটি ৩৯, ৫৪, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯-৮৩, ১০৩, ১০৪, ১১২, ১১৭, ১৩২, ১৩৩, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৮
ওয়ার্থ, মিঃ ১৫৪

কংগ্রেস ২২, ২৫, ২৭, ৩৩, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৫, ৭২, ৭৪-৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ১০১, ১০৬, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১২৩-১২৭, ১৩৫, ১৩৮-১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৫২, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি *দেখুন* ওয়ার্কিং কমিটি
কংগ্রেস নীতি ও কর্মসূচি ১১১-১১২
কংগ্রেস বিপ্লবী ১১৪
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন ১৪৮
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টি ১১৮, ১৪৭
কমিউনিজম ১২৯

কমিউনিস্ট ৬০, ৭৫, ১৩৭-১৩৯
করাচি ২৫, ১০৭, ১০৮, ১১৭, ১২৭, ১৩৫
করাচি কংগ্রেস ১১৬, ১৩৫
করাচি প্রস্তাব ১৬৬
কলকাতা ২২, ২৫, ২৬, ৪৩, ৫২, ৫৪, ৬৬, ৭১, ৭৮, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৮
কলকাতা কংগ্রেস ৩১, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ১০৪, ১৪৭
কলকাতা কর্পোরেশন (পুরসভা) ৭৫, ৭৭, ৮৬, ৮৭, ৯৩-৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৬, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৪৭-১৪৯
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১২০
কলকাতা প্রস্তাব ৫৪
কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা ৯৮
কাকোরি ষড়যন্ত্র ১০৬
কামাল ৩১
কাশীরাম ১৭
কুষ্ঠিয়া ১২৩
কৃত্তিবাস ১৭
কৃষক আন্দোলন ৪৯
ক্রমওয়েল ৩১

খড়্গপুর ১৪৯, ১৫০, ১৫৩
খড়্গ বাহাদুর ৩০
খড়্গপুর রেল হাসপাতাল ১৪৯, ১৫০
খাদি প্রতিষ্ঠান ১৪৬
খান, কুমার দেবেন্দ্রলাল ১৫০
খান, মৌলবী মহিউদ্দীন ১২৫
খিলাফৎ আন্দোলন ১৬৪
খুলনা ১৬৫
খ্রিশ্চান ৩৯
খ্রিস্ট ৩২

গভর্নর জেনারেল ১০৩, ১০৪
গাইবান্ধা ১২৫
গাঢ়োয়ালি ১১৫
গান্ধী, মহাত্মা ২২, ২৩, ৭৫-৭৮, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯১, ৯৪, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৬৮
গামা ১৪২
গিনওয়ালা, স্যার পি. ১৫৮
গিরনি কামগর ইউনিয়ন ৬০, ১৩৮
গুপ্ত, জে. সি. ৭১, ১৬০, ১৬২
গুপ্ত, দীনেশ ১০৬, ১১২
গুপ্ত, যোগেশ ৭২
১৮০

গৈলা ১৫৯
গোবিন্দানন্দ, শ্রী ৮২
গোয়ালন্দ ১৬০
গোলমুরি ২৭
গোলটেবিল বৈঠক ৭৫-৭৮, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১৩৫, ১৪৪, ১৬৬
গোস্বামী, টি. সি. ১৫৪
গৌহাটি ৮৩
গ্যারিবল্ডি ৩১
গ্রীক ১৩০
গ্ল্যাডিং, মিঃ ১৬০

ঘোষ, বিমলকান্তি ১৭৫
ঘোষ, মণি ১৫৭
ঘোষ, মতিলাল ৬২, ১৭৫
ঘোষ, শশীন্দ্র ১৫০
ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ৬৫
ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ *দেখুন* শ্রীঅরবিন্দ

চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনারায়ণ ১৬০, ১৬২
চক্রবর্তী, যোগীন্দ্রচন্দ্র ৪০
চট্টগ্রাম ৩৯, ৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা ১০৬, ১১৫
(চট্টোপাধ্যায়) বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৮
চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় ৯০
চণ্ডীদাস ১৭, ১৪২
চমনলাল, দেওয়ান ৬১
চরমপন্থী ৮৫
চাঁদপুর ১৬০, ১৬১, ১৬২
চিন ২৮, ৩১, ৪৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৬
চুঁচুড়া ২২
চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ ১১৯
চৌধুরী, হরেন্দ্রলাল ১১৯
চৌরঙ্গী ৯৬
চ্যাটার্জী, অমরেন্দ্রনাথ ১৫৪
চ্যাটার্জী, বরেন্দ্রনাথ ১৫৪
চ্যাটার্জী, শ্রীশচন্দ্র (এস. সি.) ১১৯, ১২০

ছাত্র আন্দোলন ৪৫-৪৭, ৪৯, ৬২-৬৩, ৬৪, ৬৫
ছাত্র আন্দোলনের প্রতি মনোভাব ৬২-৬৫
ছাত্র সমাজ ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৪৫, ৪৬, ৫০
ছাত্র সমিতি ৬৩

জগদ্দল ১৫৪, ১৫৫, ১৬১
জব্বলপুর ১৭০-১৭২
জাপান ২৯, ৩১, ৪৭, ৮৫
জামশেদপুর ১৮, ১৯, ২৭, ৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭

নির্ঘণ্ট

অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ২২, ২৮, ৫৪, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০-৮৪, ১০৪, ১৪৩, ১৪৫
অগ্রগতি-মতবাদ ১০৯
অনশন ধর্মঘট ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৫২
অরবিন্দ *দেখুন* শ্রীঅরবিন্দ
অমরাবতী ৫৯, ৬৬
অমৃতবাজার পত্রিকা ('পত্রিকা') ৪১, ১৪৫, ১৭৫
অম্বিকা মেমোরিয়াল হল ১২০
অসহযোগ ১৮, ২৩, ৩৬, ১৪১, ১৪২
অসহযোগ আন্দোলন ১৪১

আইন অমান্য আন্দোলন ৭৬, ১০৬, ১১৫, ১২৩, ১৩৪, ১৪৮
আইরিশ ইতিহাস ১১৩
আইরিশ জনগণ ১১৩
আনসারি, ডঃ ৮৩
আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭৬
আনে, এম. এস. ১৩২, ১৪৩-১৪৫, ১৬৫
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ৬১
আফগানিস্তান ৩১
আভারি, মিঃ ১০৬
আমস্টারডাম ১৩৪
আমানুল্লা, বাদশা ৩১
আমেদ, স্যার সৈয়দ ৮৫
আমেরিকা ১২০, ১৪২, ১৪৩
আয়ার্ল্যান্ড ৭৫, ৮৪, ৮৫, ৯১, ১১৩, ১১৪, ১৫১, ১৬৬
আয়েঙ্গার, শ্রীনিবাস ৫৪, ৮০, ৮২, ৮৩
আরউইন, লর্ড ৫৩, ১৩৫, ১৬৬, ১৬৮
'আর্য' (পত্রিকা) ১৬৯
আলম, ডঃ ৪৪, ৬৩-৬৫, ১৭২, ১৭৩
আলম, বেগম ১৭২, ১৭৩
আলি, মওলানা মহম্মদ ১০২, ১০৩
আলি, শওকত ১০৩
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ১০৩
আলিপুর ৯২
আলিপুর কোর্ট ৮৬, ৮৯
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ৮৯, ১০৪, ১৭১
আহিরিটোলা ৯৬
অ্যারিস্টটল ২৯
অ্যালবার্ট হল ১৩৯, ১৬০
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ২১, ৮৬

ইংরেজ ৩০, ৭৬, ১৫১
ইংল্যান্ড ৬২, ১০২, ১০৪, ১৪২, ১৬৫
ইউনিয়ন বোর্ড ৭২, ৭৩, ৮৪, ৮৭
ইউ. পি. ১২৫
ইউরোপ ৪৭, ৬১, ১৪২
ইউরোপীয় বণিকসভা ৭৬, ৭৮
ইটালি ১২০, ১২৩, ১২৪
ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স ৯০
ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ৮৩
ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ১১৩
ইম্পিরিয়্যাল গার্ডস ৩১

উত্তরবঙ্গ ১২৫, ১৪৬
উপনিষদ ১২৩
উর্মিলা দেবী ৯২

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ৩৬

এ. আই. সি. সি *দেখুন* কংগ্রেস
এ. বি. এস. এ *দেখুন* নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি
এলাহাবাদ ২২, ৫৪, ৭০, ৭১
এলিসন, মিঃ ১৬০, ১৬১, ১৬২
এশিয়া ৪৭
এস. এস. গঙ্গে ১৭৭, ১৭৮

ওয়ার্কিং কমিটি ৩৯, ৫৪, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯-৮৩, ১০৩, ১০৪, ১১২, ১১৭, ১৩২, ১৩৩, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৫, ১৬৮
ওয়ার্থ, মিঃ ১৫৪

কংগ্রেস ২২, ২৫, ২৭, ৩৩, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৫, ৭২, ৭৪-৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ১০১, ১০৬, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১২৩-১২৭, ১৩৫, ১৩৮-১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৮, ১৫২, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি *দেখুন* ওয়ার্কিং কমিটি
কংগ্রেস নীতি ও কর্মসূচি ১১১-১১২
কংগ্রেস বিপ্লবী ১১৪
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন ১৪৮
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টি ১১৮, ১৪৭
কমিউনিজম ১২৯

কমিউনিস্ট ৬০, ৭৫, ১৩৭-১৩৯
করাচি ২৫, ১০৭, ১০৮, ১১৭, ১২৭, ১৩৫
করাচি কংগ্রেস ১১৬, ১৩৫
করাচি প্রস্তাব ১৬৬
কলকাতা ২২, ২৫, ২৬, ৪৩, ৫২, ৫৪, ৬৬, ৭১, ৭৮, ৮৪, ৮৬, ৮৯, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৭, ১৫৫, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৮
কলকাতা কংগ্রেস ৩১, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৩, ১০৪, ১৪৭
কলকাতা কর্পোরেশন (পুরসভা) ৭৫, ৭৭, ৮৬, ৮৭, ৯৩-৯৬, ৯৮, ১০২, ১০৬, ১১৯, ১২০, ১২৩, ১৪৭-১৪৯
কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট ১২০
কলকাতা প্রস্তাব ৫৪
কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা ৯৮
কাকোরি ষড়যন্ত্র ১০৬
কামাল ৩১
কাশীরাম ১৭
কুষ্ঠিয়া ১২৩
কৃত্তিবাস ১৭
কৃষক আন্দোলন ৪৯
ক্রমওয়েল ৩১

খড়্গপুর ১৪৯, ১৫০, ১৫৩
খড়্গ বাহাদুর ৩০
খড়্গপুর রেল হাসপাতাল ১৪৯, ১৫০
খাদি প্রতিষ্ঠান ১৪৬
খান, কুমার দেবেন্দ্রলাল ১৫০
খান, মৌলবী মহিউদ্দীন ১২৫
খিলাফৎ আন্দোলন ১৬৪
খুলনা ১৬৫
খ্রিশ্চান ৩৯
খ্রিস্ট ৩২

গভর্নর জেনারেল ১০৩, ১০৪
গাইবান্ধা ১২৫
গাঢ়োয়ালি ১১৫
গান্ধী, মহাত্মা ২২, ২৩, ৭৫-৭৮, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯১, ৯৪, ১০১, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩৫, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
গান্ধী-আরউইন চুক্তি ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৬৮
গামা ১৪২
গিনওয়ালা, স্যার পি. ১৫৮
গিরনি কামগর ইউনিয়ন ৬০, ১৩৮
গুপ্ত, জে. সি. ৭১, ১৬০, ১৬২
গুপ্ত, দীনেশ ১০৬, ১১২
গুপ্ত, যোগেশ ৭২
গৈলা ১৫৯
গোবিন্দানন্দ, শ্রী ৮২
গোয়ালন্দ ১৬০
গোলমুরি ২৭
গোলটেবিল বৈঠক ৭৫-৭৮, ১০৬, ১০৭, ১১৩, ১৩৫, ১৪৪, ১৬৬
গোস্বামী, টি. সি. ১৫৪
গৌহাটি ৮৩
গ্যারিবল্ডি ৩১
গ্রীক ১৩০
গ্ল্যাডিং, মিঃ ১৬০

ঘোষ, বিমলকান্তি ১৭৫
ঘোষ, মণি ১৫৭
ঘোষ, মতিলাল ৬২, ১৭৫
ঘোষ, শশীন্দ্র ১৫০
ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ৬৫
ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ *দেখুন* শ্রীঅরবিন্দ

চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনারায়ণ ১৬০, ১৬২
চক্রবর্তী, যোগীন্দ্রচন্দ্র ৪০
চট্টগ্রাম ৩৯, ৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা ১০৬, ১১৫
(চট্টোপাধ্যায়) বঙ্কিমচন্দ্র ১৭৮
চট্টোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় ৯০
চণ্ডীদাস ১৭, ১৪২
চমনলাল, দেওয়ান ৬১
চরমপন্থী ৮৫
চাঁদপুর ১৬০, ১৬১, ১৬২
চিন ২৮, ৩১, ৪৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৩৬
চুঁচুড়া ২২
চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ ১১৯
চৌধুরী, হরেন্দ্রলাল ১১৯
চৌরঙ্গী ৯৬
চ্যাটার্জী, অমরেন্দ্রনাথ ১৫৪
চ্যাটার্জী, বরেন্দ্রনাথ ১৫৪
চ্যাটার্জী, শ্রীশচন্দ্র (এস. সি.) ১১৯, ১২০

ছাত্র আন্দোলন ৪৫-৪৭, ৪৯, ৬২-৬৩, ৬৪, ৬৫
ছাত্র আন্দোলনের প্রতি মনোভাব ৬২-৬৫
ছাত্র সমাজ ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৪৫, ৪৬, ৫০
ছাত্র সমিতি ৬৩

জগদ্দল ১৫৪, ১৫৫, ১৬১
জব্বলপুর ১৭০-১৭২
জাপান ২৯, ৩১, ৪৭, ৮৫
জামশেদপুর ১৮, ১৯, ২৭, ৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭

জার্মান ২৯, ১৩০
জার্মানি ৩১, ৮৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৬৪
জিনওয়ালা, মিঃ ১৩৮
জিবিসানা ১৪২
জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স ১৫৫, ১৫৬
জেনিভা ৬১, ১৩৪
জেলা কংগ্রেস কমিটি ২৬, ২৭, ১১৬-১১৯, ১২১, ১৩২, ১৪৭

ঝরিয়া ১৩৮
ঝরিয়া কংগ্রেস ৬১

টাটা ১৮-২১, ২৭, ১৫২, ১৫৩
টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ১৮, ১৯, ২১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭
টাউন হল ১৩৯
টাউনসেন্ড ১৪২, ১৫১
টিনপ্লেট কোম্পানি ১৮-২০, ২৭, ৩২
ট্রাম কোম্পানি ৯৮, ৯৯
ট্রেড উইনিয়ন নীতি ১৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ৪৪

ডাইয়োজিনিস ১৩০
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ৮৪
ডোমিনিয়ান স্টেটাস ৫৩, ৮৩

ঢাকা ১৩২, ১৪৬, ১৬০-১৬২
ঢাকা তদন্ত কমিটি ১৬০
ঢাকা তার-কাটা মামলা ১০৬
ঢাকা সাইক্লোন ফান্ড ১৪৬

তুরস্ক ৪৭

দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৬, ৭৭
দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র ৭৭
দক্ষিণপন্থা (দক্ষিণপন্থী) ৫৯, ৬০, ৬১, ১২৭, ১৩৭-১৩৯
দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা ৯৩
দত্ত, অখিলচন্দ্র ৪০
দত্ত, গোবিন্দ ১৫০
দত্ত, বটুকেশ্বর ৪৪
দত্ত, ভূপেন ১৩৯
দত্ত, মেজর ৯১-৯৩
দালাল, এ. আর. ১৫৭
দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৭, ১৮, ২৩-২৫, ৪১, ৪৫, ৬২, ৭৪, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১২৩-১২৫, ১৪৭, ১৮৭
দাস, পূর্ণচন্দ্র ১২১
দাস, যতীন্দ্রনাথ ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৫০-৫২, ১১২, ১২৪
দাসগুপ্ত, ডঃ ৯০
দাসগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ৬২, ৬৫
দাসগুপ্ত, সতীশচন্দ্র ১৪৬
দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ ১৪৬, ১৬০, ১৬২
দিল্লী ২৫, ৫৪, ৭৫, ৭৭, ৯৩, ১০৬, ১৫৯
দিল্লী ঘোষণাপত্র ৭৫, ৭৭, ১১৫
দিল্লী চুক্তি ১৬৭, ১৬৮
দে ডাঃ বি. এন. ৯৬
দেরাদুন ১৭৩
দেশপাণ্ডে, মিঃ ১৩৮-১৪০
দেশবন্ধু, *দেখুন* দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
দৌলতরাম, জয়রামদাস ৮০

ধীরেনবাবু ৯২

নওজোয়ান ভারত সভা ১০৭, ১০৮, ১২৫, ১২৬, ১২৭
নড়াইল ১৪০
নয়া দিল্লী ১১৬
নরিম্যান, শ্রী ১৬৫
নাইডু, কমরেড ১৫৭
নাগপুর ৫৫, ৫৯, ৮৫, ১০৬, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৪
নায়ার, স্যর কৃষ্ণন ১৭২
নারায়ণগঞ্জ ১৬০-১৬২
নারী জাগরণ ৪৯
নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতি ৬৩-৬৫
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (সারা ভারত শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস) ৫৯, ৮৮, ১৩৪, ১৪০
নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস ৫২
নিৎসে (নিটশে) ২৯, ১৩০
নিয়োগি, জ্ঞানাঞ্জন ৯২, ৯৩
নৃপেনবাবু ৯১, ৯২
নেত্রকোণা ১২১, ১২২
নেপোলিয়ন ৩১
নেহেরু, জওহরলাল ২২, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৮০, ৮১, ৮৩
নেহেরু, মতিলাল ২৮, ৫৪, ৭০-৭২, ৭৮, ৮১-৮৩, ৮৫, ১৪৩, ১৪৮
নেহেরু রিপোর্ট ৬১
নোয়াপাড়া থানা ১৫৪-১৫৬
নোবেল পুরস্কার ১৪২
নোয়াখালি ১২৩, ১২৪
নোয়াখালি যুব সম্মেলন ১২৪
ন্যাশনাল গার্ডস ৩১

পটুয়াখালি মীমাংসা ৩৮

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৩৩, ৩৪
পটেল, সর্দার বল্লভভাই ১৫৯
পণ্ডিচেরি ১৬৯
পাইন, বরদা ৯০
পাঞ্জাব ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫১, ১০৬, ১১৫, ১৬৪
পাঞ্জাবি ছাত্র-সম্মেলন ৪৩
পাবনা ৯৯
পাবনা হোসিয়ারি শিল্প ৯৯-১০০
পারমুর, লর্ড ৫৩
পুণা ১৬৫
পূর্ণ বর্জন ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯
পূর্ণ স্বাধনীতার তাৎপর্য ১২৩-১২৪
পেট্রিক, স্যার ফ্লিন্ডার্স ৪৭
প্লেটো ২৯
প্যান-এশিয়াটিক লেবার কনফারেন্স ৬১
প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড-ইউনিয়ন সচিবালয় ৬০, ১৩৮
প্রকাশম, মিঃ ৮০, ৮২
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২২, ২৫-২৮, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৬২, ৬৪-৬৬, ৭১-৭৩, ৭৯-৮১, ৮৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১১৬-১১৯, ১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫
প্রেন্টিস, মিঃ ১৫৪

ফরিদপুর ১১৯-১২২
ফোনেশিয়া ৪৭
ফ্যাসিবাদ ৯৪
ফ্রান্স ১৪২
ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া ১৯, ৩৩, ৩৯-৪০, ৭৯, ১৪৩
ফ্রেডারিক ৩১

বক্সী, সত্যরঞ্জন ১৬৯
বঙ্গদেশ কংগ্রেসের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি ১৪৬, ১৪৮
বঙ্গদেশে মতভেদ ১৩২
বঙ্গভঙ্গ ৩৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন ১৬৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ২১, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৩, ৭৫
বগলকোট ৫১
বন্দীদের অপরাধ মার্জনার দাবি ১০৬-১০৭
বন্দেমাতরম্ (পত্রিকা) ২৩
বন্দেমাতরম্ (ধ্বনি) ২৪, ৩৭, ৫০, ৫৯, ৭০, ৯২, ১৩১
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল নাথ ৯৩
বড় দিদি (প্রমীলা মিত্র) ৯০
বড়বাজার (কলকাতা) ১৪৭
বড়বাজার কংগ্রেস কমিটি ১৪৭
বয়কট *দেখুন* ব্রিটিশ পণ্যবর্জন
বরিশাল ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২, ১৫৯
বরিশাল ডাকাতি মামলা ১০৬
বর্মন, মদনমোহন ১০৬
বর্মা ৪৪, ৫২
বলশেভিক ১১০, ১২৯, ১৩০
বলশেভিজম (বলশেভিকবাদ) ১১০, ১২৮, ১২৯, ১৩০
বসু, জগদীশচন্দ্র ৮৫
বসু, বিজয় কৃষ্ণ ৪০
বসু, বিভাবতী *দেখুন* মেজবৌদি
বসু, শরৎচন্দ্র (মেজদাদা) ১৬৯, ১৭০, ১৭২
বসু, ডাঃ সুনীল ১৭১, ১৭২
বসু, সুভাষচন্দ্র ২৫, ৭১, ৮২, ৮৭, ৮৯, ১৪৫, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৮
বসুমতী ৪০, ৪১
বহরমপুর ১৫১, ১৬৫
বহরমপুর জেল ৯২, ১৪১, ১৫১
বাংলা কংগ্রেস ২৬, ৪০, ৪১, ৪২, ৭০, ৮৭, ৮৮, ১৬৩
বাংলা দেশ (বঙ্গদেশ) ১৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৫-৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৯, ৮৩-৮৫, ৮৮, ৯৩, ১০৪-১০৬, ১১৫-১১৮, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১-১৩৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬-১৫১, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮
বাংলা সাহিত্য ৪৪
বাংলার বিবাদ ৭১
বাঙালী যুবক ২৩, ২৭, ১৫০, ১৫১,১৬৪
বার্গস ৬৮
বাজাজ, যমুনালাল ৮০-৮২
বাদবিল্লা ৭২, ৭৩, ৮৩, ৮৫-৮৮
বাবা (জানকীনাথ বসু) ৯০ ১৬৮
বামপন্থা (বামপন্থী) ৫৯, ৬০, ৬১, ১৪৪
বাম-শাখা (Left wing) ১১২
বার্মা অয়েল কোম্পানি ১৮, ২৭, ৩২
বি পি সি সি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বিদ্যাপতি ১৭
বিধানসভা ২৭
বিপ্লবী আন্দোলন ১৪১
বিপ্লবী যুগ (সন্ত্রাসবাদ) ১৮, ৩৬
বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা ১৬৬
বিবেকানন্দ ১৭, ১৮, ২৩, ২৪, ৮৫, ১২৩, ১৪১, ১৪২, ১৭৮
বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ ১০৬, ১১২
বিষয় নির্বাচনী কমিটি ৭৫
বীরভূম ২৫, ২৬
বেকার, মিঃ ১৫৩
বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ১০৫, ১০৬, ১৪৪

জার্মান ২৯, ১৩০
জার্মানি ৩১, ৮৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ ১৬৪
জিনওয়ালা, মিঃ ১৩৮
জিবিসানা ১৪২
জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স ১৫৫, ১৫৬
জেনিভা ৬১, ১৩৪
জেলা কংগ্রেস কমিটি ২৬, ২৭, ১১৬-১১৯, ১২১, ১৩২, ১৪৭

ঝরিয়া ১৩৮
ঝরিয়া কংগ্রেস ৬১

টাটা ১৮-২১, ২৭, ১৫২, ১৫৩
টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি ১৮, ১৯, ২১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭
টাউন হল ১৩৯
টাউনসেন্ড ১৪২, ১৫১
টিনপ্লেট কোম্পানি ১৮-২০, ২৭, ৩২
ট্রাম কোম্পানি ৯৮, ৯৯
ট্রেড উইনিয়ন নীতি ১৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ৪৪

ডাইয়োজিনিস ১৩০
ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ৮৪
ডোমিনিয়ান স্টেটাস ৫৩, ৮৩

ঢাকা ১৩২, ১৪৬, ১৬০-১৬২
ঢাকা তদন্ত কমিটি ১৬০
ঢাকা তার-কাটা মামলা ১০৬
ঢাকা সাইক্লোন ফান্ড ১৪৬

তুরস্ক ৪৭

দক্ষিণ আফ্রিকা ৭৬, ৭৭
দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র ৭৭
দক্ষিণপন্থা (দক্ষিণপন্থী) ৫৯, ৬০, ৬১, ১২৭, ১৩৭-১৩৯
দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা ৯৩
দত্ত, অখিলচন্দ্র ৪০
দত্ত, গোবিন্দ ১৫০
দত্ত, বটুকেশ্বর ৪৪
দত্ত, ভূপেন ১৩৯
দত্ত, মেজর ৯১-৯৩
দালাল, এ. আর. ১৫৭
দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৭, ১৮, ২৩-২৫, ৪১, ৪৫, ৬২, ৭৪, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১২৩-১২৫, ১৪৭, ১৮৭
দাস, পূর্ণচন্দ্র ১২১
দাস, যতীন্দ্রনাথ ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৫০-৫২, ১১২, ১২৪
দাসগুপ্ত, ডঃ ৯০
দাসগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ৬২, ৬৫
দাসগুপ্ত, সতীশচন্দ্র ১৪৬
দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ ১৪৬, ১৬০, ১৬২
দিল্লী ২৫, ৫৪, ৭৫, ৭৭, ৯৩, ১০৬, ১৫৯
দিল্লী ঘোষণাপত্র ৭৫, ৭৭, ১১৫
দিল্লী চুক্তি ১৬৭, ১৬৮
দে ডাঃ বি. এন. ৯৬
দেরাদুন ১৭৩
দেশপাণ্ডে, মিঃ ১৩৮-১৪০
দেশবন্ধু, *দেখুন* দাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
দৌলতরাম, জয়রামদাস ৮০

ধীরেনবাবু ৯২

নওজোয়ান ভারত সভা ১০৭, ১০৮, ১২৫, ১২৬, ১২৭
নড়াইল ১৪০
নয়া দিল্লী ১১৬
নরিম্যান, শ্রী ১৬৫
নাইডু, কমরেড ১৫৭
নাগপুর ৫৫, ৫৯, ৮৫, ১০৬, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৪
নায়ার, স্যর কৃষ্ণন ১৭২
নারায়ণগঞ্জ ১৬০-১৬২
নারী জাগরণ ৪৯
নিখিলবঙ্গ ছাত্র সমিতি ৬৩-৬৫
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (সারা ভারত শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস) ৫৯, ৮৮, ১৩৪, ১৪০
নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস ৫২
নিৎসে (নিটশে) ২৯, ১৩০
নিয়োগি, জ্ঞানাঞ্জন ৯২, ৯৩
নৃপেনবাবু ৯১, ৯২
নেত্রকোণা ১২১, ১২২
নেপোলিয়ন ৩১
নেহেরু, জওহরলাল ২২, ৫৪, ৫৯, ৬০, ৬৪, ৮০, ৮১, ৮৩
নেহেরু, মতিলাল ২৮, ৫৪, ৭০-৭২, ৭৮, ৮১-৮৩, ৮৫, ১৪৩, ১৪৮
নেহেরু রিপোর্ট ৬১
নোয়াপাড়া থানা ১৫৪-১৫৬
নোবেল পুরস্কার ১৪২
নোয়াখালি ১২৩, ১২৪
নোয়াখালি যুব সম্মেলন ১২৪
ন্যাশনাল গার্ডস ৩১

পটুয়াখালি মীমাংসা ৩৮

পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন ৩৩, ৩৪
পটেল, সর্দার বল্লভভাই ১৫৯
পণ্ডিচেরি ১৬৯
পাইন, বরদা ৯০
পাঞ্জাব ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫১, ১০৬, ১১৫, ১৬৪
পাঞ্জাবি ছাত্র-সম্মেলন ৪৩
পাবনা ৯৯
পাবনা হোসিয়ারি শিল্প ৯৯-১০০
পারমুর, লর্ড ৫৩
পুণা ১৬৫
পূর্ণ বর্জন ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৭৯
পূর্ণ স্বাধনীতার তাৎপর্য ১২৩-১২৪
পেট্রিক, স্যার ফ্লিল্ডার্স ৪৭
প্লেটো ২৯
প্যান-এশিয়াটিক লেবার কনফারেন্স ৬১
প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড-ইউনিয়ন সচিবালয় ৬০, ১৩৮
প্রকাশম, মিঃ ৮০, ৮২
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২২, ২৫-২৮, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৬২, ৬৪-৬৬, ৭১-৭৩, ৭৯-৮১, ৮৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১১৬-১১৯, ১২২, ১৩১, ১৩২, ১৩৯, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫
প্রেন্টিস, মিঃ ১৫৪

ফরিদপুর ১১৯-১২২
ফোনেশিয়া ৪৭
ফ্যাসিবাদ ৯৪
ফ্রান্স ১৪২
ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া ১৯, ৩৩, ৩৯-৪০, ৭৯, ১৪৩
ফ্রেডারিক ৩১

বক্সী, সত্যরঞ্জন ১৬৯
বঙ্গদেশ কংগ্রেসের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ত্রাণ কমিটি ১৪৬, ১৪৮
বঙ্গদেশে মতভেদ ১৩২
বঙ্গভঙ্গ ৩৬
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন ১৬৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ ২১, ২৫, ২৬, ৩২, ৩৩, ৭৫
বগলকোট ৫১
বন্দীদের অপরাধ মার্জনার দাবি ১০৬-১০৭
বন্দেমাতরম্ (পত্রিকা) ২৩
বন্দেমাতরম্ (ধ্বনি) ২৪, ৩৭, ৫০, ৫৯, ৭০, ৯২, ১৩১
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিল নাথ ৯৩
বড় দিদি (প্রমীলা মিত্র) ৯০
বড়বাজার (কলকাতা) ১৪৭
বড়বাজার কংগ্রেস কমিটি ১৪৭
বয়কট *দেখুন* ব্রিটিশ পণ্যবর্জন
বরিশাল ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪২, ১৫৯
বরিশাল ডাকাতি মামলা ১০৬
বর্মন, মদনমোহন ১০৬
বর্মা ৪৪, ৫২
বলশেভিক ১১০, ১২৯, ১৩০
বলশেভিজম (বলশেভিকবাদ) ১১০, ১২৮, ১২৯, ১৩০
বসু, জগদীশচন্দ্র ৮৫
বসু, বিজয় কৃষ্ণ ৪০
বসু, বিভাবতী *দেখুন* মেজবৌদি
বসু, শরৎচন্দ্র (মেজদাদা) ১৬৯, ১৭০, ১৭২
বসু, ডাঃ সুনীল ১৭১, ১৭২
বসু, সুভাষচন্দ্র ২৫, ৭১, ৮২, ৮৭, ৮৯, ১৪৫, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৮
বসুমতী ৪০, ৪১
বহরমপুর ১৫১, ১৬৫
বহরমপুর জেল ৯২, ১৪১, ১৫১
বাংলা কংগ্রেস ২৬, ৪০, ৪১, ৪২, ৭০, ৮৭, ৮৮, ১৬৩
বাংলা দেশ (বঙ্গদেশ) ১৭, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৫-৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৫১, ৫২, ৬৩, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৯, ৮৩-৮৫, ৮৮, ৯৩, ১০৪-১০৬, ১১৫-১১৮, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১৩১-১৩৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৬-১৫১, ১৫৬, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৮, ১৭৭, ১৭৮
বাংলা সাহিত্য ৪৪
বাংলার বিবাদ ৭১
বাঙালী যুবক ২৩, ২৭, ১৫০, ১৫১,১৬৪
বার্গসঁ ৬৮
বাজাজ, যমুনালাল ৮০-৮২
বাদবিল্লা ৭২, ৭৩, ৮৩, ৮৫-৮৮
বাবা (জানকীনাথ বসু) ৯০ ১৬৮
বামপন্থা (বামপন্থী) ৫৯, ৬০, ৬১, ১৪৪
বাম-শাখা (Left wing) ১১২
বার্মা অয়েল কোম্পানি ১৮, ২৭, ৩২
বি পি সি সি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বিদ্যাপতি ১৭
বিধানসভা ২৭
বিপ্লবী আন্দোলন ১৪১
বিপ্লবী যুগ (সন্ত্রাসবাদ) ১৮, ৩৬
বিপ্লবী ষড়যন্ত্র মামলা ১৬৬
বিবেকানন্দ ১৭, ১৮, ২৩, ২৪, ৮৫, ১২৩, ১৪১, ১৪২, ১৭৮
বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ ১০৬, ১১২
বিষয় নির্বাচনী কমিটি ৭৫
বীরভূম ২৫, ২৬
বেকার, মিঃ ১৫৩
বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স ১০৫, ১০৬, ১৪৪

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স ১৫৪
বেঙ্গল টেনান্সি বিল ২৫
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট ৯৮
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর ৫২
বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স ৮৭
বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট (১৯১৯) ৭৩
বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ১৪৬
বেতুল ১০৬
বেমরোজ, মিঃ ১৫৪
বেরার ৬৬
বৈষ্ণবধর্ম ১৭
বোম্বাই ১৮, ১০৫, ১০৬, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৭, ১৬৫
ব্যবস্থাপক সভা ২১, ২২, ৩২, ৭৯
ব্যানার্জী, কৃষ্ণপদ ১৫০
ব্যানার্জী, চারু ১৪৯
ব্যানার্জী, জে. এল. ২৫-২৭
ব্যাবিলন ৪৭
ব্যারাকপুর ১৫৫
ব্রাহ্ম ধর্ম ১৭
ব্রাহ্মসমাজ ২৯
ব্রিটেন ৭৭, ৮৫, ৮৬, ১০৪, ১১৩
ব্রিটিশ ১৮, ২৩, ৩৬, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৯২, ৯৭, ১০১, ১০৪, ১১৩, ১৫১
ব্রিটিশ পণ্যবর্জন (বয়কট) ৩৬, ১০৭, ১১২, ১১৫, ১৪২, ১৬৫
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ৭৫-৭৭
ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ১১৩
ব্রিটিশ সরকার (শাসন) ৩৬, ৩৭, ৭৬-৭৮, ১১২, ১১৩, ১২৯, ১৩৫, ১৪০, ১৪২, ১৬৬
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১১১, ১২৯, ১৪২
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৬০, ১১১, ১২৯
'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান' ১৫১

ভট্টাচার্য, অনিবাশ ১৬০
ভবানীপুর Rioting মামলা ১০৬
ভাইসরয় ৫৩, ৫৪, ৬১, ৭৫, ১০৩
ভাওয়ালি স্যানিটেরিয়াম ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬
ভারতচন্দ্র ১৭
ভারতবর্ষ ২৪, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫-৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৭-৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭-৭০, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ১০১-১০৪, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৭-১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৭৭
ভারতমাতা ৩৭, ১২০
ভারতীয় লেবার পার্টি ১১৪

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ১৭৬
মথুরা ১২৫
মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ৫৩
মণ্ডল, শান্তিরাম ১০৬
মধ্যপন্থী ৮৫
মধ্যপ্রদেশ ৫৫, ৬৬, ৭২, ১০৬, ১৭১
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ছাত্র সম্মেলন ৬৬
মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন ৫৫
ময়মনসিংহ ৬৩, ৬৪, ১২১, ১২২
ময়মনসিংহ ছাত্র সম্মেলন ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১২১-১২২
ময়মনসিংহ মামলা ১০৬
ময়মনসিংহ Ware House মামলা ১০৬
মর্লি-মিন্টো সংস্কার ৬৩, ১৪১
মস্কো ৬০, ১৩৪, ১৩৭-১৪০
মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন ১৬৫, ১৬৭
মা (প্রভাবতী বসু) ৯০
মাৎসিনি (ম্যাটসিনি) ১২০, ১২৪
মাদ্রাজ ৮৩, ১৭১, ১৭২, ১৭৪
মাদ্রাজ কাউন্সিল ১৭২
মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট ১৭১
মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি ১৭১, ১৭২
মাণ্ডালে ১৬৯
মান্দলা ১০৬
মান্দলা জেল ৯২
মার্কস, কার্ল ১৭, ১৮, ১১০, ১২৯
মার্কসবাদ ১১০, ১২৮
মালব্য, পণ্ডিত মদন মোহন ৭১, ৮৩
মিত্র, এস. কে. ৭১
মিত্র, ললিতকুমার ৯৮
মিত্র, সন্তোষ ৭২, ১৫০, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১৬৬
মুকুন্দরাম ১৭
মুখার্জি, বঙ্কিম ১৩৯
মুদালিয়র, ডাঃ গুরুস্বামী ১৭১
মুন্সীগঞ্জ ১৬২
মুন্সীগঞ্জ ডাকঘর লুঠ মামলা ১০৬
মুর, টমাস ২৯
মুসলিম লিগ ১০৩
মুসোলিনি ৩১
মেছুয়াবাজার বোমার মামলা ৯৩
মেজদা, *দেখুন* বসু, শরৎচন্দ্র
মেজবৌদি (বিভাবতী বসু) ৯০
মেটিয়াবুরুজ ১৩৯
মেদিনীপুর ৭৩, ৮৭
মেদিনীপুর যুব সম্মেলন ৭৩
মেয়র (কলকাতার) ৮৬, ৯৩, ১০০, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১২২

মেয়রের ভাষণ ৯৩-৯৮
মেয়ো, মিস ১২৪
মৈত্র, কমরেড ১৫৭
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে ১০৪
ম্যাকেনজি, ইনসপেক্টর ১৫৫

যতীন্দ্রনাথ দাস স্মৃতিস্তম্ভ ৫১-৫২
যশোহর ২১, ৭২, ৭৩, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ১৩২
যশোহর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন ৭২
যুক্তপ্রদেশ ১০৬, ১৭৪
যুব আন্দোলন ৪৯, ৫৫-৫৯, ৭৩, ৭৪, ১৩০-১৩১, ১৬৬
যুব সংগঠন ১২৬
'যুব সংঘ' ৫৬
যুবক সমাজ ২৮, ২৯, ৩০, ১০০
যোশি, মিঃ ১৩৮

রক্ষিত, ভূপেন্দ্র ৯১
রজ্জাক, মিঃ ১০৩
রাইটার্স বিল্ডিং ১৫৩
রাজগুরু ১১২
রাজনৈতিক বন্দিদের অনশন ধর্মঘট ৩৩, ৩৪
রাজনৈতিক নির্যাতন ৩৩
রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস ২৮
রাজশাহী ছাত্রসম্মেলন ৩০
রাজশাহী জেলা ছাত্রসম্মেলন ২৮, ২৯
রাজশাহী মেল ডাকাতি মামলা ১০৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদী, শ্রী ১৬৫
রামপ্রসাদ ১৭
রায়, অনাথনাথ ১৭০
রায়, অনিলবরণ ১৬৯
রায়, অবিনাশচন্দ্র ২৬, ২৭
রায়, কিরণশঙ্কর ৩৯
রায়, দিলীপ কুমার ১৬৯
(রায়,) দ্বিজেন্দ্রলাল ১৭৮
রায়, ডাঃ নারায়ণ ১০৬
রায়, ডাঃ বি. সি. (বিধানচন্দ্র রায়) ৮০, ১১৮, ১২২, ১৪৩, ১৪৫, ১৭১, ১৭৫
রায়, বিজয়চন্দ্র ৭২, ৮৬
রায়, রাজা রামমোহন ২৩, ২৯, ৮৫, ১৪০
রায়, ডাঃ সুনীল ১৭৫
রায়চৌধুরী, সবিতা ১৫০
রায়চৌধুরী, সুশীল ১৪৯
রাশিয়া ৩১, ৮৬, ৯১, ১১০, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৪২
রিডিং, লর্ড ৫৩
রেড আর্মি ৩১

লখনউ ৪০, ৭২
লা ফায়েৎ ৩১
লাহোর ২৩, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫৩, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৫, ৮৯, ১০৭, ১৭৩
লাহোর কংগ্রেস ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৫. ১০৫
লাহোর ফাঁসি ১০৭
লাহোর ষড়যন্ত্র ১১২
'লিগ এগেন্সট ইম্পিরিয়্যালিজম' ৬১
লিবার্টি (পত্রিকা) ২৫
লিলুয়া ধর্মঘট ১০৬
লুডেনডর্ফ, ফন ৮৫
লেনিন ১১০, ১২৯

শুকদেব ১১২
শিবাজী মন্দির ১৬৭
শেয়ালদা ৬৬
শ্যামাদাস কবিরাজ ৯০
শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৫২
শ্রমিক ইউনিয়ন ১৩৪-১৪০
শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) ৫৯-৬১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭-১৪০
শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন ১৩৮, ১৫২, ১৫৩
শ্রমিক আন্দোলন ৩৭, ৫৭
শ্রমিক দলের সরকার (ব্রিটেনে) ৫৩
শ্রমিক সংঘ ১৯, ২০, ২১
শ্রীঅরবিন্দ ২৩, ১৪১, ১৬৯
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭, ২৪, ১২৩, ১৪০
শ্রীশ্রীমা ১৭৭

সংরক্ষণমূলক শুল্ক ২৭
সক্রেটিস ২৯, ৩১, ৩২
সত্যমূর্তি, ডঃ এস ৮০-৮৩, ১৭৩
সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৬৮
সমহারমূর্তি ৫৪
সমাজতন্ত্রবাদ ১৮, ১২৯, ১৩০
সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র (ভারতে) ১০৭, ১১০, ১২৯
সমাজসেবা সংঘ ৭৪
সমান্তরাল সরকার ৭৫
সরকার, নলিনীরঞ্জন ৬৫
সরকার, স্যর নীলরতন ১৭১, ১৭৫
সর্ব-দলীয় সমাবেশ ১৩৪
সর্বভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন ২৩
সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন ৫১
সাইবেরিয়া ৪৭
সাইমন কমিশন ২২, ২৬, ৫৩, ৭৭
সাম্যবাদ (ভারতে) ১১০
সিং, প্রেম ৮৯, ৯৩
সিং, ভগৎ ৪৪, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪
সিং, বাবা গুরুদিৎ ১০৬
সিং, রামসুন্দর ১৫০
সিং, সর্দার শার্দুল ৮৩
সিংহল ৪৭

বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স কনফারেন্স ১৫৪
বেঙ্গল টেনান্সি বিল ২৫
বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটি *দেখুন* প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
বেঙ্গল বাস সিন্ডিকেট ৯৮
বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কোর ৫২
বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স ৮৭
বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ-গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট (১৯১৯) ৭৩
বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ১৪৬
বেতুল ১০৬
বেমরোজ, মিঃ ১৫৪
বেরার ৬৬
বৈষ্ণবধর্ম ১৭
বোম্বাই ১৮, ১০৫, ১০৬, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৭, ১৬৫
ব্যবস্থাপক সভা ২১, ২২, ৩২, ৭৯
ব্যানার্জী, কৃষ্ণপদ ১৫০
ব্যানার্জী, চারু ১৪৯
ব্যানার্জী, জে. এল. ২৫-২৭
ব্যাবিলন ৪৭
ব্যারাকপুর ১৫৫
ব্রাহ্ম ধর্ম ১৭
ব্রাহ্মসমাজ ২৯
ব্রিটেন ৭৭, ৮৫, ৮৬, ১০৪, ১১৩
ব্রিটিশ ১৮, ২৩, ৩৬, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৯২, ৯৭, ১০১, ১০৪, ১১৩, ১৫১
ব্রিটিশ পণ্যবর্জন (বয়কট) ৩৬, ১০৭, ১১২, ১১৫, ১৪২, ১৬৫
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ৭৫-৭৭
ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ১১৩
ব্রিটিশ সরকার (শাসন) ৩৬, ৩৭, ৭৬-৭৮, ১১২, ১১৩, ১২৯, ১৩৫, ১৪০, ১৪২, ১৬৬
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১১১, ১২৯, ১৪২
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ৬০, ১১১, ১২৯
'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান' ১৫১

ভট্টাচার্য, অনিবাশ ১৬০
ভবানীপুর Rioting মামলা ১০৬
ভাইসরয় ৫৩, ৫৪, ৬১, ৭৫, ১০৩
ভাওয়ালি স্যানিটেরিয়াম ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬
ভারতচন্দ্র ১৭
ভারতবর্ষ ২৪, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৫-৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৭-৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৭-৭০, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ১০১-১০৪, ১০৮, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৬, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৭-১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৬০, ১৬৬, ১৬৭, ১৭১, ১৭৭
ভারতমাতা ৩৭, ১২০
ভারতীয় লেবার পার্টি ১১৪

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ ১৭৬
মথুরা ১২৫
মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ৫৩
মণ্ডল, শান্তিরাম ১০৬
মধ্যপন্থী ৮৫
মধ্যপ্রদেশ ৫৫, ৬৬, ৭২, ১০৬, ১৭১
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার ছাত্র সম্মেলন ৬৬
মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন ৫৫
ময়মনসিংহ ৬৩, ৬৪, ১২১, ১২২
ময়মনসিংহ ছাত্র সম্মেলন ৬৩, ৬৪, ৬৫, ১২১-১২২
ময়মনসিংহ মামলা ১০৬
ময়মনসিংহ Ware House মামলা ১০৬
মর্লি-মিন্টো সংস্কার ৬৩, ১৪১
মস্কো ৬০, ১৩৪, ১৩৭-১৪০
মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন ১৬৫, ১৬৭
মা (প্রভাবতী বসু) ৯০
মাৎসিনি (ম্যাটসিনি) ১২০, ১২৪
মাদ্রাজ ৮৩, ১৭১, ১৭২, ১৭৪
মাদ্রাজ কাউন্সিল ১৭২
মাদ্রাজ গভর্নমেন্ট ১৭১
মাদ্রাজ পেনিটেনশিয়ারি ১৭১, ১৭২
মাণ্ডালে ১৬৯
মান্দলা ১০৬
মান্দলা জেল ৯২
মার্কস, কার্ল ১৭, ১৮, ১১০, ১২৯
মার্কসবাদ ১১০, ১২৮
মালব্য, পণ্ডিত মদন মোহন ৭১, ৮৩
মিত্র, এস. কে. ৭১
মিত্র, ললিতকুমার ৯৮
মিত্র, সন্তোষ ৭২, ১৫০, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ১০৫, ১০৬, ১১৫, ১৬৬
মুকুন্দরাম ১৭
মুখার্জি, বঙ্কিম ১৩৯
মুদালিয়র, ডাঃ গুরুস্বামী ১৭১
মুন্সীগঞ্জ ১৬২
মুন্সীগঞ্জ ডাকঘর লুঠ মামলা ১০৬
মুর, টমাস ২৯
মুসলিম লিগ ১০৩
মুসোলিনি ৩১
মেছুয়াবাজার বোমার মামলা ৯৩
মেজদা, *দেখুন* বসু, শরৎচন্দ্র
মেজবৌদি (বিভাবতী বসু) ৯০
মেটিয়াবুরুজ ১৩৯
মেদিনীপুর ৭৩, ৮৭
মেদিনীপুর যুব সম্মেলন ৭৩
মেয়র (কলকাতার) ৮৬, ৯৩, ১০০, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১২২

মেয়রের ভাষণ ৯৩-৯৮
মেয়ো, মিস ১২৪
মৈত্র, কমরেড ১৫৭
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে ১০৪
ম্যাকেনজি, ইনসপেক্টর ১৫৫

যতীন্দ্রনাথ দাস স্মৃতিস্তম্ভ ৫১-৫২
যশোহর ২১, ৭২, ৭৩, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ১৩২
যশোহর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন ৭২
যুক্তপ্রদেশ ১০৬, ১৭৪
যুব আন্দোলন ৪৯, ৫৫-৫৯, ৭৩, ৭৪, ১৩০-১৩১, ১৬৬
যুব সংগঠন ১২৬
'যুব সংঘ' ৫৬
যুবক সমাজ ২৮, ২৯, ৩০, ১০০
যোশি, মিঃ ১৩৮

রক্ষিত, ভূপেন্দ্র ৯১
রজ্জাক, মিঃ ১০৩
রাইটার্স বিল্ডিং ১৫৩
রাজগুরু ১১২
রাজনৈতিক বন্দিদের অনশন ধর্মঘট ৩৩, ৩৪
রাজনৈতিক নির্যাতন ৩৩
রাজনৈতিক নির্যাতিতদের দিবস ২৮
রাজশাহী ছাত্রসম্মেলন ৩০
রাজশাহী জেলা ছাত্রসম্মেলন ২৮, ২৯
রাজশাহী মেল ডাকাতি মামলা ১০৬
রাজেন্দ্রপ্রসাদী, শ্রী ১৬৫
রামপ্রসাদ ১৭
রায়, অনাথনাথ ১৭০
রায়, অনিলবরণ ১৬৯
রায়, অবিনাশচন্দ্র ২৬, ২৭
রায়, কিরণশঙ্কর ৩৯
রায়, দিলীপ কুমার ১৬৯
(রায়,) দ্বিজেন্দ্রলাল ১৭৮
রায়, ডাঃ নারায়ণ ১০৬
রায়, ডাঃ বি. সি. (বিধানচন্দ্র রায়) ৮০, ১১৮, ১২২, ১৪৩, ১৪৫, ১৭১, ১৭৫
রায়, বিজয়চন্দ্র ৭২, ৮৬
রায়, রাজা রামমোহন ২৩, ২৯, ৮৫, ১৪০
রায়, ডাঃ সুনীল ১৭৫
রায়চৌধুরী, সবিতা ১৫০
রায়চৌধুরী, সুশীল ১৪৯
রাশিয়া ৩১, ৮৬, ৯১, ১১০, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৪২
রিডিং, লর্ড ৫৩
রেড আর্মি ৩১

লখনউ ৪০, ৭২
লা ফায়েৎ ৩১
লাহোর ২৩, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৫৩, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৫, ৮৯, ১০৭, ১৭৩
লাহোর কংগ্রেস ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৫. ১০৫
লাহোর ফাঁসি ১০৭
লাহোর ষড়যন্ত্র ১১২
'লিগ এগেন্সট ইম্পিরিয়্যালিজম' ৬১
লিবার্টি (পত্রিকা) ২৫
লিলুয়া ধর্মঘট ১০৬
লুডেনডর্ফ, ফন ৮৫
লেনিন ১১০, ১২৯

শুকদেব ১১২
শিবাজী মন্দির ১৬৭
শেয়ালদা ৬৬
শ্যামাদাস কবিরাজ ৯০
শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৫২
শ্রমিক ইউনিয়ন ১৩৪-১৪০
শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস (ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস) ৫৯-৬১, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭-১৪০
শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশন ১৩৮, ১৫২, ১৫৩
শ্রমিক আন্দোলন ৩৭, ৫৭
শ্রমিক দলের সরকার (ব্রিটেনে) ৫৩
শ্রমিক সংঘ ১৯, ২০, ২১
শ্রীঅরবিন্দ ২৩, ১৪১, ১৬৯
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ১৭, ২৪, ১২৩, ১৪০
শ্রীশ্রীমা ১৭৭

সংরক্ষণমূলক শুল্ক ২৭
সক্রেটিস ২৯, ৩১, ৩২
সত্যমূর্তি, ডঃ এস ৮০-৮৩, ১৭৩
সত্যাগ্রহ আন্দোলন ১৬৮
সমহারমূর্তি ৫৪
সমাজতন্ত্রবাদ ১৮, ১২৯, ১৩০
সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্র (ভারতে) ১০৭, ১১০, ১২৯
সমাজসেবা সংঘ ৭৪
সমান্তরাল সরকার ৭৫
সরকার, নলিনীরঞ্জন ৬৫
সরকার, স্যর নীলরতন ১৭১, ১৭৫
সর্ব-দলীয় সমাবেশ ১৩৪
সর্বভারতীয় শ্রমিক সম্মেলন ২৩
সর্বভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলন ৫১
সাইবেরিয়া ৪৭
সাইমন কমিশন ২২, ২৬, ৫৩, ৭৭
সাম্যবাদ (ভারতে) ১১০
সিং, প্রেম ৮৯, ৯৩
সিং, ভগৎ ৪৪, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪
সিং, বাবা গুরুদিৎ ১০৬
সিং, রামসুন্দর ১৫০
সিং, সর্দার শার্দুল ৮৩
সিংহল ৪৭

সিডিশান বন্দী ১০৬
সিনফিন ৭৫, ১১৩, ১১৪, ১৬৬
সিভিল রাইটস কমিশন ১৫৭
সিলেট ১১৮, ১২২
সিলেট জেলা কংগ্রেস ১১৮, ১১৯
সিলি ১৪২, ১৫১
সীতারামাইয়া, ডাঃ পট্টভী ৭০-৭২, ৮০
সুরাট ৮৫
সেওনি ১৭২
সেবাদল ৫১
সেন, কেশবচন্দ্র ২৯, ৮৫
সেন, তারকেশ্বর ১৫০, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪
সেন, শৈলজা ১৫০
সেন, সতীন্দ্রনাথ ৩৩, ৩৪, ৩৭-৩৯, ৪৩, ১০৬, ১৫৩
সেন, সুধীর ১৫০
সেন, হেমচন্দ্র ৪২
সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ ৯০
সেনগুপ্ত, জে. এম. ৩৮-৪১, ৭০, ৭১, ৮০, ১১৮, ১২১, ১২২, ১৩২, ১৩৩, ১৪৭-১৪৯
স্কটিশ চার্চ কলেজ ১০২
স্কিনার, লেঃ কর্নেল ১৭১, ১৭৩, ১৭৫
স্টেটসম্যান ৫৪
স্বদেশী ৯৯, ১৪২
স্বদেশী আন্দোলন ১৪১
স্বদেশী ভাণ্ডার ৪৬
স্বদেশী যুগ ১৮, ৩৬
স্বরাজ ২৩, ২৫, ৭৭, ৭৯, ১৪২, ১৬৪, ১৬৬
স্বরাজের কর্মসূচি ৭৯
স্বাধীনতা (সংজ্ঞা) ৪৮-৪৯ ৫০
স্বাধীনতা দিবস ৮৯
স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন ৩০, ৩১, ৩৭, ৫০

হরকিষণলাল ১১২
হরিশ পার্ক ৮৪, ১৬৩
হাওড়া জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন ৩৫, ৬৩
হাউস অব লর্ডস ৫৩
হাচিংস, মিঃ ১৫৪
হুইটলি কমিশন ৬০, ৬১, ১৩৫-১৩৮
হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলন ২২
হিজলি ১৪৯, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৪
হিজলি বন্দিশালা ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪
হিন্দুস্তানি সেবাদল ৫১
হোমি, মিঃ মানেক ১৯-২১, ১৫২

Bengal Ordinance (Bengal Criminal Amendment Act) ১১৪
Burma Ordinance ১১৪

Delhi Manifesto, *দেখুন* দিল্লী ঘোষণাপত্র
Jani, Mr. ১০৬

Mac Sweeney, Terrance ১১৩
Mekeon, Commandant Seon ১০৫, ১১৩

Rajah, Mr. ১০৬

Sien Fein ১১৩, ১১৪ *আরও দেখুন* সিনফিন